# সাহাবীদের আলোকিত জীবন

দ্বিতীয় খণ্ড


মূল (আরবী)

ড. আবদুর রহমান রা'ফাত পাশা

অনুবাদ

মোহাম্মদ আব্দুল মোনয়েম

অনুবাদ-সম্পাদনা

মাওলানা মুজাম্মিল হক

সাহাবীদের আলোকিত জীবন

## সম্মানিত লেখকের দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللهُمَّ إِنِّيْ أَحْبَبْتُ صَحَابَةَ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَصْدَعَهُ الْحُبِّ وَأَعْمَقَه فَهَبْنِيْ يَوْمَ الْفَزَعِ الْاَكْبَرِ لِاَيٍّ مِنْهُمْ فَإِنَّكَ
تَفَائِمُ أَنِّيْ مَا أَحْبَبْتُهُمْ اِلَّا فِيْكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

'হে পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহ! আমি তোমার প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের অকৃত্রিমভাবে অন্তরের অন্তস্তল থেকে ভালোবাসি। তুমি ভালো করেই জানো, তাঁদের প্রতি আমার এ ভালোবাসা শুধুমাত্র তোমারই নিমিত্তে। তাই কিয়ামতের সেই ভয়ঙ্কর দিনে আমাকে তাঁদের যেকোনো একজনের সাথে হাশর নসীব করো।'

-ড. আবদুর রহমান রা'ফাত পাশা

# সাহাবীদের আলোকিত জীবন

## দ্বিতীয় খণ্ড

মূল (আরবী): ড. আবদুর রহমান রা'ফাত পাশা
অনুবাদ: মোহাম্মদ আব্দুল মোনয়েম
অনুবাদ-সম্পাদনা: মাওলানা মুজাম্মিল হক

ISBN 978-984-8927-18-2

প্রকাশক: সবুজপত্র পাবলিকেশন্স-এর পক্ষে
মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন ও সাঈদা বিনতে মাহমুদ
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০।
মোবাইল: ০১৭৫০০৩৬৭৮৭, ০১৭৭১১৪৪৭২৬ (বিকাশ-মার্চেন্ট)
বিক্রয়কেন্দ্র: বাংলাবাজার: ০১৭৫০০৩৬৭৯০, ০১৭৫০০৩৬৭৯২
মগবাজার: ০১৭৫০০৩৬৭৯১, কাঁটাবন: ০১৭৫০০৩৬৭৯৩
website: www.sobujpatro.com
e-mail: info_admin@sobujpatro.com
fb.com/sobujpatrobd



প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর, ২০০৯ ঈসায়ী
নতুন সংস্করণ: ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

প্রচ্ছদ: দেলোয়ার হোসেন
মুদ্রণ: একুশে প্রিন্টার্স, সূত্রাপুর, ঢাকা
বাধাই: অগ্রণী বুক বাঁধাই কেন্দ্র, সূত্রাপুর, ঢাকা

মূল্য: দুইশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

---

صُوَرٌ مِّنْ حَيَاةِ الصَّحَابَةِ
تاليف: الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا
ترجمة: محمد عبد المنعم، مراجعة : مزمل حق
الناشر: مكتبة سوبوز بترو، داكا، بنغلاديش

---

STORIES FROM THE LIVESOF THE SAHABAH (VOL-2)
(Sahabider Alokito Jibon, Vol-2)
by Dr. Abdur Rahman Rafat Pasha
Translated by Mohammad Abdul Monyem
Edited by Maulana Mojammel Haque
Published by Sobujpatro Publications
34 Northbrook Hall Road, Banglabazar, Dhaka 1100

Price: Taka Two Hundred Fifty only.

## প্রকাশকের কথা

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অশেষ মেহেরেবাণীতে 'সাহাবীদের আলোকিত জীবন' বইখানা প্রকাশিত হলো। এটি সাধারণ নিয়মে রচিত সাহাবীদের কোনো জীবনীগ্রন্থ নয়; এতে বিশিষ্ট কয়েকজন সাহাবীর (রা) ঈমানের উপর ইস্পাতকঠিন দৃঢ়তা, কর্মে ত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, রাসূলের (স) প্রতি মহব্বতের পরম পরাকাষ্ঠা, আনুগত্যের অনুপম নিদর্শন, পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ, সহমর্মিতা ও সহযোগিতার সুমহান আদর্শসহ জীবনের এমনসব চমকপ্রদ স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে, যা একজন পাঠকের ঈমানী চেতনাকে উজ্জীবিত করবে।

অনুবাদক শ্রদ্ধেয় মোহাম্মদ আব্দুল মোনয়েম এ বইটির শুধু অনুবাদই করেননি; জটিল রোগে আক্রান্ত অবস্থায় বই প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সকল কাজ তিনি নিজেই আঞ্জাম দিয়েছিলেন। কম্পিউটারের বড় পর্দায় শব্দে শব্দে প্রুফ দেখেছেন, সম্পাদনা করেছেন। এমনকি কিছু অংশ প্রকাশও করেছিলেন। তবে নিজের এত বড় খিদমতের পূর্ণাঙ্গ রূপ দেখে যেতে পারেননি। তিনি ২ আগস্ট ২০০৬ তারিখে ইন্তিকাল করেন। মুমূর্ষু অবস্থায় হাসপাতালে দেখতে গেলে আমার সামনে তিনি তাঁর সহধর্মিণীকে পরিষ্কার ভাষায় বলে দিলেন, এ বইটি প্রকাশের দায়িত্ব আমাকে দেওয়ার জন্য। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

বেশ কয়েকজন ঘনিষ্ঠ শ্রদ্ধেয় ইসলামিক স্কলার বইখানা প্রকাশের ব্যাপারে আমাকে উৎসাহিত করেছেন এবং তাগিদ দিয়েছেন। তাদের সকলের প্রতি আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

প্রথম প্রকাশের পর থেকেই বইখানা পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করেছে, আলহামদুলিল্লাহ। আগামীতে এর গ্রহণযোগ্যতা আরো ব্যাপক হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাঁর ঐসব প্রিয় বান্দার সুমহান আদর্শ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার তাওফীক দিন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

## অনুবাদকের কথা

সাহাবীদের জীবনীর ওপর লিখিত মিসরের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ড. আবদুর রহমান রা'ফাত পাশা'র صُوَرٌ مِّنْ حَيَاةِ الصَّحَابَةِ আরবী বইটি আরব দেশসমূহের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। সৌদি আরবসহ অন্যান্য আরব দেশ এ বইটি তাদের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করেছে। বইখানা ইতোমধ্যেই আরবী ভাষা-ভাষীদের চাহিদা পূরণ করে বিশ্বের অনেক ভাষাতেই অনূদিত হয়েছে।

বাংলা ভাষাভাষী পাঠক-পাঠিকাদের খেদমতে বইখানা পেশ করার জন্য ১৯৯২ সালে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ ড. আহমদ তুতুনজীর উদ্যোগে অনুবাদে হাত দেই। ১৯৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়।

নানাবিধ প্রতিকূলতা, প্রতিবন্ধকতা ও অনিশ্চয়তা আমার অনুবাদ কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। প্রতিকূলতার এ ঝড়-ঝাপটা উপেক্ষা করেই এর অনুবাদ অব্যাহত রাখি। মহান আল্লাহর মেহেরবানীতে ২০০০ সালের রমযান মাসে অবশিষ্ট ছয় খণ্ডের অনুবাদই সমাপ্ত হয়। প্রথম খণ্ডের অনুবাদ, পর্যালোচনা ও অন্যান্য খণ্ডের সম্পাদনা, কম্পোজসহ আনুষঙ্গিক কাজগুলোর পর্যায় অতিক্রম করার পূর্বেই আমি অসুস্থ হয়ে লেখাপড়া করার অযোগ্য হয়ে পড়ি। যে কারণে দেড় বছরকাল এর পাণ্ডুলিপিগুলো পড়ে থাকে।

আল্লাহর রহমতে একটু আরোগ্য লাভ করলে পুনরায় এ কাজে আত্মনিয়োগ করি। আমার এ কাজে সহযোগিতা করার লক্ষে শ্রদ্ধেয় বড় ভাই প্রখ্যাত কলামিস্ট সালেহ উদ্দীন আহমদ জহুরী নিঃস্বার্থভাবে আমার পাণ্ডুলিপিগুলো দেখে দেন। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও গবেষক অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ মুজাম্মিল হক তাঁর গবেষণা ও অন্যান্য সম্পাদনার কাজ ফেলে রেখে দ্রুত বইখানার তরজমা মিলিয়ে দেখেন এবং তা সম্পাদনা করে আমাকে চিরকৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ করেন।

রিয়াদের ইমাম মুহাম্মদ বিন সউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ্য প্রফেসর, সুসাহিত্যিক ড. আব্দুর রহমান রা'ফাত পাশার এই বইখানা আরব বিশ্বের কিশোর-কিশোরী, ছাত্র-ছাত্রীদের ইসলামী জীবন গঠনে সহায়ক একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। একইভাবে ওলামা-মাশায়েখ থেকে শুরু করে সর্বস্তরের পাঠক-পাঠিকাদের নিকটও বইটি বিশেষভাবে সমাদৃত। কলুষিত ও ব্যাধিগ্রস্ত ঘুণে ধরা সেই জাহেলী সমাজের আষ্টেপৃষ্ঠে আবদ্ধ জাতিকে নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার শীর্ষে তুলে কীভাবে কলুষমুক্ত পরশ পাথরে পরিণত করা হয়েছিলো তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ফুটে উঠেছে 'সাহাবীদের আলোকিত জীবন'-এ। বইটি একেকজন সাহাবীর জীবনের একেক ধরনের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে মহিমান্বিত।

লেখক অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের আরবী ভাষায় আটান্ন জন সাহাবীর জীবনী সম্বলিত এ বইটি সাত খণ্ডে সমাপ্ত করেন। আরবী ভাষার গভীরতা, মাধুর্য, প্রাঞ্জলতা ও ভাবের সমন্বয়কে বাংলা ভাষায় প্রকাশ করার জন্য বইটির হুবহু অনুবাদের আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে। কোথাও কোথাও শাব্দিক অর্থের সীমারেখা পেরিয়ে ভাবার্থের আশ্রয়ও নিতে হয়েছে। কিছু সংখ্যক সাহাবীর ইসলামপূর্ব বিদ্রোহী জীবনীর সাথে পরবর্তী ইসলামী জীবনের তুলনামূলক চিত্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে তাঁদেরকে লেখক যেভাবে সম্বোধন করেছেন, অনুবাদেও সেভাবে সম্বোধন করা হয়েছে অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথেই তাঁদেরকে রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও সহৃদয় পাঠকবৃন্দের নজরে যদি অনুবাদ সংক্রান্ত কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় তা আমাদেরকে অবগত করালে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের আন্তরিক চেষ্টা করবো, ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে, যে কথাটি উল্লেখ না করলেই নয় তা হলো, ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করা মাত্রই প্রতিটি নর-নারীর দৃষ্টি রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সেই সোনালী সমাজের প্রতি নিবদ্ধ হয়। এ বইয়ে উল্লিখিত আটান্নজন সাহাবীই রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বর্ণযুগের সদস্য। যাঁদেরকে তিনি শারীরিক ও মানসিক, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক, ঈমানী এবং জিহাদী চিন্তা-চেতনায় বলীয়ান করে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠাকরত সর্বযুগের মানুষের জন্য অনুকরণযোগ্য করে গড়ে তুলেছিলেন।

সারা পৃথিবীতেই আজ ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম দানা বেঁধে উঠেছে। এ পথের সংগ্রামী প্রতিটি তরুণ-তরুণী, এমনকি ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্যও সাহাবীদের জীবনী ও চিন্তা-চেতনার অনুকরণ একান্ত আবশ্যক। ইসলামী সমাজ বিপ্লবের জন্য আদর্শ কর্মী বাহিনী তৈরির কাজে যদি আমার এ পরিশ্রম সামান্যতম কাজেও আসে তাতেই নিজেকে ধন্য মনে করবো।

আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর প্রিয়নবীর সাহাবীদের মতো জীবন যাপন করার তাওফীক দিন এবং তাদের সাথেই আমাদের হাশর নসীব করুন। আমীন!

মোহাম্মদ আব্দুল মোনয়েম

৫ রবিউস সান, ১৪২৪ হিজরী

৬ জুন, ২০০৩ ঈসায়ী

# সূচিপত্র

## বিষয়ভিত্তিক সূচিপত্র
(বর্ণক্রমিক বিন্যাস)

# উসামা ইবনে যায়েদ (রা)

*'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তোমার পিতার চেয়ে 'উসামার পিতা অধিক প্রিয় ছিলেন। আর উসামাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তোমার চেয়ে অধিক প্রিয়।'*

*–আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-এর প্রতি উমর ফারূক (রা)-এর উক্তি*

হিজরতের সাত বছর পূর্বের কথা। মক্কায় মুসলমানদের জন্য ছিল চরম দুর্দিন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ প্রতিদিনই কুরাইশদের নির্মম অত্যাচারের শিকার হতেন। ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ এবং ইসলাম প্রচারের কারণে মুসলমানদের ওপর অব্যাহতভাবে অত্যাচার চলত। এহেন যুলুম-অত্যাচার আর দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তার মাঝেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে দেখা গেল আনন্দের আভাস। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে আনন্দের পবিত্র আভাস দেখে সকলেই আনন্দিত হলেন। সংবাদ এল, উম্মুল আইমানের ঘরে আল্লাহ একটি ছেলে দান করেছেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, এ সংবাদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড়ই খুশি হলেন। তাঁর মুখমণ্ডলে হাসি ফুটল। কে এই শিশু, যার জন্মগ্রহণের সংবাদ শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত আনন্দিত হয়েছিলেন? হ্যাঁ, এ শিশুই উসামা ইবনে যায়েদ।

এ শিশুর জন্মগ্রহণের সংবাদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতিশয় আনন্দিত হলেন। এ শিশুর পিতামাতার সন্তান লাভে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুশি হওয়ারই কথা। কারণ, তাঁরা অতি আপনজন।

তাদের একজন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'প্রিয়পাত্র' যায়েদ ইবনে হারেসা এবং অপরজন উম্মুল আইমান। এই শিশুর মায়ের নাম ছিল 'বারাকাতুল হাবাশীয়াশী' যাকে উম্মুল আইমান নামে ডাকা হতো। তিনি ছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আম্মা আমেনা বিনতে ওয়াহাব-এর ক্রীতদাসী। আমেনার জীবদ্দশায় তিনিই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লালন-পালন করেন, এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মায়ের ইনতিকালের পরও একটি সময় পর্যন্ত তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেবাযত্ন করেন। মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দুনিয়াতে বিচার-বিশ্লেষণের ও পার্থক্য শক্তির দু'চোখ খুলেই নিজের মা ছাড়া আর যাকে আপন বলে দেখেন, তিনি এই মহিলা। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ভালোবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন। প্রায়ই তাঁর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন :

> 'আমার মায়ের পর তিনিই আমার মা এবং আমার পরিবারের অবশিষ্ট মুরব্বী, যাকে নিজ বাড়িতেই রেখেছি।'

তিনিই সেই সৌভাগ্যবান শিশুর মা উম্মুল আইমান আর তার পিতা ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়পাত্র যায়েদ ইবনে হারেসা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। ইসলামপূর্ব যুগে যিনি ছিলেন তাঁর পালক-পুত্র, সম্মানিত সাহাবা, গোপনীয় বিষয়ের বিশ্বস্ত আমানতদার, নবী-পরিবারের সদস্য এবং সবার চেয়ে অধিক ভালোবাসার পাত্র।

উসামা ইবনে যায়েদ-এর জন্মগ্রহণে মুসলমানগণ খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন। এ কারণে যে, যেসব ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর খুশি প্রকাশ করেছেন, সেসব ক্ষেত্রে সাহাবীগণও খুশির বহিঃপ্রকাশ করেছেন। এ ছেলেকেই সাহাবীদের পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'প্রিয়পাত্রের প্রিয় সন্তান' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ছোট শিশু উসামাকে সাহাবীগণ এ উপাধিতে ভূষিত করে মোটেই বাড়াবাড়ি করেননি। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসামাকে খুবই ভালোবাসতেন। এ দুই বন্ধুর মধ্যে বয়সের পার্থক্য তো আসমান-জমিন ফারাক। উসামা ইবনে যায়েদ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা ফাতিমাতুয্‌যাহ্‌রার ছেলে হাসান ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সমবয়সী। হাসান দেখতে খুবই সুন্দর, গোলাপী ফর্সা এবং হুবহু তাঁর নানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো। আর উসামা ছিলেন খুবই কালো, খর্বাকার নাসিকা, তার হাবশী মা উম্মুল আইমানের মতো। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়ের মধ্যে স্নেহ-ভালোবাসার কোনো পার্থক্য করতেন না।

উসামাকে তাঁর এক উরুর ওপর বসাতেন এবং অন্য উরুর ওপর হাসানকে। অতঃপর উভয়কেই বুকে জড়িয়ে ধরে বলতেন :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُحِبُّهُمَا فَاَحِبَّهُمَا ـ

'হে আল্লাহ, আমি এ দু'জনকেই সমান ভালোবাসি, তুমিও তাদেরকে ভালোবাস।'

উসামার প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা কতটুকু গভীর ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় একটি ঘটনায়। একদিন উসামা হোঁচট খেয়ে দরজার চৌকাঠের ওপর পড়ে যাওয়ায় তার কপাল কেটে যায় এবং ক্ষতস্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে উসামার ক্ষতস্থান থেকে রক্ত মুছে ফেলার ইঙ্গিত করেন; কিন্তু তাতে তাঁর বিলম্ব হতে দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই উঠে গিয়ে উসামার ক্ষতস্থান থেকে রক্ত চুষে থুথু করে ফেলতে থাকেন এবং তাকে আদর-সোহাগভরা কথাবার্তা শোনান ও সান্ত্বনা দেন, যাতে সে সন্তুষ্ট হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসামাকে শৈশবে যেমন ভালোবাসতেন, যৌবনেও ঠিক তেমনি ভালোবাসতেন। কুরাইশদের এক অভিজাত নেতা হাকিম ইবনে হাযাম ইয়ামেনের এক বাদশাহ যুইয়াযদানের নিলামকৃত মহামূল্যবান গাউন পঞ্চাশ দিনার বা স্বর্ণ মুদ্রায় খরিদ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উপহার দেন। কিন্তু ইবনে হাযাম তখনো মুশরিক থাকায় তিনি তার উপহার গ্রহণ না করে তা কিনে নেন এবং একবার মাত্র জুমআর দিনে পরিধান করে তা উসামাকে উপহার দেন। উক্ত গাউন পরে উসামা তার সমবয়সী আনসার ও মুহাজির যুবকদের মধ্যে সকাল-বিকাল ঘোরাফিরা করতেন।

উসামা যৌবনে পদার্পণ করলে তার মধ্যে চারিত্রিক ও মানবিক গুণাবলির অপূর্ব প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ জন্য তার প্রতি আরো বেশি আকৃষ্ট হন। উসামা শুধু সাধারণ অর্থেই বুদ্ধিমান ছিলেন না; বরং অসাধারণ প্রজ্ঞারও অধিকারী ছিলেন। তিনি শুধু সাহসী যোদ্ধাই ছিলেন না; বরং যুদ্ধের কলাকৌশলে তিনি ছিলেন একজন কুশলী যোদ্ধা। যে কোনো জটিল সমস্যার সমাধানে তিনি ছিলেন বিশেষ প্রজ্ঞাবান।

তিনি যেমন মানবিক গুণে ছিলেন গুণান্বিত, তেমনি ছিলেন একজন মুত্তাকী ও খোদাভীরু আবেদ। উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য উসামা ইবনে যায়েদ একদিন সাহাবী সন্তানদের একদল কিশোর সাহাবীসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোগ্যতার ভিত্তিতে যাদের গ্রহণ করার কথা তাদের গ্রহণ করেন এবং অল্প বয়সের জন্য যাদের ফেরৎ দেওয়ার, তাদের ফেরৎ পাঠান। যাদেরকে ফেরৎ পাঠানো হয় তাদের মধ্যে উসামা ইবনে যায়েদ অন্যতম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিহাদের পতাকাতলে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহে অংশ না নিতে পারায় উসামা দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বাড়ি ফিরে যান। খন্দকের যুদ্ধের প্রাক্কালেও উসামা যুবক সাহাবীদের একদল নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাযির হন। এবার তিনি পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে ভর করে নিজের উচ্চতা বৃদ্ধির চেষ্টা করেন, যাতে করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে লম্বা মনে করে যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবার তাকে ছোট্ট সাহাবীদের থেকে আলাদা করে নেন ও যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমিত দেন। তখন তার বয়স ছিল মাত্র ১৫ বছর।

হুনাইনের যুদ্ধের এক পর্যায়ে মুসলিম বাহিনী চরমভাবে পরাজয়ের মুখোমুখি হন। উসামা ইবনে যায়েদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ও চাচাত ভাই আবূ সুফিয়ান ইবনে হারেস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবং অন্য ছয়জন সম্মানিত সাহাবীর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শত্রুর মোকাবেলায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে ইস্পাতের প্রাচীরের মতো অবস্থান নেন। জানবায সাহাবী যোদ্ধাদের এই ক্ষুদ্রতম ইউনিটের সাহায্যেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পরাজয়কে বিজয়ে রূপান্তরিত করেন এবং যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়া সাহাবীদেরকে আক্রমণকারী মুশরিকদের হাত থেকে রক্ষা করেন।

যুবক সাহাবী উসামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মাত্র আঠারো বছর বয়সে তার পিতা সেনাপতি যায়েদ বিন হারেসা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পতাকাতলে 'মূতার' যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি এ যুদ্ধে স্বচক্ষে তাঁর পিতার শাহাদাতের ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন। পিতার শাহাদাতে বিন্দুমাত্র দুর্বলতাও প্রকাশ না করে কেঁদে অস্থিরও না হয়ে বরং জা'ফর ইবনে আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে বীরবিক্রমে শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকেন। তার চোখের সামনে জা'ফর ইবনে আবী তালিব রাদিয়াল্লাহ আনহু শহীদ হলে সেনাপতির নেতৃত্ব আসে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে। তাঁর শাহাদাতের পর খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে যতক্ষণ পর্যন্ত এই ক্ষুদ বাহিনীকে বিশাল রোমান বাহিনী থেকে পশ্চাদপসরণ না করানো হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি যুদ্ধ অব্যাহত রাখেন। যুদ্ধ শেষে আল্লাহর কাছে পিতা যায়েদ ইবনে হারেসার সর্বোচ্চ পুরস্কারের আশা নিয়ে সিরিয়ার পূর্ব প্রান্তরে মূতার যুদ্ধক্ষেত্রে পিতার লাশকে দাফন করে, তার শাহাদাতপ্রাপ্ত পিতা সেনাপতি যায়েদ ইবনে হারেসার ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। এগারো হিজরীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য সর্বস্তরের মুজাহিদদের নির্দেশ দেন।

আবূ বকর সিদ্দীক, উমর ফারূক, সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস, আবী উবাইদা ইবনে জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমসহ অন্যান্য নেতৃস্থানীয় সাহাবীগণ এ বাহিনীতে যোগ দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বিশাল বাহিনীর সেনাপতি হিসেবে 'উসামা ইবনে যায়েদকে' নিয়োজিত করেন। তখনো তার বয়স ছিল বিশ বছরের চেয়েও কম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে রোম সাম্রাজ্যের 'সাজা' অঞ্চলের 'আল বাল্‌কা' ও 'আদ্‌দারুম' দুর্গ পর্যন্ত অভিযান চালানোর নির্দেশ দেন।

সৈন্যদের বিদায় মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং অসুস্থতা দিন দিন বেড়েই চলল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর স্বাস্থ্যের আশঙ্কাজনক অবস্থা অবলোকন করে এ বাহিনীর যাত্রা বিলম্বিত করা হলো। উসামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা দেন :

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক পর্যায়ে পৌঁছলে আমি ও আমার সাথীরা যারা যেতে চাইলেন, তাঁদের নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হলাম।'

দেখতে পেলাম যে, তিনি শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছেন। রোগের তাড়নায় তিনি কথা পর্যন্ত বলতে পারছেন না। তিনি শুধু আকাশের দিকে তাঁর দু'হাত মুবারক উঠালেন এবং হাত দু'খানা আমার ওপর রাখলেন। আমি তাতে বুঝলাম যে, তিনি আমার জন্য দু'আ করছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহ মুবারক থেকে তাঁর পবিত্র রূহ চিরবিদায় নিয়ে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেল। আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাতে খিলাফতের বাইআত সম্পন্ন হলে আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাহিনীকে রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দিলেন।

কিন্তু আনসারদের একটি ক্ষুদ্র অংশ এ অভিযান আরো বিলম্বিত করার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁরা উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে আবেদন করেন যে :

'তিনি যেন খালীফাতুল মুসলিমীন আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাথে দেখা করে তাঁদের এ দাবি উপস্থাপন করেন।'

আনসারদের সেই ক্ষুদ্র দলটি উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মাধ্যমে আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে এই শর্তে দাবি জানালেন, যদি আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাদের এ দাবি প্রত্যাখ্যান করেন, তাহলে আমাদের পক্ষ থেকে উসামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নেতৃত্বে জিহাদে অংশ নিয়ে রওয়ানা হতে কোনোই আপত্তি থাকবে না। খালীফাতুল মুসলিমীনের কাছে এ প্রস্তাব উত্থাপন করুন, তিনি যেন অল্প বয়সী উসামার পরিবর্তে বয়ঃপ্রাপ্ত ও অধিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন যে কোনো ব্যক্তিকে এ গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে সেনাপতি নিয়োগ করেন। উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আনসার মুজাহিদদের ক্ষুদ্র দলটির এ প্রস্তাব নিয়ে আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিকট উত্থাপন করার উদ্দেশ্যে দেখা করেন। আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর মুখে আনসারদের এই প্রস্তাব উচ্চারণ মাত্রই তিনি এক লাফে উঠে দাঁড়ান এবং সাথে সাথে উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা

আনহুর দাড়ি ধরে ক্রুদ্ধ স্বরে বলতে লাগলেন :

'হে ইবনে খাত্তাব, তোমার মা তোমার জন্য বিলাপ করুন .....এবং তোমাকে চিরবিদায় করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসামাকে সেনাপতি নিযুক্ত করেছেন, আর তুমি তাকে অপসারণের প্রস্তাব নিয়ে এসেছ? আল্লাহর শপথ! তা কখনো হতে পারে না এবং হবে না।'

উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাদের নিকট ফিরে এলে তারা আলোচনার ফলাফল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি উত্তরে বললেন :

'আপনারা উসামার নেতৃত্বেই অভিযানের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ুন। আপনাদের মা আপনাদের হারিয়ে ফেলুক। আপনাদের প্রস্তাব উপস্থাপন করতে গিয়ে খালীফাতুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কী যে অপমানিত হয়েছি ... ।'

যুবক সেনাপতি উসামা ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমার নেতৃত্বে এই বিশাল বাহিনী মদীনা থেকে রওয়ানা হলে উসামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ঘোড়ায় চড়ে এই বাহিনীর আগে আগে চলছিলেন আর খালীফাতুর রাসূলুল্লাহ আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর সাথে হেঁটে হেঁটে মদীনার সীমানা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছিলেন। উসামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বলেন :

'হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা, আল্লাহর শপথ! হয় আপনি ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে আমাদের এগিয়ে দিন, অন্যথায় আমি নিজেই নিচে নেমে আপনার সাথে হেঁটে হেঁটে অগ্রসর হব।'

আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উত্তর দিলেন :

'আল্লাহর শপথ! তুমি ঘোড়ার পিঠ থেকে নামতে পারবে না। আল্লাহর শপথ! আমিও ঘোড়ায় উঠব না। আমি কি জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর পথে একটি ঘণ্টা নিজের পা দুটি ধূলিমলিন করব না?'

অতঃপর তিনি উসামাকে বললেন :

'তোমার দীন, আমানতদারী এবং উত্তম পরিণতির জন্য আল্লাহর কাছে সোপর্দ করছি। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যতদূর পর্যন্ত

অভিযান পরিচালনার জন্য তোমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, সে পর্যন্ত অভিযান চালানোর জন্য উপদেশ দিচ্ছি।'

অতঃপর আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উসামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বললেন :

'যদি তুমি উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে আমার সহযোগিতার জন্য মদীনাতে থাকার অনুমতি দেওয়া পছন্দ কর, তাহলে তাকে মদীনায় অবস্থানের অনুমতি দাও।'

আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এই অনুরোধের প্রেক্ষিতে উসামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে মদীনায় অবস্থানের জন্য ফেরৎ পাঠান।

অতঃপর উসামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মোতাবেক এই অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে 'তুখুমুল বাল্‌কা' ও ফিলিস্তীনের 'আদ্‌দারুম দুর্গ' এবং কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত জয় করেন। এই বিজয়ের ফলে রোম সম্রাটের মধ্যে ভয়াবহ ভীতি ও চরম আতঙ্কের সৃষ্টি হয় ও মূতার যুদ্ধে পরাজয়ের পর মুসলমানদের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত রোমানদের প্রতি ভয়ভীতি চিরতরে দূরীভূত হয়ে যায়। শুধু তা-ই নয়, সমস্ত মুসলমানের জন্য সিরিয়া এলাকা, মিসর ও উত্তর আফ্রিকাসহ আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত বিজয়ের পথ সুগম হয়ে উঠে, যার মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের পরিধির বিস্তৃতি সম্ভব হয়।

এই অব্যাহত বিজয়ের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত উসামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সেই ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করেছিলেন, যে ঘোড়ার পিঠে তাঁর পিতা শহীদ হয়েছিলেন। তাঁর সাথে আজ বিজয়ের গৌরব ও যোদ্ধাদের বহনকৃত মালে গনীমতের অঢেল সম্পদ। যে সম্পদ সম্পর্কে বলা হয় :

'উসামা ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বাহিনীর মতো রক্তপাতবিহীন এবং মালে গনীমতের অঢেল সম্পদ অর্জন আর কোনো সেনাপতির সময়ে সম্ভব হয়নি।'

উসামা ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর সমস্ত জীবন মুসলমানদের সম্মান ও শ্রদ্ধা এবং ভক্তির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিলেন। যেমন ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুগত ও নিবেদিত তেমনই ছিলেন অত্যন্ত স্নেহধন্য।

উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমার চেয়ে উসামা ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমার জন্য অধিক সরকারি ভাতা নির্ধারণ করলে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর পিতা উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে আপত্তি জানিয়ে বলেন :

> 'হে পিতা! আপনি উসামা ইবনে যায়েদের জন্য নির্ধারণ করেছেন চার হাজার দিরহাম আর আমার জন্য তিন হাজার দিরহাম! তার পিতা তো আপনার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন না। তেমনি সেও আমার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ নয়।'

উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাকে বলেন :

> 'তোমার এ অহমিকার জন্য তোমাকে ধিক্কার। তুমি বাস্তবতার চেয়ে অনেক দূরে অবস্থান করছ। নিঃসন্দেহে উসামার পিতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তোমার পিতার চেয়ে অধিক প্রিয় ছিলেন। তেমনি সে নিজেও তোমার চেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনেক বেশি প্রিয়।'

পিতার এ কথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা অত্যন্ত বিনয় ও সন্তুষ্টচিত্তে তার জন্য ধার্যকৃত ভাতায় রাজি হয়ে গেলেন। উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাথে উসামা ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমার সাক্ষাৎ হলে তিনি বলতেন :

> 'মারহাবা! খোশ আমদেদ! হে আমার আমীর!'

জনৈক ব্যক্তি উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এ উক্তিতে আশ্চর্যান্বিত হলে উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন :

> 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে আমার আমীর নিযুক্ত করেছিলেন।'

আল্লাহ এই বিরাট গুণাবলিসম্পন্ন মহান ব্যক্তির ওপর তাঁর করুণা ও মহব্বতের হাত সম্প্রসারণ করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে এমন গুরুত্বপূর্ণ, মহান ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, বহুমুখী গুণের অধিকারী প্রাণপুরুষ ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া নিঃসন্দেহে দুরূহ।

উসামা ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমার জীবনী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সহায়ক গ্রন্থাবলি :

১. আল ইসাবাহ (তাবআ-মুস্তাফা মুহাম্মদ) : ১ম খণ্ড, ৪৬ পৃ.।
২. আল ইসতিআব (হাশিয়াতুল ইসাবাহ) : ১ম খণ্ড, ৩৪-৩৬ পৃ.।
৩. তাকরীবুত তাহযীব : ১ম খণ্ড, ৫৩ পৃ.।
৪. তারীখুল ইসলাম লিয্যাহাবী : ২য় খণ্ড, ২৭০-২৭২ পৃ.।
৫. আত তাবাকাতুল কুবরা : ৪র্থ খণ্ড, ৬১-৭২ পৃ.।
৬. আল-ইবার : ১ম খণ্ড, ৯৫ পৃ.।
৭. মিন আবতালেনা আল্লাযীনা সানউ আত্ তারীখ : লিআবিল ফাতুহ আত্ তিউনিস।
৮. কাদাতুফতুহুশ্শাম ওয়াল মেসের।
৯. আল আ'লাম ও তার সংস্করণ দ্রষ্টব্য- ২৮১-২৮২ পৃ.।

# সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা)

*হে আল্লাহ, তুমি যদিও আমাকে এই উত্তম দীন থেকে বঞ্চিত করেছ, কিন্তু আমার ছেলে সাঈদকে এই দীন থেকে বঞ্চিত করো না। –সাঈদ (রা)-এর পিতা যায়েদের দু'আ*

যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল জন-কোলাহল থেকে বেশ দূরে অবস্থান নিয়ে কুরাইশদের কোনো এক অনুষ্ঠানের কর্মসূচি দেখছিলেন। তিনি দেখতে পেলেন, পুরুষেরা দামি দামি রেশমি পাগড়ি মাথায় বেঁধে ইয়ামেনের তৈরি গাউন পরিধান করে অনুষ্ঠানে ঘোরাফিরা করছে। মহিলারা ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা রং-বেরঙের জামা, কাপড়-চোপড় ও বিচিত্র অলংকারাদি পরিধান করে দলবদ্ধভাবে সমবেত হচ্ছে ও মেলার শোভা বর্ধন করছে। সম্পদশালী ও ধনী ব্যক্তিরা নানা বয়সের ও নানা ধরনের পশুকে রঙিন সাজে সজ্জিত করে দেবতার সন্তুষ্টির জন্য বলি দেওয়ার উদ্দেশ্যে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল খানায়ে কা'বার দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে এসব দৃশ্য দেখছিলেন। এক পর্যায়ে কুরাইশদের সম্বোধন করে বলতে থাকলেন :

> 'হে কুরাইশ সম্প্রদায়! ভেড়া-বকরির স্রষ্টা হলেন আল্লাহ। আকাশ থেকে তাদের জন্য আল্লাহ বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তাদের বেঁচে থাকার জন্য পানি ও ঘাস দিয়েছেন, যা খেয়ে ওরা জীবন ধারণ করে। তোমরা কেন ওগুলোকে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে বলি দিচ্ছ? তোমরা বড়ই অজ্ঞ ও মূর্খ।'

এ কথা শোনামাত্র তাঁর চাচা, উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পিতা খাত্তাব ভীষণ রেগে যায় এবং তাকে সজোরে চপেটাঘাত করে বলে :

'তুই নিপাত যা! এ ধরনের ধৃষ্টতাপূর্ণ কথা এর আগেও তোর মুখ থেকে বহুবার শুনেছি। প্রতিবারই আমরা ধৈর্য ধারণ করেছি। এখন আমাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়েছে।'

খাত্তাবের এ বকাবকি ও চপেটাঘাতের সুযোগে তারই স্বগোত্রীয় নির্বোধেরা নুফাইলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রহার করতে করতে তাকে মক্কা থেকে বের করে দেয়। তিনি হেরা পর্বতে আশ্রয় নেন। খাত্তাব কুরাইশ গোত্রের দুষ্ট ছেলেদের বলে দেয়, তোমরা প্রহরায় থাকবে, যাতে সে মক্কায় প্রবেশ করতে না পারে। তাই গোপনে সবার দৃষ্টি এড়ানো ছাড়া যায়েদ ইবনে আমর মক্কায় প্রবেশ করতে পারতেন না।

যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল ক্ষান্ত হওয়া বা থেমে যাওয়ার মতো পুরুষ ছিলেন না। তিনি কুরাইশদের নজর এড়িয়ে ওয়ারাকা ইবনে নাওফেল, আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ, উসমান ইবনে হারেস, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফুফু উমাইয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিবের সাথে নিয়মিত দেখা-সাক্ষাৎ করতে থাকেন ও শিরকে নিমজ্জিত কুরাইশদের ব্যাপারে সমালোচনা করতে থাকেন।

যায়েদ তাদেরকে বলেন :

'আল্লাহর শপথ! তোমরা এটা ভালো করেই জান যে, তোমাদের জাতি মূর্খতা ও অজ্ঞতায় নিমজ্জিত। তাদের ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের সাথে দীনে ইবরাহীমের কোনো সম্পর্ক নেই। প্রকৃতপক্ষে তোমরা দীনে ইবরাহীমের বিপরীতে চলছ। যদি তোমরা নাজাত পেতে চাও, তাহলে তোমরা নতুন কোনো ধর্মের সন্ধান কর।'

কুরাইশদের এই চার গুণীজন ইহুদী ও খ্রিস্টানসহ সমসাময়িক অন্যান্য ধর্মের ধর্মীয় নেতাদের কাছে গিয়ে ধর্ম সম্পর্কে জানার আপ্রাণ চেষ্টা চালান এবং ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দীনে হানীফের সন্ধান করতে থাকেন।

তাদের মধ্য থেকে ওয়ারাকা ইবনে নাওফেল খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ ও উসমান ইবনে হারেসের মন আকৃষ্ট হয়নি প্রচলিত কোনো ধর্মের প্রতি। যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল-এর নতুন ধর্ম সন্ধানের ব্যাপারে এক চমৎকার ঘটনা রয়েছে। তার নিজ বর্ণনা থেকেই সে ঘটনা অবগত হোন। যায়েদ

**ইবনে আমর ইবনে নুফাইল বলেন :**

'আমি ইহুদী ও খ্রিস্টান পাদ্রিদের সান্নিধ্যে গিয়ে তাদের কাছে আমার মনের আবেগ প্রকাশ করি; কিন্তু মনকে প্রশান্তি দেওয়ার মতো কোনো আকীদা-বিশ্বাসের সন্ধান তাদের কাছে পাইনি। অতঃপর আমি সবখানে মিল্লাতে ইবরাহীমের সন্ধান করতে থাকি। এ অনুসন্ধানেরই এক পর্যায়ে আমি সিরিয়ায় পৌঁছি। সেখানে গিয়ে জানতে পারি এক পাদ্রির কাছে আসমানী কিতাবের শিক্ষা রয়েছে। ঐ পাদ্রির সান্নিধ্যে গেলাম। তাকে আমার মনের কথা খুলে বললাম।'

তিনি বললেন :

'হে মক্কার ভাই, আমার ধারণা যে, তুমি দীনে ইবরাহীমের সন্ধান করছ।'

উত্তর দিলাম :

'হ্যাঁ, সেটাই আমার জীবনের একমাত্র কাম্য।'

তিনি বললেন :

'তুমি এমন একটি ধর্মের সন্ধান করছ, যা বর্তমানে হারিয়ে গেছে। তুমি আর ঘোরাফেরা না করে মক্কায় চলে যাও। আল্লাহ শীঘ্রই তোমাদের গোত্রে এমন এক নবী প্রেরণ করবেন, যিনি দীনে ইবরাহীমকে তোমাদের কাছে পেশ করবেন। যদি তোমার জীবদ্দশায় তাকে পেয়ে যাও নিঃসন্দেহে তার অনুসরণ করো।'

একথা শুনে যায়েদ দ্রুত মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। মক্কায় তার আগমনের পূর্বেই আল্লাহ দীনে হক ও হেদায়াতসহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যায়েদের সাক্ষাৎ হলো না। কারণ, বেদুইন দস্যুদের একটি দল তাকে পথে আক্রমণ করলে তিনি পথেই জীবন হারান। এভাবেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দর্শন থেকে তার চক্ষুদ্বয় বঞ্চিত থাকে। যায়েদ অন্তিম অবস্থায় আকাশের দিকে তাকিয়ে সর্বশেষ যে কথাগুলো উচ্চারণ করতে থাকেন তা হলো–

'হে আল্লাহ! আমাকে যদিও এই কল্যাণ থেকে তুমি বঞ্চিত করলে, কিন্তু আমার ছেলে সাঈদকে তা থেকে বঞ্চিত করো না।'

আল্লাহ যায়েদের এই দু'আ কবুল করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনগণকে ইসলামের দাওয়াত দিতে আরম্ভ করলে প্রথম সারির যেসব সাহাবী আল্লাহর প্রতি ঈমান আনেন ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের সাক্ষ্য দান করেন, সাঈদ ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম। সাঈদ-এর মতো ব্যক্তির সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে আশ্চর্যের কিছুই নেই। কারণ, সত্যিকার অর্থেই সাঈদ এমন একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যে পরিবারের প্রতিটি সদস্যই ছিল কুরাইশদের ধর্মীয় রীতি-নীতির চরম বিরোধী। তিনি এমন এক পিতার সন্তান ছিলেন, যার গোটা জীবনই শেষ হয়েছে সত্যের সন্ধানে।

সাঈদ ইবনে যায়েদ শুধু একাই ইসলাম গ্রহণ করেননি, বরং তাঁর সাথে তাঁর স্ত্রী উমর ইবনে খাত্তাবের বোন ফাতেমা বিনতে খাত্তাবও ইসলাম গ্রহণ করেন।

এই কুরাইশ যুবক ইসলাম গ্রহণের অপরাধে তার গোত্রের যে কোনো ব্যক্তির তুলনায় বেশি নির্যাতন ভোগ করেছেন।

তার ওপর অবর্ণনীয় যুলুম-অত্যাচার হওয়া সত্ত্বেও কুরাইশরা তাকে ও তার স্ত্রীকে ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি; বরং তার স্ত্রী ফাতেমা কুরাইশদের থেকে এমন এক লৌহ মানবকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন, যার গুরুত্ব ইসলামের ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। অতীব গুরুত্বপূর্ণ সেই ব্যক্তি হলেন উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।

সাঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মাত্র কুড়ি বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি যৌবনের সর্বশক্তি ইসলামের সম্প্রসারণে নিয়োগ করেন। তিনি একমাত্র বদর যুদ্ধ ছাড়া আর সব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। বদর যুদ্ধের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বিশেষ এক গুরুত্বপূর্ণ কাজে মদীনার বাইরে প্রেরণ করলে তিনি বদর যুদ্ধে অংশ নেওয়া থেকে বঞ্চিত হন।

পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের পতনের জন্য মুসলিম বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ অভিযানেও তিনি শরীক ছিলেন। শুধু আনুষ্ঠানিকভাবে অংশগ্রহণই করেননি; বরং তিনি উভয় যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন।

ইয়ারমুকের যুদ্ধে সাঈদ ইবনে যায়েদের বীরত্ব ও সাফল্য তো রীতিমত ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।

তাঁর নিজের থেকেই আমরা ঐ দিনের তাঁর বীরত্বের ঘটনা শুনি :

'ইয়ারমুক যুদ্ধে আমরা ছিলাম প্রায় (২৪,০০০) চব্বিশ হাজার যোদ্ধা। অন্যদিকে রোমানদের সৈন্যসংখ্যা ছিল ১,২০,০০০ (এক লাখ বিশ হাজার)। এই বিশাল সৈন্যবাহিনী ধীরগতিতে এমনভাবে আমাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, যেন অদৃশ্য শক্তিতে চালিত চলন্ত এক পাহাড়। এ বাহিনীর অগ্রভাগে ছিল ক্রুশ। এই ক্রুশ বহন করছিল বিশপ পাদ্রি ও সন্ন্যাসীরা। তারা জোরে জোরে স্লোগান দিচ্ছিল। সৈন্যরাও সেগুলোর পুনরাবৃত্তি করে স্লোগানের উত্তর দিচ্ছিল এবং তা বজ্রের ন্যায় প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল।

'রোমানদের বিরাট বাহিনীর এ দৃশ্য ও বিপুল সংখ্যাধিক্য মুসলিম বাহিনীর মনেও কিছুটা ভীতির সঞ্চার করে। এ অবস্থায় আবূ উবাইদা ইবনে আল জাররাহ দাঁড়িয়ে তাদেরকে লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন।'

তিনি বলেন :

'হে আল্লাহর বান্দাগণ, আপনারা জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর পথে আল্লাহর জন্য লড়াই করুন। আল্লাহ আপনাদের সাহায্য করবেন এবং শত্রু বাহিনীর মোকাবেলায় আপনাদের অবস্থানকে দৃঢ়তা দান করবেন। হে আল্লাহর বান্দারা, ধৈর্য ধারণ করুন। ধৈর্যই কুফরী থেকে পরিত্রাণ, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং অপমান ও গ্লানি থেকে অব্যাহতি লাভের একমাত্র উপায়। আপনারা বর্মের সাহায্যে নিজেদের সুরক্ষিত করুন এবং বর্শাসমূহকে তাক করে ধরুন। পূর্ণ নীরবতা পালন করুন। মনে মনে শুধু আল্লাহর স্মরণ করতে থাকুন। ইনশাআল্লাহ আমি এখনই যুদ্ধ আরম্ভ করার নির্দেশ দিচ্ছি ...।'

সাঈদ ইবনে যায়েদ বর্ণনা করেন :

'এ মুহূর্তে মুসলিম বাহিনীর এক যোদ্ধা তার ব্যূহ থেকে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে আবূ উবাইদাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বলেন :

আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, এ মুহূর্তেই শাহাদাতবরণ করব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কি আপনার তরফ থেকে কোনো সংবাদ দেওয়ার আছে? তাহলে তা আমার মাধ্যমে প্রেরণ করতে পারেন।'

আবূ উবাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বললেন :

'হ্যাঁ, অবশ্যই আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার ও মুসলিম বাহিনীর পক্ষ থেকে সালাম জানাবেন এবং তাঁকে বলবেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহ আমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তার সবটাই আমরা হাতে হাতে পেয়েছি।'

সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন :

'তার এ কথা শোনার পরক্ষণেই আমি দেখলাম, সে কোষ থেকে তরবারি উন্মুক্ত করে শত্রুবাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সাথে সাথে আমিও নিচু হয়ে দু-হাঁটুতে ভর দিয়ে বর্শা তাক করে আমার দিকে অগ্রসরমান প্রথম অশ্বারোহী শত্রুকে চ্যালেঞ্জ করেই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। দেখলাম, সেই মুহূর্তে আমার মনের সব ভীতি দূর হয়ে গেছে।

মুহূর্তের মধ্যে আমার বর্শার অগ্রভাগ তার দেহ ভেদ করে পিছন দিক দিয়ে বের হয়ে গেল। সবাই এ মুহূর্তে রোমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং প্রাণপণে লড়াই করতে থাকল। পরিশেষে, আল্লাহ মুসলিম বাহিনীকে বিজয় দান করলেন।'

সাঈদ ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এরপর সিরিয়ার রাজধানী দামেশক বিজয়ে অংশ নেন। দামেশকবাসী মুসলিম বাহিনীর আনুগত্য স্বীকার করলে আবূ উবাইদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁকে দামেশকের গভর্নর নিযুক্ত করেন। তিনিই দামেশকের প্রথম মুসলিম গভর্নর।

বনূ উমাইয়ার শাসনামলে সাঈদ ইবনে যায়েদের জীবনে এমন একটি ঘটনা ঘটে, যে বিষয়ে মদীনাবাসী দীর্ঘদিন পর্যন্ত আলোচনা করতে থাকে।

ঘটনার সূত্রপাত হয় এভাবে,

আরওয়া বিনতে ওয়াইস নামের এক মহিলা এ সন্দেহ করে যে, সাঈদ ইবনে যায়েদ তার জমির কিছু অংশ নিজ জমির সাথে একীভূত করে নিয়েছেন। এ

বিষয়ে সমাজের সর্বস্তরে সে তার অভিযোগ ছড়াতে থাকে। এখানেই শেষ নয়, সে মদীনার গভর্নর মারওয়ান ইবনে হাকামের কাছেও বিচার দাবি করে। মারওয়ান ইবনে হাকাম এর নিষ্পত্তির লক্ষ্যে তার কাছে কতিপয় লোক প্রেরণ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সাহাবীর বিষয়টি বড়ই পীড়াদায়ক বলে মনে হয়।

সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন :

'সে মনে করে যে, আমি তার প্রতি যুলুম করছি। কিভাবে আমার পক্ষে তা সম্ভব?'

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে :

مَنْ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ طُوِّقَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِيْنَ -

'যে ব্যক্তি অন্যের এক বিঘত ভূমিও যুলুম করে নেবে কিয়ামতের দিন তার গলায় সাত স্তবক পর্যন্ত ভূমি ঝুলিয়ে দেওয়া হবে।'

'ইয়া আল্লাহ! যে দাবি করছে, আমি তার জমি দখল করে নিজ সীমানার অন্তর্ভুক্ত করেছি, সে যদি মিথ্যাবাদিনী হয়, তাহলে তাকে অন্ধ করে দাও এবং যে কূপ আমি দখল করেছি বলে অভিযোগ করেছে, তার মধ্যে তাকে নিক্ষেপ করো। আমার পক্ষে এমন জ্বলন্ত প্রমাণ দেখাও যাতে সবাই জানতে পারে যে, আমি তার ওপর যুলুম করিনি।'

কিছুদিন যেতে না যেতেই মদীনায় প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে ভীষণ বন্যা হয়, যার ফলে আকীক উপত্যকা বন্যায় ভেসে যায়। এমন বন্যা অতীতে আর কখনো দেখা যায়নি। এ বন্যায় জমির সীমানার ওপর জন্মে ওঠা মাটির স্তূপ ধুয়ে যায় এবং প্রকৃত সীমানা বের হয়ে পড়ে। ফলে মদীনাবাসী জানতে পারে যে, সাঈদ ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার দাবিতে সত্য ও সঠিক। এর প্রায় এক মাসের মধ্যেই সেই মহিলা অন্ধ হয়ে যায় এবং অন্ধাবস্থায় সে তার জমিতেই চলাফেরার এক পর্যায়ে সেই কূপে নিপতিত হয়।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা বলেন :

'আমরা ছোট বেলায় লোকদের অভিশাপ দিতে শুনতাম।'

তারা বলত যে :

'আল্লাহ তোমাকে আরওয়ার মতো অন্ধ করে দিক।'

এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

اِتَّقُوْا دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ.

'মযলুমের বদদু'আ থেকে সতর্ক থাকো। কেননা, মযলুমের দু'আ ও আল্লাহর মাঝে কোনোই অন্তরাল থাকে না।'

এখানে মযলুম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী সাঈদ ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, যিনি আশারায়ে মুবাশশারার অন্যতম।

---

সাঈদ ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জীবনী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য সহায়ক গ্রন্থাবলি :


১. তাবাকাত ইবনে সা'দ : ৩য় খণ্ড, ২৭৫ পৃ.।
২. তাহযীব ইবনে আসাকির : ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১২৭ পৃ.।
৩. সিফাতুস সাফওয়া : ১ম খণ্ড, ১৪১ পৃ.।
৪. হুলিয়াতুল আওলিয়া : ১ম খণ্ড, ৯৫ পৃ.।
৫. আররিয়াদ আননুদরা : ২য় খণ্ড, ৩০২ পৃ.।
৬. হায়াতুস সাহাবাহ : ৪র্থ খণ্ডের সূচি দ্রষ্টব্য।

# উমাইর ইবনে সা'দ (রা)

## (বাল্য জীবন)

*'উমাইর ইবনে সা'দ (রা) এক বিরল ব্যক্তিত্ব।'*

*—উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু*

পিতৃহীন শিশু উমাইর ইবনে সা'দ জন্ম থেকেই সীমাহীন অভাব-অনটন ও অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে জীবনাতিবাহিত করতে থাকেন। তাঁর পিতা তাঁকে অভিভাবক ও কপর্দকহীন রেখে ইনতিকাল করেন। তাঁর অসহায় মা আওস গোত্রের জুলাস ইবনে সুওয়াইদ নামক ধনাঢ্য জনৈক ব্যক্তির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। জুলাস ইবনে সুওয়াইদ শিশু উমাইর ইবনে সা'দকেও তার মা'র সাথে নিজ পরিবারভুক্ত করে তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

জুলাস উমাইরকে এমন পিতৃস্নেহে সযত্নে লালন-পালন করতে থাকে যে, উমাইর তাঁর পিতৃবিয়োগের কথা একেবারেই ভুলে যায়। উমাইর যেমন জুলাসকে নিজ পিতার মতোই ভক্তি-শ্রদ্ধা ও সম্মান করত, তেমনি জুলাসও উমাইরকে নিজ সন্তানের মতোই আদর ও স্নেহ করত।

উমাইরের বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার প্রতি জুলাসের স্নেহও বাড়তে থাকে। প্রতিটি কাজে, আচার-আচরণে, চলাফেরায়, শিষ্টাচারে, নীতি-নৈতিকতায়, চারিত্রিক গুণাবলিতে, সততা ও দীনদারীতে উমাইরের সমকক্ষ দ্বিতীয় আর কাউকে জুলাস দেখেনি। তাই উমাইরের প্রতি জুলাস খুবই খুশি। দশ বছর বয়স হওয়ার আগেই উমাইর ইসলাম গ্রহণ করেন। নিষ্পাপ বালক উমাইরের পবিত্র

অন্তরে ইসলাম তার সৌরভ ছড়াতে থাকে। শিশুকাল থেকেই উমাইর নিয়মিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে জামাআতে নামায আদায়ে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। উমাইরকে কখনো একা একা, কখনো বা স্বামীর সাথে মসজিদে নববীতে নামাযের উদ্দেশ্যে যাতায়াত করতে দেখে উমাইরের মায়ের বুক আনন্দে ভরে উঠতো। সোহাগ-যত্নে ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে আনন্দঘন পরিবেশে উমাইর খুবই শান্তির সাথে দিনাতিপাত করছিলেন। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাঁর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অন্তরায় বলতে কিছু ছিল না; কিন্তু এই ঈমানদার কিশোরকে আল্লাহ এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করলেন। এত অল্প বয়সে খুব কমই কেউ এরূপ কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছে।

নবম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোমান সম্রাটের বিরুদ্ধে তাবুক যুদ্ধের ঘোষণা দিলেন এবং এ যুদ্ধের জন্য আর্থিক সাহায্য ও মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য সর্বস্তরের মুসলমানদের কাছে উদাত্ত আহবান জানালেন। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো যুদ্ধাভিযানে বের হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন, তখন কার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে যাচ্ছেন বা কোন্ দিকে অভিযান পরিচালনা করতে যাচ্ছেন তা কখনো প্রকাশ করতেন না। বরং যেদিকে অভিযান পরিচালনা করতেন, ভাবখানা এমন দেখাতেন, যেন তার বিপরীত দিকে অভিযান পরিচালিত হবে। কিন্তু তাবুকের যুদ্ধে এর বিপরীত ঘটনা ঘটল। এবার তিনি প্রথমবারের মতো প্রকাশ্যে যুদ্ধ যাত্রার ঘোষণা দিলেন। এর কারণ হয়তো এই ছিল যে, যুদ্ধক্ষেত্রের দূরত্ব ও দুর্গম পথ অতিক্রম করা ও বিশাল শত্রুবাহিনীর মোকাবেলায় মুসলমানরা নিজেদের সার্বিক প্রস্তুতির পূর্ণ সুযোগ যেন গ্রহণ করতে পারে। সময়টিও ছিল এমন যে, গ্রীষ্মের দাবদাহ চলছিল, খেজুর কাটা আরম্ভ হয়েছিল। মরুভূমির প্রচণ্ড গরমে ছায়া-শীতল পরিবেশের প্রতি মানুষ যেন খুবই আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। আরাম-আয়েশ ও অলসতা লোকালয়কে অনেকটা আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। এ পরিস্থিতি সত্ত্বেও মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহ্বানে সাড়া দিয়ে যথাসাধ্য যুদ্ধের সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

অপরদিকে মুনাফিক শ্রেণী নানাভাবে মুসলমানদের সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করে তাদেরকে নিরুৎসাহিত করতে থাকল এবং সভা ও মাহফিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে নানারূপ কুৎসা রটনা ও অযথা ইঙ্গিত করতে থাকল। এমনকি মুনাফিকরা বিশেষ বিশেষ বৈঠকে এমন সব অকথ্য ভাষায় মন্তব্য করতে শুরু করল, যা সন্দেহাতীতভাবে কুফরীর পর্যায়ে পড়ে। যুদ্ধ প্রস্তুতির দিনগুলোর কোনো একদিন উমাইর মসজিদে নববী থেকে নামায আদায়শেষে যে অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখলেন, তা তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করল। কিভাবে মুজাহিদরা জিহাদের জন্য প্রতিযোগিতামূলক নাম লেখাচ্ছেন, জিহাদের ফান্ডে অকাতরে দানের যে প্রতিযোগিতা চলছে, তাও তিনি স্বচক্ষে দেখলেন। এসব দৃশ্য দেখে তিনি অভিভূত হলেন। তিনি আরো দেখছিলেন, মুহাজির ও আনসার রমণীরা দলে দলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে হাজির হয়ে তাদের হাতের বালা, গলার মালা ও অন্যান্য স্বর্ণালংকার খুলে পেশ করছেন। এসবের বিক্রয়লব্ধ অর্থ জিহাদে অংশগ্রহণকারী যোদ্ধা ও জিহাদের বহুমুখী প্রয়োজনে ব্যয় করার জন্য তারা আবেদন জানাচ্ছেন। তিনি স্বচক্ষে এও প্রত্যক্ষ করলেন যে, উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ১০০০ (এক হাজার) স্বর্ণমুদ্রার একটি থলে এনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে পেশ করলেন। আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ২০০ (দুই শত) স্বর্ণখণ্ডের একটি বস্তা কাঁধে করে এনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে পেশ করলেন। এমনকি এক ব্যক্তি তার বিছানাপত্র এনে হাজির করলেন, যেন তা বিক্রি করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ জিহাদের প্রয়োজনে তরবারি ক্রয়ে ব্যয় করা হয়। ত্যাগ ও কুরবানীর এসব ঘটনা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে একদিকে উমাইর যেমন উৎসাহিত ও আনন্দিত হন, অপরদিকে জুলাসের বিপুল অর্থ-সম্পদ থাকা সত্ত্বেও কেন সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহবানে সাড়া দিচ্ছেন না, তা দেখেও অবাক হচ্ছিলেন।

জুলাসের মনে যুদ্ধে অংশগ্রহণের আগ্রহ সৃষ্টি ও ঈমানী চেতনা জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে মসজিদে প্রত্যক্ষ করা ঘটনাবলি উমাইর তাকে শোনাতে মনস্থ করলেন। বিশেষ করে সমরাস্ত্র ও যানবাহনবিহীন লোকদের কথা, যারা ঈমানী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে নিজেদের পেশ করছিলেন এই বলে যে, তাদেরকে অস্ত্র ও যানবাহন সরবরাহ করলে তারা জিহাদে অংশগ্রহণ করতে প্রস্তুত, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ফেরৎ দিচ্ছিলেন। কারণ, তাঁর কাছে এত যানবাহন ছিল না। তারা জিহাদে অংশগ্রহণ করতে এবং শাহাদাতের জান্নাতী সুধা পানে ব্যর্থ হয়ে ভগ্নহৃদয়ে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে স্ব-স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। এ সব দৃশ্যও জুলাসের কাছে উমাইর বর্ণনা করতে সিদ্ধান্ত নিলেন। অতঃপর এসব ঘটনা ও দৃশ্য উমাইর তাকে বলতে লাগলেন। আর অত্যন্ত আগ্রহভরে জুলাসও তার কথাগুলো শুনছিল। এসব শুনতে শুনতে হঠাৎ জুলাস এমন একটি মন্তব্য করে ফেলল, যা শুনে উমাইর হতভম্ব হয়ে গেলেন।

জুলাসের সে কথা ছিল এই :

> 'মুহাম্মদ যদি তার নবুওয়াতের দাবিতে সত্য হয়ে থাকে, তাহলে আমরা গাধার চেয়েও নিকৃষ্ট।'

উমাইর তো হতভম্ব! একি! জুলাসের মতো বয়ঃপ্রাপ্ত জ্ঞানী ব্যক্তির মুখ থেকে এসব বাক্য কি উচ্চারিত হতে পারে? এমন বাক্য উচ্চারণ মাত্রই ঈমান চলে যায় এবং সাথে সাথে সে কুফরীর অতল গহবরে নিমজ্জিত হয়। এই নাজুক মুহূর্তে কী করা যায়, এ নিয়ে তড়িৎ চিন্তা-ভাবনা করে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, জুলাসের ব্যাপারে নীরব থাকা যায় না। তার এ কথা কাউকে না বলার অর্থই হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা। ইসলামী সংগঠন ও আন্দোলনের ক্ষতি করা এবং ইসলামবিরোধী শক্তির বিশেষ করে মুনাফিকদের সাহায্য করা। উমাইর এ কথাও চিন্তা করলেন যে, জুলাস পিতৃতুল্য এবং তার নিজের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল। তার এ কথা প্রচার করা তো রীতিমতো নাফরমানী এবং তার ইহসান ও দয়ার প্রতিদানের কৃতঘ্ন হওয়া। কারণ, তাঁর নিরাশ্রয় ও ইয়াতীম অবস্থায় জুলাস তাঁর আশ্রয়দাতা। তার যত দুঃখ-কষ্ট ও অভাব ছিল সবই তার ওসীলায় দূর হয়েছে। দুটি পরস্পরবিরোধী বিষয়ের যে কোনো একটি তাঁকে গ্রহণ করতে হবে। একটি পথই তাঁকে ধরতে হবে। তাই অতি দ্রুত একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি জুলাসকে বললেন :

> 'আল্লাহর কসম! এই ভূ-পৃষ্ঠে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আমার নিকট আপনার চেয়ে প্রিয়জন আর কেউ নেই। আমার কাছে আপনি এমন এক অতীব প্রিয় ও সম্মানিত ব্যক্তি, যার প্রতিদান দেওয়া কোনোদিনই আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনি যা বলেছেন, তা যদি প্রকাশ করে দেই, তাহলে আপনি নিঃসন্দেহে লাঞ্ছিত হবেন। আর যদি তা প্রকাশ না করি,

তাহলে তা হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে খিয়ানত। যার অর্থ সত্য ও দীনকে ধ্বংস করে মুনাফিকদের হাতে হাত মিলানোর নামান্তর। আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি যে, আপনি যা বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তা জানাব, আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য যা করার তা করুন।'

এই কথা বলে উমাইর ওঠে দাঁড়ালেন এবং মসজিদে নববীর দিকে রওয়ানা হলেন। উমাইর মসজিদে নববীতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে জুলাস যে কটূক্তি করেছে তা জানালেন।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমাইরকে তাঁর কাছে বসিয়ে রেখে এক সাহাবীকে দিয়ে জুলাস ইবনে সুওয়াইদকে ডেকে পাঠালেন। জুলাস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁর খিদমতে উপস্থিত হলো এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম জানিয়ে তাঁর সামনে বসে পড়ল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সম্পর্কে উমাইরের অভিযোগের বর্ণনা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন উমাইর যা বলেছে, তা সঠিক কি না?

উত্তরে জুলাস বলল :

'হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আপনার উপর শান্তি বর্ষণ করুন। সে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে এবং মনগড়া অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে। আমি কখনো এসব বাক্য উচ্চারণ করিনি।'

উপস্থিত সাহাবীগণ জুলাস ও বালক উমাইর ইবনে সা'দ-এর মুখমণ্ডলের দিকে বারবার তাকাচ্ছিলেন এবং তাদের অন্তরের গোপন অবস্থা যা তাদের চেহারায় পরিস্ফুটিত হচ্ছিল তা অবলোকনের চেষ্টা করছিলেন। তারা উভয়ের পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি পেশ করতে লাগলেন। মুনাফিকদের একজন বলে উঠল :

'নাফরমান ছেলে! যে তার উপকার করেছে, সে তাকেই কষ্ট দিচ্ছে ও তাকেই বেইজ্জতি করছে।'

সাহাবীদের একজন প্রত্যুত্তরে বললেন :

'তা কী করে হয়! সে একটি খোদাভীরু ছেলে, সে ইসলামী অনুশাসনের মধ্যে বেড়ে উঠেছে। তার চেহারার অভিব্যক্তিতে সত্যবাদিতার আভাস

পাওয়া যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমাইরের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন, তার মুখমণ্ডল অত্যধিক রক্তিম হয়ে উঠেছে এবং দু'চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে তার দু'গাল ও বুক সিক্ত করছে।'

উমাইর ক্রন্দনরত স্বরে বললেন :

اَللّٰهُمَّ اَنْزِلْ عَلٰى نَبِيِّكَ بَيَانَ مَا تَكَلَّمْتُ بِهِ...

اَللّٰهُمَّ اَنْزِلْ عَلٰى نَبِيِّكَ بَيَانَ مَا تَكَلَّمْتُ بِهِ...

'হে আল্লাহ, আমি যা বলেছি, তার সমর্থনে তোমার নবীর উপর ওহী নাযিল করো।'

উমাইরের এই আহাজারীর প্রতিবাদে জুলাস নিজের সাফাই দিয়ে বলল :

'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আপনাকে যা বলেছি সেটাই সত্য। আপনি চাইলে আমি আপনার সামনে আল্লাহর নামে শপথ করব।'

আমি আল্লাহর কসম করে বলছি :

'উমাইর আপনাকে আমার সম্পর্কে যা বলেছে, আমি তার কিছুই বলিনি।'

তার এ ধরনের শপথবাক্য শ্রবণের পর উপস্থিত সবার দৃষ্টি উমাইরের প্রতি নিবদ্ধ হলো। এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর প্রশান্তভাব নেমে এল। নিথরতা আচ্ছাদিত হলো। সাহাবীগণ বুঝতে পারলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ওহী নাযিল হচ্ছে। সবাই নিজ নিজ জায়গায় নীরব ও নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহও যেন অসাড় হয়ে পড়ল। সবারই দৃষ্টি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে। না জানি কার বিপক্ষে আল্লাহর নির্দেশ অবতীর্ণ হয়। এবার জুলাস আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল। উপস্থিত সবাই বরং আনন্দ অনুভব করে উমাইরের দিকে তাকাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর থেকে প্রশান্তভাব কেটে গেল। তিনি অবতীর্ণ ওহী তিলাওয়াত করে শোনালেন–

يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا وَمَا نَقَمُوْا اِلَّآ اَنْ اَغْنٰهُمُ اللّٰهُ

وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا .

'তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলে যে, তারা কিছু বলেনি, অথচ তারা নিশ্চয়ই কুফরীর কথা বলেছে। তারা ইসলাম গ্রহণের পর কুফরী অবলম্বন করেছে। আর তারা সেসব কাজ করার ইচ্ছা করেছিল, যা তারা করতে পারেনি। তাদের এসব ক্রোধ কেবল এ কারণেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল ও ধনশালী করে দিয়েছেন। এখন যদি তারা নিজেদের এ আচরণ থেকে ফিরে আসে, তবে তাদের পক্ষেই ভালো, অন্যথায় আল্লাহ তাদের অত্যন্ত পীড়াদায়ক শাস্তি দান করবেন দুনিয়ায় ও আখিরাতেও, আর পৃথিবীতে তারা নিজেদের কোনো সমর্থক ও সাহায্যকারী পাবে না।' (সূরা তাওবা : ৭৪)

জুলাস তার সম্পর্কে কুরআনের অবতীর্ণ আয়াত শুনে ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল। ভয়ে তার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছিল, এমনকি মুখে একটি কথাও উচ্চারণ করতে পারছিল না। আতঙ্কিত জুলাস হাত জোড় করে কেঁদে কেঁদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগল :

'আমি তাওবা করছি ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমি তাওবা করছি ইয়া রাসূলাল্লাহ। উমাইর সত্য বলেছে, আমিই মিথ্যাবাদী। দু'আ করুন আল্লাহ যেন আমার তাওবা কবুল করেন। আমি এ মুহূর্ত থেকে আপনার জন্য নিজেকে কুরবান করে দিলাম। আমি সত্যিকার অর্থেই আপনার খিদমতে সাচ্চা মনে নিজেকে বিলিয়ে দিলাম।'

এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বালক উমাইর ইবনে সা'দ-এর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। ঈমানী জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হলো উমাইরের চেহারা, যা আনন্দাশ্রুতে সিক্ত হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত মোবারক স্নেহাস্পদ উমাইরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে আদরভরে তাঁর কান ধরে বললেন :

وَفَتْ أُذُنُكَ يَا غُلَامُ مَا سَمِعَتْ وَصَدَّقَكَ رَبُّكَ .

'হে বালক! তোমার কান যা শুনেছে, যথার্থই শুনেছে এবং তোমার রব তোমার সত্যবাদিতার সাক্ষ্যদান করেছেন।'

এখন থেকে জুলাস সত্যিকার অর্থে ইসলামে প্রবেশ করে নিষ্ঠার সাথে ইসলামী জীবন যাপন আরম্ভ করলেন ও কায়মনে ইসলামের অনুশাসন মেনে চলতে লাগলেন। তিনি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ উমাইরের প্রতি অত্যন্ত আন্তরিকতা ও ভালোবাসার পরিচয় দিতেন বলে সাহাবীরা জানতেন। যখনই উমাইরের কথা উঠত তিনি বলতেন, আমার পক্ষ থেকে আল্লাহ তাকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুক। কেননা, সে আমাকে কুফরী থেকে বাঁচিয়েছে এবং জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করেছে। যা কিছু বর্ণিত হলো তা বালক সাহাবী উমাইর ইবনে সা'দ-এর বিপ্লবী জীবনের শৈশবকাল মাত্র। তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হবে তাঁর জীবনের আর একটা বিপ্লবী দিক থেকে, যা খুবই চমৎকার ও মনোমুগ্ধকর। যা প্রিয় পাঠকদের খিদমতে তাঁর যৌবনের আর একটা চমকপ্রদ ঘটনা।

---

উমাইর ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জীবনী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সহায়ক গ্রন্থাবলি :

১. আল ইসাবাহ : জীবনী নং ৬০৩৬।
২. আল ইসতিয়াব (ইসাবাহর টীকা) ২য় খণ্ড, ৪৮৭ পৃ.।
৩. উসদুল গাবাহ : ১ম খণ্ড, ২৯৩ পৃ.।
৪. সিয়ারু আ'লামুন নুবালা : ১ম খণ্ড, ৮৬ পৃ.।
৫. হায়াতুস সাহাবা : ৪র্থ খণ্ড, সূচিপত্র দ্রষ্টব্য ।
৬. কাদাতুল ফাতহিল ইরাক ওয়াল জাযীরা : ৫১৩ পৃ.।
৭. আল আ'লাম : ৫ম খণ্ড, ২৬৪ পৃ.।

# উমাইর ইবনে সা'দ (রা)

## (কর্মজীবন)

*'তোমাদের কাছে আশা করছি যে, তোমাদের ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতা আমার কাছে উমাইর ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতার মতো নির্ভরযোগ্য হোক, যেন রাষ্ট্রীয় দায়িত্বভার দিয়ে আস্থা রাখতে পারি।'*

*–উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)*

প্রিয় পাঠক!

প্রখ্যাত সাহাবী উমাইর ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বাল্যকালের চাঞ্চল্যকর ঘটনার প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। এখন আমরা তাঁর কর্মবহুল জীবনের আরেকটি ঘটনার উল্লেখ করছি। উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কর্মজীবনের এ ঘটনা তাঁর বাল্য-জীবনের বর্ণিত ঘটনার চেয়ে কোনো অংশে কম আকর্ষণীয় নয়।

মধ্য সিরিয়ায় দামেশক ও হালাব-এর মধ্যবর্তী স্থানে 'হিম্‌স' নগরী অবস্থিত। যেখানে রয়েছে প্রখ্যাত সাহাবী খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কবর। হিম্‌সবাসী সর্বদাই তাদের গভর্নরের নানাবিধ ত্রুটি-বিচ্যুতি খুঁজত এবং তিলকে তাল করে আমীরুল মুমিনীন উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিকট অভিযোগ করত। কোনো গভর্নরই তাদের তীব্র সমালোচনা থেকে মুক্ত ছিলেন না। যাকেই গভর্নর নিযুক্ত করা হতো, তারই বিভিন্ন দোষ-ত্রুটি বের করে আমীরুল মুমিনীন উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে অভিযোগ

দায়ের করত এবং তদস্থলে ভালো অন্য কোনো ব্যক্তিকে গভর্নর হিসেবে নিয়োগের আবেদন জানাত। এই প্রেক্ষাপটে উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাদের জন্য এমন এক ব্যক্তিকে গভর্নর নিযুক্ত করার চিন্তা করলেন, যিনি হবেন সব অভিযোগের ঊর্ধ্বে ও তাঁর চরিত্র হবে ক্রুটিমুক্ত। এ লক্ষ্যে তিনি একজন সুদক্ষ তীরন্দাযের ন্যায় তূণ থেকে একটা একটা করে তীর বের করে একটা পছন্দসই তীর বাছাই করার ন্যায় এমন এক ব্যক্তিকে খুঁজতে থাকলেন, যিনি হিম্‌স-এর গভর্নর হিসেবে উপযুক্ত হতে পারেন।

পরিশেষে তিনি উমাইর ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর চেয়ে খোদাভীরু ও যোগ্য ব্যক্তি আর কাউকে পেলেন না। অথচ উমাইর ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এ সময় বিজয়ী মুজাহিদদের এক বিশাল বাহিনীর সেনানায়ক হিসেবে সিরিয়ায় যুদ্ধরত ছিলেন। তিনি সিরিয়ায় একের পর এক দুর্গ জয় করে একদিকে ইসলামী রাষ্ট্রের পরিধি বিস্তৃত করছিলেন, অপরদিকে ঘটাচ্ছিলেন তাওহীদের ব্যাপ্তি। সে অঞ্চলের গোত্রগুলো তাঁর আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করে ইসলামে দীক্ষা নিতে শুরু করে। বিজিত অঞ্চলের প্রতিটি জনপদে তিনি ইসলামী শিক্ষা এবং ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে মসজিদ নির্মাণ করতে থাকেন! ইসলামী জ্ঞান ও শিক্ষাবিস্তারের মাধ্যমে সকল নাগরিকের ঈমানী মূল্যবোধ ও নৈতিকতাকে মযবুত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তাঁর এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত থাকার পরও আমীরুল মুমিনীন উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁকে মদীনায় ডেকে পাঠান। তিনি মদীনায় পৌঁছলে তাঁকে হিম্‌স প্রদেশের গভর্নর হিসাবে নিযুক্ত করেন এবং সেখানে গিয়ে দায়িত্বভার বুঝে নিতে নির্দেশ দেন। একজন সৈনিক হিসেবে আল্লাহর পথে জিহাদের চেয়ে তাঁর কাছে গভর্নরের পদটি অধিক গৌরবের ছিল না। তাই তিনি তা গ্রহণ করতে অনীহা প্রকাশ করলেও পরিশেষে আমীরুল মুমিনীন উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে সে পদ গ্রহণ করতে সম্মত হলেন।

উমাইর ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নবনিযুক্ত গভর্নর হিসেবে হিম্‌সে পৌঁছে জনসাধারণকে হিম্‌সের জামে মসজিদে সমবেত হতে আহ্বান জানালেন। নামাযশেষে উপস্থিত জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিতে দাঁড়িয়ে সর্বাগ্রে আল্লাহর প্রশংসা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরূদ পাঠ করে বললেন :

> 'প্রিয় ভাইয়েরা, ইসলাম নিঃসন্দেহে একটি সুরক্ষিত দুর্গ, তেমনি এর দরজাও দুর্ভেদ্য। আর ইসলামের দুর্গ হলো ন্যায়বিচার এবং এর দরজা হলো ইনসাফ বা ন্যায়পরায়ণতা। ন্যায়বিচারে পক্ষপাতিত্ব, সত্যের পরিপন্থী কার্যকলাপ, ইসলামের দুর্গকে ভেঙে চুরমার করে দেয়, যা ইসলামকে ধ্বংস করার শামিল। ইসলাম ততক্ষণ পর্যন্ত বিজয়ী ও শক্তির উৎস হিসেবে বিদ্যমান থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত শাসক তার শাসন ক্ষমতায় বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে। শাসকের বলিষ্ঠ ভূমিকার অর্থ ক্ষমতাবলে জনগণকে দমিয়ে রাখা বা তলোয়ারের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে নিপাত করা নয়; বরং ন্যায়বিচার ও সত্যবাদিতায় অটল থাকা।'

এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের পর তিনি জনগণের সামনে তাঁর কর্মসূচি তুলে ধরলেন। উমাইর ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দীর্ঘ এক বছর অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে হিম্‌সের শাসনভার পরিচালনা করেন। হিম্‌সবাসী আমীরুল মুমিনীন উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে কোনো অভিযোগ করেননি। আর না এ সময়ে উমাইর রাদিয়াল্লাহ আনহু উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে কোনো পত্র দেন কিংবা কেন্দ্রীয় বায়তুল মালে খিরাজের এক কপর্দক প্রেরণ করেন।

এ দীর্ঘ নীরবতা উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মনে সন্দেহের উদ্রেক করে। কেননা, তিনি তাঁর গভর্নরদের প্রতি সর্বদাই সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন, যেন ক্ষমতা তাদের কোনো রকম অন্যায় কাজে জড়িত না করে ফেলে। কারণ, উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর দৃষ্টিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত কোনো ব্যক্তিই মাসূম বা নিষ্পাপ হিসেবে গণ্য ছিলেন না।

অতঃপর তিনি তাঁর সেক্রেটারিকে নির্দেশ দিলেন যে, উমাইর ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে এই বলে নির্দেশ প্রেরণ করুন যে,

> 'এ পত্র পাওয়ামাত্র হিম্‌স ছেড়ে আমীরুল মুমিনীন-এর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মদীনায় চলে আসুন এবং আসার প্রাক্কালে মুসলমানদের খিরাজের যে অর্থ সংগ্রহ করেছেন তাও সঙ্গে নিয়ে আসুন।'

উমাইর ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আমীরুল মুমিনীন উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পক্ষ থেকে পত্র পাওয়ামাত্রই হিম্‌সবাসীর কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

অতঃপর তাঁর খাদ্যদ্রব্য বহনের একমাত্র থলেটিতে ওযূ করার বদনাটি ঢোকালেন, যুদ্ধাস্ত্র ও বর্মটি হাতে নিলেন এবং হিম্‌স নগর-এর গভর্নরের পদটি পেছনে রেখে পদব্রজে মরুপথে মদীনার দিকে রওনা হলেন। মদীনায় পৌঁছতে উমাইর ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর চেহারা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করল। পানাহারের অভাবে স্বাস্থ্য দুর্বল হয়ে পড়ল, দাড়ি, গোঁফ ও মাথার চুল লম্বা হয়ে গেল এবং সফরের ক্লান্তি তাঁকে ভীষণভাবে দুর্বল করে ফেলল। ভগ্ন স্বাস্থ্য, ক্লান্ত দেহে উমাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর দরবারে হাজির হলেন। তাঁর অবস্থা দেখে উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতভম্ব হয়ে গেলেন এবং বলে উঠলেন :

'উমাইর! তোমার এ কী অবস্থা হয়েছে?'

উমাইর ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু খালীফাতুল মুসলিমীনকে উত্তর দিলেন :

'কিছু হয়নি আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহর রহমতে আমার স্বাস্থ্য ভালো। কুরবানীর পশুকে যেভাবে তার দুটি শিং ধরে করায়ত্ত করা হয়, ঠিক সেভাবেই দুনিয়াকে সম্পূর্ণ বহন করে এনেছি।'

উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন :

'তুমি সাথে করে কী পরিমাণ দুনিয়া বহন করে এনেছ?'

উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ভাবছিলেন যে, বায়তুলমালের জন্য পর্যাপ্ত খিরাজের অর্থ বহন করে এনেছেন।

উমাইর ইবনে সা'দ উত্তরে বললেন :

'আমার বহন করে আনা সম্পদের মধ্যে আমার থলিটিতে আমার জিনিসপত্র ভরে এনেছি। যার একটি হলো প্লেট, যাতে খাবার খাই, কখনো বা তাতে কাপড়-চোপড় ধুই, কখনো বা তাতে পানি নিয়ে গোসল করি এবং একটি বদনা যা ওযূ ও পানি পানের জন্য ব্যবহার করে থাকি। এই আমার পুরো দুনিয়া। হে আমীরুল মুমিনীন! এরচেয়ে অধিক আর কিছুই আমার প্রয়োজন নেই। এমনকি আমার পরে আমার পক্ষের নিকটতমদের জন্যও নয়।'

উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জিজ্ঞাসা করলেন :

'তুমি কি হিম্‌স থেকে হেঁটে এসেছ?'

উমাইর ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উত্তর দিলেন :

'জী হ্যাঁ, আমীরুল মুমিনীন।'

উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জিজ্ঞাসা করলেন :

'রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে আরোহণের জন্য একটি ঘোড়াও দেওয়া হয়নি?'

উমাইর ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উত্তর দিলেন :

'হিম্‌স-এর বর্তমান দায়িত্বশীলগণ আমার জন্য এ ব্যবস্থা করেননি এবং আমিও তাদের কাছে তা চাইনি।'

উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন :

'বাইতুল মালের জন্য যা কিছু এনেছ তা কোথায়?'

উমাইর ইবনে সা'দ জানালেন :

'খালি হাতেই এসেছি।'

উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু প্রশ্ন করলেন :

'কেন?'

তিনি উত্তর দিলেন :

'হিম্‌স পৌঁছে সেখানকার খোদাভীরু, নেক ও সৎ লোকদের একত্র করি এবং তাদেরকে জনগণ হতে খিরাজ সংগ্রহ করার দায়িত্ব দেই। যখনই তারা খিরাজের অর্থ সংগ্রহ করে আনত, তা কিভাবে খরচ করা যায়, সে ব্যাপারে তাদের সাথে পরামর্শ করে প্রকৃত অভাবী লোকদের মধ্যে তা বিতরণ ও যথাযথ খাতে ব্যয় করা হতো।'

আমীরুল মুমিনীন উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উমাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর উত্তরে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে হিম্‌সের গভর্নর হিসেবে বহাল রাখার লিখিত ফরমান দেওয়ার জন্য সেক্রেটারিকে নির্দেশ দিলেন।

উমাইর ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সে পদে পুনরায় যোগদানে অপারগতা প্রকাশ করে বললেন :

'আমি এই দায়িত্ব গ্রহণে অপারগতা জানাচ্ছি। আমীরুল মুমিনীন! আমি কোনোক্রমেই আপনার অর্পিত এই দায়িত্বভার নিতে আগ্রহী নই। শুধু আপনারই নয়, আপনার পরেও যদি কেউ এ দায়িত্ব আমাকে অর্পণ করেন, তাঁর দেওয়া এ দায়িত্বও গ্রহণ করব না।'

অতঃপর উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে মদীনার পার্শ্ববর্তী স্থানে নিজ গ্রামে যেখানে তাঁর পরিবার-পরিজন অবস্থান করছেন তাদের সঙ্গেই বসবাস

করার অনুমতি চাইলে উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁকে সেখানে বসবাসের অনুমতি প্রদান করেন।

উমাইর ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু গ্রামের বাড়িতে যাওয়ার কিছুদিন যেতে না যেতেই উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর সাবেক গভর্নরকে পরীক্ষা করতে মনস্থ করলেন। উমাইর ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হিম্‌স থেকে ফিরে এসে যে বক্তব্য দিয়েছিলেন, তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার উদ্যোগ নিলেন।

আমীরুল মুমিনীন উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর একান্ত আস্থাভাজন হারেস নামক এক গোয়েন্দা কর্মকর্তাকে ডেকে বললেন :

'হারেস! উমাইরের বাড়িতে অতিথি হিসেবে যাও এবং তার সাথে সাক্ষাৎ কর। যদি তার মধ্যে বিন্দুমাত্র ভোগ-বিলাসিতা বা স্বাচ্ছন্দ্যের লক্ষণ দেখ, তবে কিছু না বলে মেহমান হিসেবেই চলে এস। আর যদি দেখ যে, দারিদ্র্যক্লিষ্ট অবস্থায় অভাব-অনটনে দিনাতিপাত করছে, তাহলে স্বর্ণমুদ্রার এই থলিটি তাকে অর্পণ কর।'

এই বলে উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ১০০ স্বর্ণমুদ্রার থলিটি হারেসের হাতে দিলেন।

উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নির্দেশে হারিস উমাইর ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হলেন ও জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তার বাড়ি খুঁজে বের করলেন। উমাইর-এর সাথে দেখা হওয়া মাত্র বললেন :

'আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ।'

জওয়াবান্তে। উমাইর ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করলেন :

'আপনি কোথা থেকে আগমন করেছেন?'

হারেস উত্তর দিলেন :

'মদীনা মুনাওয়ারা থেকে।'

উমাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন :

'সেখানকার মুসলমানদের অবস্থা কেমন দেখে এসেছেন?'

হারেস উত্তর দিলেন : 'ভালো।'

উমাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু প্রশ্ন করলেন :

'আমীরুল মুমিনীন উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কেমন আছেন?'

হারেস উত্তর দিলেন :

'ভালো ও নেক শাসক হিসেবে দায়িত্বে রত আছেন।'

উমাইর আবার প্রশ্ন করলেন : 'তিনি কি হদ্দ[১] জারি করেন?'

হারেস উত্তর দিলেন :

'অবশ্যই। তাঁর ছেলেকেও ব্যভিচারের অপরাধে অপরাধী হওয়ার কারণে বেত্রাঘাত করেছেন, এমনকি বেত্রাঘাতের কারণে সে মৃত্যুবরণ করেছে।'

উমাইর ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একথা শুনে বললেন :

'হে আল্লাহ! তুমি উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে সাহায্য কর। আমি তাঁর মতো আর কাউকে তোমাকে এত গভীরভাবে ভালোবাসতে দেখিনি।'

অতঃপর উমাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর দাওয়াতে হারিস তাঁর বাড়িতে তিন রাত কাটালেন। প্রতিটি রাতে মেহমানকে একটি মাত্র যবের পাতলা শুকনো রুটি খেতে দিতেন। তৃতীয় রাতে তাঁর গোত্রের এক ব্যক্তি তাঁর মেহমান হারেসকে উদ্দেশ্য করে বললেন :

'হে মেহমান! আপনি উমাইরের মেহমান হয়ে তাঁকে এবং তার স্ত্রীকে মহা বিপদে ফেলেছেন। তাদের ঘরে যবের এই পাতলা শুকনো রুটি ছাড়া অন্য কোনো খাবার নেই। তাও গত তিনদিন যাবৎ আপনাকে খেতে দিয়ে তারা উভয়েই ক্ষুধার্ত ও কষ্টের মধ্যে নিপতিত হয়েছেন। যদি মনে কিছু না করেন, তবে তাঁর পরিবর্তে আমার বাড়িতে মেহমান হতে পারেন।'

তখন হারেস তার নিকট উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর দেওয়া স্বর্ণমুদ্রা বের করে উমাইর ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে প্রদান করলেন। উমাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন :

'এটা কী?'

---

১. শরীআতের দৃষ্টিতে সরকারীভাবে ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীকে প্রকারভেদে বেত্রাঘাত বা পাথর মেরে হত্যা করাকে 'হদ্দ' বলে।

হারেস উত্তর দিলেন :

'আমীরুল মুমিনীন উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এগুলো আপনাকে পৌঁছানোর জন্য আমাকে প্রেরণ করেছেন।'

উমাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তা গ্রহণ না করে হারেসকে বললেন :

'উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে এসব ফেরৎ দিয়ে তাঁকে আমার সালাম জানাবেন আর বলবেন যে, উমাইরের এই স্বর্ণমুদ্রার কোনো প্রয়োজন নেই।'

উমাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর স্ত্রী পর্দার আড়াল থেকে মেহমান ও উমাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মধ্যকার কথোপকথন শুনছিলেন। তিনি স্বামীকে বললেন :

'গ্রহণ করুন, গ্রহণ করুন। যদি প্রয়োজন বোধ করেন নিজের জন্য খরচ করুন, নতুবা প্রকৃত হকদারদের মধ্যে বিতরণ করুন। এখানে তো অগণিত অভাবী লোকজন রয়েছে।'

হারেস তাঁর স্ত্রীর প্রস্তাব শুনে স্বর্ণমুদ্রাগুলো উমাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সামনে রেখে দ্রুত উঠে পড়লেন। উমাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু স্বর্ণমুদ্রাগুলো ছোট ছোট থলেতে ভরে গরীব-মিসকীন, বিধবা ও অসহায় বিশেষ করে শহীদ পরিবারের অসহায় সদস্যদের মাঝে রাতেই বিতরণ করেন।

হারেস মদীনায় ফিরে এলে উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কী দেখে এলে হারেস?

হারেস উত্তর দিলেন : 'চরম সংকটাপন্ন অবস্থা।'

উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাকে প্রশ্ন করলেন :

'স্বর্ণমুদ্রাগুলো কি তাকে দিয়েছো?'

হারেস উত্তর দিলেন : 'হ্যাঁ, হে আমীরুল মুমিনীন!'

উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জিজ্ঞাসা করলেন :

'সে তা কী করেছে?'

হারেস বললেন :

'জানি না, তবে মনে হচ্ছে, সে তার জন্য স্বর্ণমুদ্রা কেন, একটি রৌপ্য মুদ্রার সমপরিমাণও রাখবে না। হারেসের এ বক্তব্য শোনে উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু

তাআলা আনহু উমাইর ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে পত্র প্রেরণ করলেন। তাতে লিখলেন :

আমার এই পত্র পাওয়ার সাথে সাথে এমনকি পত্রখানা হাত থেকে রাখার পূর্বেই আমার সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হও।'

আমীরুল মুমিনীনের নির্দেশ মোতাবেক উমাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মদীনার পথে রওয়ানা হলেন। উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর দরবারে প্রবেশ করামাত্র খালীফাতুল মুসলিমীন তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। সম্মানের সাথে নিজের পাশে বসতে দিলেন এবং কুশল বিনিময়ের এক পর্যায়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন :

'স্বর্ণমুদ্রাগুলো কী করেছ?'

উমাইর উত্তর দিলেন :

'যখন স্বর্ণমুদ্রাগুলো আমার জন্য পাঠিয়েছেন, তখন সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে কী লাভ?'

উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন :

'আমি আশা করছি, তুমি সেসব স্বর্ণমুদ্রা দ্বারা কী করলে আমাকে একটু জানাবে।'

উমাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন :

'আমার নিজের জন্য সংরক্ষণ করেছি। যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনো কাজে আসবে না, সেদিন তা আমার উপকারে আসবে ভেবে। তার এ উত্তর শুনে উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।'

তিনি বলে উঠলেন :

'উমাইর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি নিশ্চয়ই সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত, যারা নিজের প্রয়োজনের উপর অন্যকে প্রাধান্য দেয়, যদিও তারা ভীষণ অভাবী।'

অতঃপর উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উমাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে এক ওয়াসাক–৬০ সা' যা বহনে একটি উটের প্রয়োজন হয়– পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য ও এক জোড়া কাপড় প্রদানের নির্দেশ দিলেন।

উমাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন :

আমীরুল মুমিনীন! আমাদের খাদ্যের প্রয়োজন নেই। আমি আসার সময় পরিবারের জন্য দু' সা' পরিমাণ যব রেখে এসেছি। আশা করছি, এ দু' সা' যব শেষ হতে না হতেই আল্লাহ আমাদের জন্য আরো রিযিকের ব্যবস্থা করবেন। আর কাপড় জোড়া নিচ্ছি এ জন্য যে, আমার স্ত্রীর কাপড় এমনভাবে ছিঁড়ে গেছে যে, সে প্রায় বিবস্ত্র হয়ে পড়েছে।

উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাথে এ সাক্ষাতের পর কিছুদিন যেতে না যেতেই উমাইর ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে আল্লাহ এ দুনিয়া থেকে পরপারে আহবান জানালেন। তাঁর দীর্ঘদিনের আশা যে, পরকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাতে মিলিত হবেন। দুনিয়ার এ মায়াবী বেড়াজাল থেকে মুক্ত পবিত্র আত্মার অধিকারী এ সাধক সাহাবী উমাইর ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রহমত ও মাগফিরাতের দৃঢ় প্রত্যাশী ছিলেন। তাই তিনি দুনিয়ার সর্বপ্রকার বিষয় ও দায়দায়িত্ব হতে মুক্ত হয়ে পরকালের পথে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে রওনা হতে সক্ষম হন। যাঁর সফরসঙ্গী হিসেবে তাঁর সাথে ছিল তাঁর ইবাদত-বন্দেগী, তাকওয়া-পরহেযগারী, হেদায়াত, দৃঢ় ঈমান ও নেক আমল এবং নূরের দীপ্ত মশাল। তাঁর ওফাতের সংবাদ শোনামাত্র উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর চেহারা মলিন হয়ে যায় এবং বেদনায় মন ভেঙে পড়ে।

তিনি বলেন :

> 'আমি কতই না আশা করছিলাম যে, উমাইর ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মতো লোক পাব, যাদেরকে মুসলমানদের খিদমতের জন্য রাষ্ট্রীয় কাজে নিয়োগ করতে পারব।'

আল্লাহ্ উমাইর ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ওপর সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁকেও সন্তুষ্ট করুন। নিঃসন্দেহে কর্মবীরদের মধ্যে তিনি এক ব্যতিক্রমধর্মী, অনুকরণযোগ্য ও মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সর্বোচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এক মহান ব্যক্তিত্ব।

---

বি. দ্র. উমাইর ইবনে সা'দ (রা)-এর জীবনী সম্পর্কে জানার জন্য তাঁর বাল্য জীবনীতে উল্লিখিত গ্রন্থাবলি দেখুন।

# জা'ফর ইবনে আবী তালিব (রা)

*'রক্তে রঞ্জিত দুটি পাখায় ভর করে জান্নাতে জা'ফর ইবনে আবী তালিবকে উড়ে বেড়াতে দেখেছি।' –মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)*

আবদে মান্নাফ গোত্রে পাঁচজন ব্যক্তি এমন ছিলেন, যাদের চেহারা ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা মুবারকের সাথে অত্যধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। অপরিচিত অনেকেই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাদের মধ্যে সহজে পার্থক্য করতে পারত না। ঐ পাঁচ ব্যক্তির পরিচয় জানতে নিশ্চয়ই আপনারা আগ্রহী হবেন, যাদের চেহারা আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল।

তারা হলেন :

১. আবূ সুফিয়ান ইবনে হারেস ইবনে আবদুল মুত্তালিব। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আপন চাচাত এবং দুধ ভাই।

২. কুসাম ইবনে আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব। তিনিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাত ভাই।

৩. সায়েব ইবনে উবায়দ ইবনে আবদে ইয়াযীদ ইবনে হাশিম। তিনি ইমাম শাফেঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দাদা ছিলেন।

৪. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাতি ফাতেমাতুয যাহ্‌রা ও আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমার পুত্র হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।

৫. আমীরুল মুমিনীন আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ভাই জা'ফর ইবনে আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।

এখানে আমরা জা'ফর ইবনে আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জীবনী সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

কুরাইশ বংশে আবী তালিব ছিলেন নেতৃত্বের শীর্ষে। এ কারণেই তিনি ছিলেন সকলের একান্ত শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব। অধিকন্তু তিনি ছিলেন অনেক সন্তানের জনক। আর্থিক দিক দিয়ে তিনি ছিলেন দরিদ্র; কিন্তু তার দারিদ্র্য চরম আকার ধারণ করে যখন অনাবৃষ্টির কারণে প্রচণ্ড অভাব কুরাইশ বংশের প্রায় সব পরিবারকেই ভীষণভাবে কাবু করে ফেলে। এ বছরকে 'অনাবৃষ্টির বছর' নামে অভিহিত করা হয়। অবস্থা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যে, শস্যাদি রোদে পুড়ে যাওয়ার কারণে মানুষ শুকনো হাড্ডি পর্যন্ত রান্না করে তার সুরুয়া পান করতে বাধ্য হয়। সে সময় কুরাইশ বংশের হাশিম গোত্রের শুধুমাত্র মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর চাচা আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছাড়া আর কারো আর্থিক সচ্ছলতা ছিল না। এ অবস্থায় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে প্রস্তাব রাখলেন :

> 'আপনার ভাই আবী তালিব অধিক সন্তানের জনক। অভাব-অনটন যেসব পরিবারকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে, এ পরিবারটি তাদের অন্যতম। অনাহারক্লিষ্টতায় এ পরিবারের প্রতিটি সদস্য নিষ্পেষিত। আসুন, আমরা তার সন্তানদের কয়েকজনের দায়িত্বভার গ্রহণ করে তাকে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে দেই। আমরা উভয়ে কমপক্ষে এক একজনের দায়িত্ব নিই।'

উত্তরে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন :

> 'এটা নিঃসন্দেহে উত্তম প্রস্তাব।'

অতঃপর উভয়ে আবী তালিবের বাড়ি গিয়ে তাঁকে বললেন :

> 'অভাব-অনটনের কারণে মানুষের যে দুরবস্থা তা তো দেখছেন। আপনিও অভাব-অনটনের নির্মম শিকার। পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত আমরা আপনার সন্তানদের দু'জনকে আমাদের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করে আপনার বোঝা একটু হালকা করতে চাই।'

আবী তালিব বললেন :

'আমার বড় ছেলে আকীলকে আমার কাছে রেখে অবশিষ্টদের যাকে খুশি নিয়ে যেতে পার।'

অতঃপর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলীকে এবং আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জা'ফরকে তাঁদের পরিবারভুক্ত করে নিলেন। তখন থেকেই আলী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারভুক্ত ছিলেন এবং তিনিই ছোটদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম কিশোর সাহাবী। এভাবে চাচার বাড়িতে অবস্থানকালেই জা'ফর যৌবনে পদার্পণ করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন ও আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হন।

'দারুল আরকামে' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতী বৈঠক শুরুর পূর্বেই আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রচেষ্টায় সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী হাতেগোনা কয়েকজনের অন্যতম ছিলেন জা'ফর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ও তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা। প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণকারী প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর মতো এ দম্পতির ওপরও নেমে আসে কুরাইশদের অমানুষিক নির্যাতন। উভয়েই অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে সব নির্যাতন স্বীকার করে নেন। কারণ, তাঁরা খুব ভালো করে জানতেন যে, জান্নাতের পথ অত্যন্ত দুর্গম। নির্যাতনের সীমাহীন পাহাড়, অত্যাচারের জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড এবং নিপীড়নের রক্তসাগর পাড়ি দিয়েই জান্নাতে প্রবেশ করতে হবে।

এতো বাধা দিয়েও কুরাইশরা ক্ষান্ত হয়নি। মুসলমানগণ যাতে ইবাদত-বন্দেগী করতে না পারেন, তার জন্য নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন ও সামাজিক বয়কট ইত্যাদি মাথা পেতে নিলেও ইবাদতের পথে বাধা সৃষ্টিকে মুসলমানরা কোনোক্রমেই মেনে নিতে না পেরে স্বাধীনভাবে ইবাদত-বন্দেগীর স্বার্থে তারা হাবশার (আবিসিনিয়ার) পথে হিজরতের চিন্তা-ভাবনা করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে হিজরতের অনুমতি দেন। কিন্তু মক্কায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অন্যান্য সঙ্গী-সাথীদের কুরাইশদের নির্মম অত্যাচারের মুখে ফেলে হাবশার পথে পা বাড়ালেও জা'ফর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন অত্যন্ত ব্যথিত, দুঃখিত ও চিন্তাগ্রস্ত। শান্তির হাতছানি কোনোক্রমেই তাঁদের মনকে আনন্দিত করতে

পারছিল না। বারবার জা'ফরের মনে প্রশ্ন হয়ে দেখা দিচ্ছিল :

> 'কোন্ অপরাধে এ নিষ্পাপ কাফেলার প্রতিটি নর-নারী জন্মস্থান ত্যাগ করে হাবশার পথে পাড়ি জমাতে বাধ্য হয়েছে? মাতৃভূমির স্নিগ্ধ আলো-বাতাসে তো তারা শৈশব, কৈশোর ও যৌবনে পদার্পণ করেছে। মাতৃভূমির প্রতিটি বালুকণার সাথে যাদের দেশপ্রেম, ভালোবাসা ও আনন্দ-উৎফুল্লতা মিশে আছে, তারা আজ কেন দেশান্তরিত? তাদের অপরাধ কি এই যে, তারা ঘোষণা দিয়েছে– আল্লাহ ছাড়া তাদের আর কোনো প্রভু নেই?'

কুরাইশদের এই নির্মম অত্যাচার প্রতিহত করার মতো শক্তি-সামর্থ্য না থাকায় এবং তাদের হীনতা ও দুর্বলতায় জা'ফর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বড়ই পীড়া অনুভব করছিলেন। এ অবস্থার মধ্যে জা'ফর ইবনে আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নেতৃত্বে মুহাজিরদের প্রথম কাফেলা হাবশায় পৌঁছল। হাবশার ন্যায়পরায়ণ বাদশাহর আশ্রয়ে তাঁরা নিরাপদে জীবন যাপন করতে থাকেন। ইসলাম গ্রহণ করার পর এই প্রথম তাঁরা শান্তির মুখ দেখেন। একাগ্রতার সাথে নিরাপদে ও শান্তিতে ইবাদত-বন্দেগী করার সুযোগ পান। সেখানে ছিল না তাদের ইবাদত-বন্দেগীতে কোনো বাধা। ছিল না কোনো বিদ্রূপ ও উপহাস। সেখানে ছিল না নেতৃবর্গের চরিত্র হননের কোনো প্রয়াস বা তাদের চরিত্রের বিরুদ্ধে অশ্লীল কোনো কটাক্ষ। মুসলমানদের এ কাফেলা নিরাপদে হাবশায় বা বর্তমান আবিসিনিয়ায় পাড়ি জমাতে সক্ষম হয়। কুরাইশরা এতে যে কোনো বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি, এটা ছিল তাদের কাছে রীতিমতো অসহ্য ব্যাপার। সেখানে বাদশাহর আশ্রয়ে তারা নিরাপদে নিশ্চিন্তে ধর্ম-কর্ম করছে, তাওহীদী আকীদা-বিশ্বাস অনুযায়ী নিরাপদে জীবন যাপন করছে– এ সংবাদ ছিল কুরাইশদের সহ্যের বাইরে। তাই তারা সিদ্ধান্ত নিল হাবশায় গিয়ে তাদের মেরে ফেলবে অথবা সেখান থেকে তাদের ফিরিয়ে এনে মক্কায় সুবিশাল কয়েদখানায় বন্দী করে রাখবে।

এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত জানার জন্য আমরা উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা প্রদত্ত ঐতিহাসিক বর্ণনার সাহায্য গ্রহণ করছি। উম্মু সালামা হিন্দ বিনতে সুহাইল আল মাখযুমিয়াহ বলেন :

'আমরা হাবশায়– বর্তমান ইথিওপিয়া পৌঁছে উত্তম প্রতিবেশীসুলভ আচরণ পেয়ে আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করি। পরিপূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা আমাদের দেওয়া হয়। কোনো প্রকার নির্যাতন, বিদ্রূপ, উপহাস ছাড়াই আমরা আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করে যাচ্ছিলাম। কুরাইশদের কাছে আমাদের এই নিরাপদ আশ্রয় লাভের সংবাদ পৌঁছলে তারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ফলে বাদশাহ্ নাজ্জাশীর কাছে কুরাইশরা দু'জন প্রতিনিধি প্রেরণ করে, যারা ছিল খুবই বাকপটু এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। তারা হলো আমর ইবনুল আস ও আবদুল্লাহ ইবনে রাবীআ। তারা বাদশাহ্ ও তাঁর দরবারের পাদ্রিদের জন্য প্রচুর মূল্যবান উপঢৌকন নিয়ে হাজির হয়। তাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হয় যে, বাদশাহর সাথে কথা বলার আগে যেন রাজ-দরবারের পাদ্রিদের কাছে এসব উপঢৌকন পৌঁছানো হয়।

কুরাইশ দূতদ্বয় হাবশায় পৌঁছেই বাদশাহ্ নাজ্জাশীর দরবারের পাদ্রিদের সাথে দেখা করে এবং মক্কা থেকে আনীত উপঢৌকনসমূহ পৌঁছায়। তারা পাদ্রিদের প্রত্যেকের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাতের মাধ্যমে এ অনুরোধই জানায় যে, বাদশাহ্ নাজ্জাশীর রাজ্যে আমাদের কিছু নির্বোধ পথভ্রষ্ট লোক পালিয়ে এসেছে, যারা বাপ-দাদার সনাতন ধর্ম পরিত্যাগ করে আমাদের সমাজব্যবস্থা ও জাতিসত্তায় শুধু আঘাতই হানেনি; ভাইয়ে ভাইয়ে ও পিতা-পুত্রের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টিও করেছে। আমরা যখন বাদশাহর দরবারে তাদের প্রত্যাবর্তনের দাবি জানাব, তখন আপনারা তাদের কাছে দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে কোনো জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়াই আমাদের হাতে সোপর্দ করার সুপারিশ করবেন। কেননা, তাদের নতুন ধর্মের ভালো-মন্দ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দেওয়ার জন্য কুরাইশ নেতৃবৃন্দই যথেষ্ট। তাই নতুন ধর্ম ইসলাম সম্পর্কে এসব দেশত্যাগীদের কাছে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন পড়ে না।'

স্বাভাবিকভাবেই পাদ্রিগণ সবাই দূতদ্বয়ের এই প্রস্তাবের সাথে ঐকমত্য পোষণ করে। উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন :

'বাদশাহ্ নাজ্জাশী যদি আগে-ভাগেই মুহাজিরদের কাউকে ডেকে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে বসেন, এ ভয়ে দূতদ্বয় অত্যন্ত তটস্থ ছিল।'

কুরাইশ দূতেরা দরবারে উপস্থিত হয়ে বাদশাহর খিদমতেও উপঢৌকন পেশ করে। বাদশাহ এসব মূল্যবান উপঢৌকন দেখে অবাক হন এবং তা সাদরে গ্রহণ করেন। এ সুযোগে তারা বাদশাহর কাছে তাদের বক্তব্য পেশ করে এবং তারা বিনীত আবেদন করে বলে :

'বাদশাহ নামদার! আমাদের বংশের কিছু দুষ্ট প্রকৃতির লোক আমাদের অজান্তে আপনার রাজ্যে পালিয়ে এসেছে। তারা এমন এক অদ্ভুত ও নতুন ধর্মবিশ্বাসে বিশ্বাসী, যে সম্পর্কে আমরা যেমন কিছু জানি না, তেমনি আপনিও জানেন না। একদিকে যেমন তারা আমাদের ধর্ম প্রত্যাখ্যান করেছে, অন্যদিকে তেমনি তারা আপনাদের ধর্মেও দীক্ষিত হয়নি। আমাদের নেতৃবৃন্দ সর্বসম্মতভাবে তাদেরকে নিজ নিজ ঘরে ফেরৎ নেওয়ার জন্য আপনার খিদমতে আমাদের পাঠিয়েছেন। তারা তাদের ধর্মদ্রোহিতা সম্পর্কে বিশেষভাবে অবগত।'

তাদের বক্তব্য শ্রবণান্তে বাদশাহ তার দরবারে উপস্থিত ধর্ম উপদেষ্টার দায়িত্বে নিয়োজিত পাদ্রিদের দিকে মতামত যাচাই-এর লক্ষ্যে দৃষ্টি প্রদান করলেন।

পাদ্রিগণ সমস্বরে বলে উঠল :

'বাদশাহ নামদার! তাদের গোত্রের নেতৃবৃন্দই তাদের কৃত অপরাধ সম্পর্কে ভালো জানেন। তাদের সম্পর্কে কী করণীয় এ জন্য তারাই যথেষ্ট। তাদেরকে তাদের গোত্রের নেতৃবৃন্দের কাছে ফেরৎ দানের অনুরোধ করছি, যাতে তাদের নেতৃবৃন্দই তাদের সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।'

পাদ্রিদের এই অযাচিত সমর্থনের কথা শোনামাত্রই বাদশাহ তাদের প্রতি ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন :

'আল্লাহর শপথ করে বলছি, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের একজনকেও আমি এদের দু'জনের হাতে সোপর্দ করব না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের ডেকে এনে অভিযোগ সম্পর্কে বক্তব্য না শুনব। যদি এ দূতদ্বয়ের কথা যথার্থই সত্য হয়, তাহলে তাদেরকে দূতদ্বয়ের হাতে সোপর্দ করা হবে। অন্যথায় কোনোক্রমেই তাদের হাতে সোপর্দ করা হবে না। বরং যতদিন তারা এ ভূখণ্ডে থাকতে চায়, থাকার অনুমতি থাকবে এবং উত্তম আশ্রয়দাতার আচরণ অব্যাহত রাখা হবে।'

উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বর্ণনা করেন :

'অতঃপর বাদশাহ নাজ্জাশী তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য আমাদেরকে তাঁর দরবারে ডেকে পাঠান। দরবারে উপস্থিত হওয়ার পূর্বে আমরা নিজেদের মধ্যে সলাপরামর্শের উদ্দেশ্যে বৈঠকে মিলিত হই এবং পরস্পরে আলোচনা করি। আমরা ধরে নিই, বাদশাহ নাজ্জাশী নিশ্চয়ই আমাদেরকে দীন ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। আমরা আমাদের ঈমান-আকীদা স্পষ্টভাবে তুলে ধরব। আমাদের পক্ষ থেকে জা'ফর ইবনে আবী তালিব ছাড়া আর কেউ কোনো বক্তব্য রাখবেন না।'

উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন :

এ সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা বাদশাহর দরবারে উপস্থিত হই। ইতোমধ্যে তিনি তাঁর ধর্মীয় উপদেষ্টা পাদ্রিদের ডেকে এনেছেন। তারা সবুজ রঙের বিশেষ ধরনের জাঁকজমকপূর্ণ মূল্যবান গাউন পরিধান করে তাদের ধর্মীয় প্রতীক টুপি মাথায় দিয়ে ধর্মীয় কিতাব হাতে নিয়ে একে একে বাদশাহর দু'পাশের আসনগুলোতে বসে পড়ল। তাদের মধ্যেই বসে ছিল কুরাইশ দূতদ্বয় আমর ইবনুল আস এবং আবদুল্লাহ ইবনে রাবীআ। যথাসময়ে বৈঠকের কাজ আরম্ভ হলো।

বাদশাহ আমাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন :

'কোন্ নতুন ধর্ম তোমরা গড়ে নিয়েছ? যে কারণে পৈতৃক ধর্ম পরিত্যাগ করতে হয়েছে। আমাদের ধর্মেও দীক্ষিত হওনি, এমনকি প্রচলিত কোনো ধর্মও গ্রহণ করনি। তোমাদের নিকট এর কোনো সদুত্তর আছে কি?

জা'ফর ইবনে আবী তালিব বাদশাহর প্রশ্নের উত্তরে বললেন :

'বাদশাহ নামদার! আমরা ব্যভিচারী, আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারী, মূর্তিপূজারী, মৃত প্রাণীর গোশত ভক্ষণকারী এবং পথভ্রষ্ট জাতি ছিলাম। প্রতিবেশীর অধিকার গ্রাসে আমরা ছিলাম সিদ্ধহস্ত। সমাজের শক্তিশালীরা দুর্বলদের নির্যাতন করত। তাদের শোষণ করে তারা আনন্দ পেত। এই বিভীষিকাময় সামাজিক পরিবেশের এক পর্যায়ে আল্লাহ আমাদের মধ্য থেকে তাঁর রাসূল প্রেরণ করেন। যিনি বংশ-মর্যাদা, সত্যবাদিতা, আমানতদারী, নৈতিকতা ও উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে অতুলনীয়। তিনি

আমাদের এক আল্লাহর দিকে আহ্বান জানালেন। যেন আমরা শিরকে লিপ্ত না হয়ে তাঁরই ইবাদত করি এবং মূর্তি ও দেব-দেবীর পূজা থেকে বিরত থাকি। আমাদের পূর্ব পুরুষেরা যে শিরক ও মূর্তিপূজায় যুগ যুগ ধরে লিপ্ত ছিল, তিনি আমাদের তা পরিত্যাগ করতে বললেন। তিনি আমাদেরকে সত্যবাদিতা ও আমানতদারীর পথে চলার নির্দেশ দিয়ে থাকেন। স্বজনদের প্রতি সদয় হওয়ার জন্য এবং প্রতিবেশীর প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দেন। আল্লাহর নিষেধ মানতে এবং তাঁর অপছন্দনীয় কর্মকাণ্ড থেকে বিরত ও রক্তপাত থেকে নিবৃত্ত থাকতে উপদেশ দিয়ে থাকেন। ব্যভিচার ও মিথ্যা পরিহার করতেও তিনি উপদেশ দেন। ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করতে ও চরিত্রবান নারীর চরিত্রে অপবাদ দিতে কঠোরভাবে নিষেধ করেন। তিনি আমাদের শিরকমুক্ত হয়ে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার নির্দেশ দেন। আমরা যেন সালাত আদায় করি, যাকাত প্রদান করি এবং রমযান মাসে রোযা রাখি। তাঁর এই সত্যের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর প্রতি আমরা ঈমান এনেছি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে যেসব হেদায়াত তিনি নিয়ে এসেছেন তার অনুসরণ করছি। তিনি যা কিছু আমাদের জন্য হালাল করেছেন, তা আমরা হালাল করে নিয়েছি। আর যা কিছু আমাদের জন্য হারাম করেছেন তা আমরা পরিহার করেছি।

সম্মানিত বাদশাহ নামদার! শুধু এ কারণেই আমাদের গোত্রীয় নেতৃবর্গ ও জনগণ আমাদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালাচ্ছে। আমাদের ওপর এসব অত্যাচারের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো, যেন অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে আমরা সত্যধর্ম ত্যাগ করে আবার মূর্তিপূজায় ফিরে যাই এবং শিরকে লিপ্ত হই। যখন অত্যাচার ও নির্যাতন সীমা অতিক্রম করল এবং আমাদের জন্য পৃথিবী সংকীর্ণ হয়ে উঠল, আমাদের ধর্ম পালনে প্রচণ্ড বাধা সৃষ্টি করা হলো, তখন আমরা আপনার দেশে হিজরত করতে বাধ্য হই। অন্য যে কোনো রাজা-বাদশাহের ওপর আপনাকে আমরা প্রাধান্য দিয়েছি। আমরা আশা করছি, আপনার পক্ষ থেকে আমাদের ওপর যুলুম করা হবে না।'

উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বর্ণনা করেন :

'অতঃপর বাদশাহ নাজ্জাশী জা'ফর ইবনে আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে উদ্দেশ্য করে বললেন :

'আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের নবীর ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তার কোনো অংশ কি তোমার মনে আছে?'

তিনি উত্তর দিলেন : 'জী, হ্যাঁ!'

বাদশাহ বললেন :'তা আমাকে পাঠ করে শোনাও।'

অতঃপর তিনি বাদশাহকে সূরা মারইয়ামের প্রথমাংশ পাঠ করে শোনালেন :

كٓهٰيٰعٓصٓ ـ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا ـ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا ـ قَالَ رَبِّ اِنِّىْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّىْ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَّلَمْ اَكُنْ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا ـ

'কাফ-হা-ইয়া-'আইন-সাদ। এটি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের বিবরণ তাঁর বান্দা যাকারিয়ার প্রতি। যখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান করেছিল নিভৃতে। সে বলেছিল, আমার অস্থি দুর্বল হয়েছে, বার্ধক্যে আমার মস্তক শুভ্রোজ্জ্বল হয়েছে, হে আমার প্রতিপালক! তোমাকে আহ্বান করে আমি কখনও ব্যর্থকাম হইনি।' (সূরা মারইয়াম : ১-৪)

উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বর্ণনা দেন :

'এ আয়াত শুনে বাদশাহ নাজ্জাশীর মনে এতই আবেগের সৃষ্টি হলো যে, তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে কাঁদতে লাগলেন। তাঁর দু' গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকল। তাঁকে কাঁদতে দেখে দরবারের পাদ্রিরাও কাঁদতে লাগলেন। এমনকি তাদের চক্ষের পানিতে সামনে রাখা ধর্মীয় বইগুলোও ভিজে যায়। আল্লাহর কালামের যতটুকু তারা শুনলেন তাতেই এ প্রতিক্রিয়া দেখা গেল।

এরপর বাদশাহ বললেন :

'তোমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন এবং ঈসা আলাইহিস সালাম যা কিছু নিয়ে এসেছিলেন, তা হুবহু একই উৎসের জ্যোতি।'

অতঃপর কুরাইশ দূতদ্বয়কে উদ্দেশ্য করে বললেন :

'তোমরা চলে যাও। আল্লাহর শপথ! আমি কক্ষনো তাদেরকে তোমাদের হাতে সোপর্দ করব না।'

উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন :

'আমরা যখন সভাশেষে বাদশাহর দরবার থেকে বের হয়ে আসছিলাম, আমর ইবনুল আস আমাদের শাসাচ্ছিল এবং তার সাথী আবদুল্লাহ ইবনে রাবীআকে বলছিল, খোদার কসম! আমি আগামীকাল আবার বাদশাহর কাছে আসব এবং তাদের ব্যাপারে এমনসব তথ্য তাকে দেব, যাতে তার মন-মেজাজ ঘৃণা ও ক্ষোভে জ্বলে উঠে এবং সে তাদের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়। তাদের ব্যাপারে এমনসব তথ্য দেব, যা দ্বারা তাদের সার্বিক জীবনযাত্রা বিপন্ন হতে বাধ্য। এদের আশ্রয়ছাড়া করব। তার সাথী আবদুল্লাহ ইবনে রাবীআ আমর ইবনুল আসকে বলে :

এদের ব্যাপারে আর বাড়াবাড়ি করো না। যাই হোক না কেন, এরা তো আমাদেরই জ্ঞাতি-গোষ্ঠী।

আমর ইবনুল আস উত্তরে বলে :

এসব মায়াকান্না। এদের সম্পর্কে এমন সংবাদ দেব যে, এদের পায়ের তলার মাটি সরে যাবে। আল্লাহর কসম! বাদশাহকে অবশ্যই বলব যে, এরা ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালামকে আল্লাহর বান্দা মনে করে।

পরের দিন আমর ইবনুল আস বাদশাহ নাজ্জাশীর দরবারে উপস্থিত হয়ে পুনরায় আরয করল :

বাদশাহ নামদার! যাদেরকে আপনি আশ্রয় দিয়েছেন, নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তারা ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বড়ই আপত্তিকর কথা বলে থাকে। আমার কথা বিশ্বাস না হলে তাদের ডেকে আনুন ও জিজ্ঞাসা করে দেখুন যে, সে ব্যাপারে তাদের আকীদা-বিশ্বাস কী?'

উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বর্ণনা করেন :

'আমরা এ দুরভিসন্ধিমূলক সংবাদে বিচলিত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ি। আমরা পরস্পর সলাপরামর্শ করতে থাকি যে, বাদশাহ ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে আমরা কী উত্তর দেব? পরিশেষে আমরা সবাই এ সিদ্ধান্তে একমত হই যে, আল্লাহর শপথ! ঈসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে আল্লাহ যা বলেছেন হুবহু তা-ই বলা ছাড়া আমরা

নিজেদের পক্ষ থেকে অতিরঞ্জিত কিছুই বলতে যাব না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু তাঁর ব্যাপারে আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, সে শিক্ষা থেকে কিঞ্চিৎও আমরা পিছু হটব না। এর পরিণাম যা হবার হবে।

আমরা এ সিদ্ধান্তও নিই যে, আমাদের পক্ষ থেকে আজও জা'ফর ইবনে আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বক্তব্য রাখবেন। বাদশাহ নাজ্জাশীর আহ্বানে রাজ-দরবারে উপস্থিত হয়ে দেখি পাদ্রিরা গতকালের ন্যায় আজও সাজ-সজ্জা ও জাঁকজমকের সাথে বাদশাহর দুই পার্শ্বে উপবিষ্ট। তাঁদের মধ্যে রয়েছে আমর ইবনুল আস ও তার সাথী আবদুল্লাহ ইবনে রাবীআ।

আমরা দরবারে পৌঁছানো মাত্রই বাদশাহ আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন :

'ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে তোমাদের আকীদা-বিশ্বাস কী?'

জা'ফর ইবনে আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উত্তর দিলেন :

ঈসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে আমরা সেই আকীদাই পোষণ করি, যা আমাদের নবীর ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে।

বাদশাহ নাজ্জাশী জিজ্ঞাসা করলেন :

'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ আয়াতসমূহে ঈসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে কী বলা হয়েছে?'

জা'ফর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উত্তর দিলেন :

'তাঁর ব্যাপারে বলা হয়েছে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। তিনি আল্লাহপ্রেরিত রূহ ও কালেমা বা পবিত্র বাক্য, যা নিষ্পাপ কুমারী মাতা মারইয়াম আলাইহিস সালামের গর্ভে নিক্ষেপ করেন।'

জা'ফর ইবনে আবী তালিবের মুখে ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে এ আকীদা ও বিশ্বাসের কথা শোনামাত্রই বাদশাহ নাজ্জাশী মাটিতে সজোরে চাপড় দিয়ে বলে উঠলেন :

'তোমাদের নবী ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে যে আকীদা ও বিশ্বাস নিয়ে এসেছেন, ঈসা আলাইহিস সালাম সে আকীদা-বিশ্বাস থেকে একচুল পরিমাণও এদিক-সেদিক ছিলেন না।'

বাদশাহর এ উক্তি শুনে তার দু'পাশের পাদ্রিরা এ থেকে অসম্মতিসূচক শব্দ উচ্চারণ করতে থাকলে বাদশাহ দৃঢ়ভাবে বললেন :

> আপনারা স্বীকার করুন আর নাই করুন, ঈসা আলাইহিস সালাম ছিলেন আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

অতঃপর তিনি মুহাজিরদের উদ্দেশ্যে বললেন :

> আপনারা স্ব-স্ব স্থানে ফিরে যান। আপনারা সম্পূর্ণ নিরাপদ। আপনাদের উদ্দেশ্যে কোনো কটুবাক্য, ভর্ৎসনা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ ইত্যাদিকে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড হিসেবে ধরে নেওয়া হবে। মনে রাখবেন, আপনাদের ধর্মীয় কার্যকলাপ ও স্বাধীনতায় বিন্দুমাত্র হস্তক্ষেপকে কঠোর শাস্তিমূলক অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করছি। আল্লাহর শপথ! পাহাড় তুল্য স্বর্ণস্তূপও যদি শুধুমাত্র আপনাদের কাউকে তাদের হাতে তুলে দেওয়ার বিনিময়ে আমাকে উপঢৌকন হিসাবে পেশ করতে চায়, তবুও আমি তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করব।

অতঃপর বাদশাহ আমর ইবনুল আস ও তার সঙ্গীর প্রতি তাকিয়ে বললেন :

> 'এই দুই ব্যক্তির সমস্ত উপঢৌকন ফিরিয়ে দাও। এ ধরনের উৎকোচের আমার কোনো প্রয়োজন নেই।'

এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন :

> 'অতঃপর আমর ইবনুল আস ও আবদুল্লাহ ইবনে রবীআ লাঞ্ছিত ও বিধ্বস্ত ধিকৃত অবস্থায় ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে মাথা নীচু করে বাদশাহর দরবার হতে বেরিয়ে যায় এবং আমরা অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সাথে হাবশায় অবস্থান করতে থাকি।'

বাদশাহ নাজ্জাশীর মহানুভবতার ছত্রছায়ায় জা'ফর ইবনে আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সস্ত্রীক অত্যন্ত নিরাপদে ও শান্তিতে দশ বছর অতিবাহিত করেন। সপ্তম হিজরীতে তিনি মদীনা মুনাওয়ারার উদ্দেশ্যে অন্যান্য মুসলমানের সাথে আবিসিনিয়া ত্যাগ করেন। এমন এক মুহূর্তে তিনি মদীনায় পৌঁছেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বার বিজয়ের পর সরাসরি মদীনায় এসে পৌঁছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জা'ফর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে দেখে খুবই আনন্দিত হন।

তিনি বলেন :

مَا أَدْرِيْ بِأَيِّهِمَا أَنَا أَشَدُّ فَرَحًا!! ابفتح خَيْبَرَ أَمْ بقدوم جعفر؟

'আমি বুঝতে পারছি না, খায়বারের বিজয় না জা'ফর ইবনে আবী তালিবের আগমন– কোন্‌টি আমাকে বেশি আনন্দিত করেছে।'

সর্বস্তরের মুসলমানদের মধ্যে বিশেষ করে গরীব অনাথ মুসলমানদের মধ্যে যে আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়, তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনন্দের চেয়ে কোনো অংশেই কম ছিল না। কারণ, জা'ফর ইবনে আবী তালিব ছিলেন অসহায় গরীব-মিসকীনদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল। আন্তরিক সাহায্যের হাত সম্প্রসারণকারী এক নিষ্ঠাবান বন্ধু।

আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর সম্পর্কে বলেন :

'অসহায়দের জন্য জা'ফর ইবনে আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন উত্তম বন্ধু। তিনি আমাদেরকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যেতেন এবং ঘরে যা কিছু থাকত তা দিয়েই আমাদের আপ্যায়ন করতেন। এমনকি পাত্রের খাবার শেষ হয়ে গেলে তিনি ঘি রাখার ছোট ছোট পাত্র এনে দিতেন, তা খুলে যতটা সম্ভব হতো আমরা চেটে খেতাম।'

মদীনায় জা'ফর ইবনে আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বেশি দিন অবস্থান সম্ভব হলো না।

অষ্টম হিজরীর প্রথম দিকে ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সিরিয়ার পাদদেশে সমবেত রোমান বাহিনীর মোকাবেলার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেন। এ বাহিনীর সেনাপতি হিসেবে যায়েদ ইবনে হারেসা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে মনোনীত করেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিলেন :

'যদি যায়েদ ইবনে হারেসা শহীদ বা আহত হয়, সে ক্ষেত্রে সেনাপতি হবে জা'ফর ইবনে আবী তালিব। জা'ফর ইবনে আবী তালিব যদি শাহাদাত বরণ করে বা আহত হয়, তাহলে সেনাপতি হবে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা। আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাও যদি শাহাদাত বরণ করে বা আহত হয়, সে ক্ষেত্রে মুসলিম যোদ্ধারা নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে সেনাপতি নিযুক্ত করবে।'

এই ইসলামী বাহিনী যখন জর্দানের নিকটবর্তী 'মূতা' নামক স্থানে পৌঁছে, তখন দেখতে পায় যে, রোমান সম্রাট এই ইসলামী বাহিনীর মোকাবেলা করার জন্য এক লাখ সৈন্য মোতায়েন করেছে। তাদের সাহায্য করার জন্য আরবের লাখ্‌ম, জুয়াম এবং কুদায়া প্রভৃতি গোত্রের খ্রিস্টান এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের আরো এক লাখ যোদ্ধা যোগ দিয়েছে। অপরদিকে ইসলামী বাহিনীর সর্বমোট যোদ্ধার সংখ্যা হলো মাত্র তিন হাজার। শত্রু বাহিনীর সাথে ইসলামী বাহিনীর আসমান-জমিন পার্থক্য। এ অবস্থায় মুসলিম বাহিনী ও রোমান বাহিনীর মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ শুরু হলো। যুদ্ধের এক উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে শত্রুবাহিনীর অভ্যন্তরে হামলা পরিচালনার এক পর্যায়ে যায়েদ ইবনে হারেসা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শত্রুবাহিনীর আঘাতে ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন। অশ্বপৃষ্ঠে আরোহী যুদ্ধরত জা'ফর ইবনে আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর সোনালি বর্ণের ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন। তার ঘোড়াকে যেন শত্রুবাহিনী ব্যবহার করতে না পারে, সেজন্য তিনি নিজ হাতে ঘোড়ার পা কেটে ফেললেন এবং সাথে সাথে সেনাপতি হিসেবে ঝাণ্ডার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। তিনিও যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মতোই শত্রুবাহিনীর বাহু ভেদ করে এক সময় ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং তাদের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালালেন আর সাথে সাথে এ কবিতা আবৃত্তি করতে থাকলেন :

يَاحَبّذَا الجَنّةُ واقْتِرابُهَا * طَيِّبَةَ وَبَارِدٌ شَرابُهَا

والرّوْمُ رومٌ قَد دَنَاعَذَابُهَا * كَافِرَةَ بَعِيدَةٌ أَنْسَابُهَا

عَلَىّ إذ لاقَيْتُهَا ضِرَابُهَا

'আহ! জান্নাত আমার কতই না সন্নিকটে, এ মুহূর্তে আমি যেন তা প্রত্যক্ষ করছি। তার ঠাণ্ডা সুপেয় পানীয় কতই না পবিত্র তৃপ্তিদায়ক ও সুস্বাদু। কাফিররা তো ঈমানের ফুল বাগানে আগাছাস্বরূপ। আজ খোদাদ্রোহী রোমান বাহিনীর গর্দান আমার তলোয়ারের আওতায়। কাজেই তাদের কচুকাটা করা ছাড়া আর কিই বা করার আছে? এ মুহূর্তে আমার তলোয়ারের আঘাত তাদের জন্য গযবে ইলাহীস্বরূপ।'

এ কবিতা পড়তে লাগলেন আর শত্রুবাহিনীর ব্যূহকে তলোয়ারের আঘাতে তছনছ করে সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকলেন। এক পর্যায়ে শত্রুদের প্রচণ্ড এক আঘাতে তাঁর ডান হাত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। সাথে সাথে তিনি বাম হাতে ঝাণ্ডা ধারণ করলেন। দেখতে না দেখতেই প্রচণ্ড আরেক আঘাতে তার বাম হাতও দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এরপরও যেন ইসলামের ঝাণ্ডা ভূলুণ্ঠিত না

হয়, তাই সাথে সাথে কর্তিত হাতের অবশিষ্টটুকু দিয়ে দু'হাত বুকে লাগিয়ে ঝাণ্ডাকে উঁচু করে রাখলেন। ততক্ষণে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছুটে এসে ঝাণ্ডা তুলে ধরলেন। তিনিও বীরবিক্রমে যুদ্ধ পরিচালনা করে পূর্ববর্তী দুই সেনাপতির ন্যায় শাহাদাত বরণ করলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে মূতার যুদ্ধে তাঁর তিন সেনাপতির শাহাদাতের সংবাদ পৌঁছলে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত ও ব্যথিত হলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর চাচাত ভাই জা'ফর ইবনে আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। তার বাড়িতে পৌঁছে দেখলেন, তার স্ত্রী আসমা তার দীর্ঘ সময় ধরে অনুপস্থিত স্বামী জা'ফরকে অভ্যর্থনা জানানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন। রুটি তৈরির জন্য সবেমাত্র আটার খামির তৈরি করেছেন। বাচ্চাদেরকে গোসল করিয়ে গায়ে তেল ও সুগন্ধি লাগিয়ে কাপড়-চোপড় পরিয়ে সাজিয়েছেন। ফারূক রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী আসমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন :

> 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বাড়িতে তাশরীফ আনলে দেখতে পাই যে, তাঁর চেহারা মুবারক বেদনা ও দুশ্চিন্তার কালো ছায়ায় আচ্ছাদিত। এ অবস্থায় আমি তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাইনি, এই ভেবে হয়তো আমাকে এমন কোনো দুঃসংবাদ শুনতে হতে পারে, যা আমার কাম্য নয়।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সালাম দিয়ে বললেন :

> 'জা'ফরের বাচ্চাদেরকে আমার কাছে ডেকে আন। আমি তাদের ডাক দিলে সাথে সাথে তারা আনন্দিত হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ছুটে এল। কে কার আগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোলে চড়বে এ নিয়ে তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। প্রত্যেকেই চেষ্টা করল যেন সে-ই প্রাধান্য পায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের প্রতি মায়াভরা দৃষ্টিতে তাকালেন। তাদের গায়ের সুগন্ধির ঘ্রাণ নিতে লাগলেন। আর দু'চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল।' আমি বললাম :
>
> 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক, আপনি কী কারণে কাঁদছেন? জা'ফর ও তাঁর সাথীদের ব্যাপারে কোনো দুঃসংবাদ পেয়েছেন কি?'

তিনি বললেন :

"হ্যাঁ, তারা সবাই আজ শাহাদত বরণ করেছে। জা'ফর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর উৎফুল্ল ও উচ্ছ্বসিত বাচ্চারা যখন দেখল যে, তাদের মা হঠাৎ করে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন, তখন তারা নিজ নিজ জায়গায় নিথর হয়ে গেল। যেন তাদের ওপর বজ্রপাত হয়েছে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেদনা-ভারাক্রান্ত মনে দু'চোখের অশ্রু মুছতে মুছতে বিদায় নিলেন।'

তিনি তখন বলছিলেন :

اللّٰهُمَّ أُخْلُفْ جَعْفَرًا فِى وَلَدِهِ اَللّٰهُمَّ اخْلُفْ جَعْفَرًا فِى أَهْلِهِ.

'হে আল্লাহ! জা'ফরের সন্তানদের জন্য তুমিই তাদের অভিভাবক হও। জা'ফরের পরিবারের হেফাযতের দায়িত্ব তুমিই গ্রহণ করো।

অতঃপর বললেন :

لقد رَأَيْتُ جَعْفَرًا فِى الْجَنَّةِ، له جناحان مُضَرَّجَان بِالدِّمَاءِ، وَهُوَ مَصْبُوْغُ الْقَوَادِمِ.

'আমি জাফরকে রক্তে রঞ্জিত দুটি পাখায় ভর করে জান্নাতে উড়তে দেখেছি।'

---

জা'ফর ইবনে আবী তালিব (রা) সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সহায়ক গ্রন্থাবলি :

১. আল ইসাবাহ : ১ম খণ্ড, ২৩৭ পৃ.।
২. সিফাতুস সাফওয়া : ১ম খণ্ড, ২০৫ পৃ.।
৩. হুলিয়াতুল আওলিয়া : ১ম খণ্ড, ১১৪ পৃ.।
৪. তাবাকাত ইবনে সা'দ : ৪র্থ খণ্ড, ২২ পৃ.।
৫. মু'জামুল বুলদান : মূতা যুদ্ধ বিষয়ক।
৬. তাহযীবুত তাহযীব : ২য় খণ্ড, ৯৮ পৃ.।
৭. আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ : ৪র্থ খণ্ড, ২৪১ পৃ.।
৮. আস সীরাতুন নুবুবিয়াহ লি ইবনি হিশাম, ১ম খন্ড , ৩৫৭ পৃঃ এবং ৪র্থ খণ্ড, ৩ ও ২০ পৃ.।
৯. আদ দুরারু ফী ইখতিসারিল মাগাযী এবং আস সিয়ারু লি ইবনে আবদুল বাবর : ২২২ ও ৫০ পৃ.।
১০. হায়াতুস সাহাবা : সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।
১১. আল কামিল লি ইবনিল আছীর : ২য় খণ্ড, ৩০ ও ৯৬ পৃ.।

# আবূ সুফিয়ান ইবনে হারেস (রা)

*'আমি আবূ সুফিয়ান ইবনে হারেসের প্রতি সন্তুষ্ট হলাম। তার কৃত সমস্ত জীবনের শক্রতা ও বিরোধিতাকে আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। সে হবে জান্নাতে যুবকদের নেতা।'*

*–মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)*

পারস্পরিক সম্পর্ক ও গভীর ভালোবাসার মতো যত যোগসূত্রই এ যাবৎ একে অপরের মধ্যে সেতুবন্ধ সৃষ্টি করেছে, তার মধ্যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে আবদুল্লাহ ও আবূ সুফিয়ান ইবনে হারেসের মধ্যে বিদ্যমান এমন যোগসূত্র খুবই কম পরিলক্ষিত হয়। কারণ, আবূ সুফিয়ান ইবনে হারেস ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে আবদুল্লাহ একই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। এদিক থেকে উভয়ই সমবয়সী। যেমন তারা একই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, ঠিক তেমনি একই পরিবারে প্রতিপালিতও হন।

আবূ সুফিয়ান ইবনে হারেস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আপন চাচাত ভাই। তার পিতা হারেস। হারেসের ভাই আবদুল্লাহ হলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতা। হারেস ও আবদুল্লাহ উভয়েই ছিলেন মুত্তালিবের ঔরসজাত সন্তান ।

এ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছাড়াও আবূ সুফিয়ান মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধভাই। উভয়কেই হালিমা আস সা'দিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা একই সঙ্গে স্তন্য পান করিয়েছেন। এতসব যোগসূত্র পরস্পরকে নবুওয়াতের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত

গভীর ভালোবাসা ও বন্ধুত্বে আবদ্ধ করে রাখে। শুধু তাই নয়, সর্বোপরি আকৃতি দু'জনের প্রায় একই ছিল। আবূ সুফিয়ানের ব্যাপারে সবারই ধারণা এটাই স্বাভাবিক ছিল যে, সে সর্বপ্রথম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতের প্রতি সাড়া দিয়ে মুসলমান হবে। তাঁর অনুসারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বপ্রধানও হবে। কিন্তু আল্লাহর ফায়সালা ছিল ভিন্ন। ঘটনাও ছিল প্রত্যাশার বিপরীত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইসলামের দাওয়াত দিতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের অনেকেই তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাদেরকে এ দাওয়াত প্রত্যাখ্যানের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করতে থাকেন। ঠিক এ পর্যায়ে আবূ সুফিয়ানের অন্তরে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে শত্রুতা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। গভীর বন্ধুত্ব দেখতে দেখতেই চরম শত্রুতায় পরিণত হয়। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার সময়ে আবূ সুফিয়ান কুরাইশ বংশের একজন প্রসিদ্ধ অশ্বারোহী ও কবি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিল। সে তার তলোয়ার ও কবিতা উভয় দ্বারাই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। তার সর্বশক্তি ইসলামের প্রতিরোধে ও মুসলমানদের নির্যাতন ও নিপীড়নের কাজে নিয়োজিত করে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে এমন কোনো যুদ্ধই সংঘটিত হয়নি, যার উদ্যোক্তা আবূ সুফিয়ান ছিল না। মুসলমানদের ওপর এমন কোনো অত্যাচার ও নির্যাতন হয়নি, যার বিরাট ভূমিকায় সে ছিল না। আবূ সুফিয়ান তার কবিতার আকর্ষণীয় ভাষা, জাদুকরী ছন্দ তথা সর্বশক্তি দ্বারাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরোধিতায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিল। তার কবিতায় থাকত শুধু গালিগালাজ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে আবূ সুফিয়ানের এই হীন তৎপরতা ক্রমাগত প্রায় কুড়ি বছর যাবৎ চলতে থাকে। এই দীর্ঘ সময়ে এ হীন তৎপরতা ও ষড়যন্ত্রের এমন কোনো কৌশল বা সুযোগ নেই, যা সে ব্যবহার করেনি। এমন কোনো অত্যাচার ও নির্যাতন নেই, যা সে মুসলমানদের ওপর চালায়নি ও তাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা রাখেনি। আল্লাহর কী মহিমা! মক্কা বিজয়ের পূর্ব মুহূর্তে আবূ সুফিয়ানের ভাগ্য ইসলাম গ্রহণের জন্য সুপ্রসন্ন হলো । তার ইসলাম গ্রহণের ঘটনাও একটি স্মরণীয় ঘটনা। কবি-সাহিত্যিকরা সে ঘটনাকে যেমন

বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন, ঐতিহাসিকগণও ইতিহাসের পাতায় তেমনি গুরুত্ব সহকারেই স্থান দিয়েছেন। আবূ সুফিয়ান নিজেই তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন :

'ইসলাম বিজয় লাভ করলে এবং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলে দলে দলে লোকজন ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে শীঘ্রই মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে অভিযান শুরু করতে যাচ্ছেন, এ সংবাদ মক্কার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ল। আমার মনে হলো, দুনিয়াটা আমার কাছে খুবই সংকীর্ণ হয়ে পড়ছে। পায়ের তলা থেকে মাটি যেন সরে যাচ্ছে। মনে মনে ভাবছিলাম এ মুহূর্তে কোথায় পালাই? কার আশ্রয় নেই? কেই বা আমার সঙ্গী-সাথী হবে? এসব দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনার মধ্যে আমার সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী ও পরিবার-পরিজনের কাছে এসে তাদের মক্কা থেকে পালানোর উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি নেয়ার নির্দেশ দেই। তাদের ইঙ্গিত দেই যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে-কোন মুহূর্তে মক্কায় প্রবেশ করতে পারে। আর মুসলমানদের হাতে ধরা পড়লে আমাকে হত্যাই করা হবে।'

তারা এক বাক্যে আমাকে উত্তর দিল :

'আপনি পরিস্থিতি এখনো সঠিকভাবে আঁচ করতে পারছেন না। আরব তো আরব। আরব বিশ্বের বাইরের দেশগুলোও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য স্বীকার করে নিচ্ছে ও দলে দলে তাঁর দীন গ্রহণ করছে। তাঁর ইসলামী রাষ্ট্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে অথচ আপনি এখনো তার বিরুদ্ধাচরণে সর্বশক্তি নিয়োগ করেই চলেছেন। আপনার উচিত ছিল, তাঁর সাহায্য-সহযোগিতায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করা।'

পরিবারের লোকজন এক হয়ে আমাকে ইসলাম সম্পর্কে এমনভাবে বোঝাতে ও উদ্বুদ্ধ করতে লাগল যে, আল্লাহ্ তাআলা আমার মনকে ইসলামের জন্য সম্প্রসারিত করে দিলেন। আর সাথে সাথে আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্যে রওয়ানার জন্য উঠে দাঁড়ালাম এবং 'মাযকুর' নামক আমার এক খাদিমকে আমাদের সফরের জন্য একটি ঘোড়া ও একটি উট প্রস্তুত করতে নির্দেশ দিলাম। আমি আমার সফরসঙ্গী হিসেবে আমার এক

ছেলে জা'ফরকে সংগে নিলাম। পথিমধ্যে জানতে পারলাম, মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী 'আল আবওয়া' নামক স্থানে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা-বিরতি করেছেন। আমি সে স্থানের উদ্দেশ্যেই দিক পরিবর্তন করলাম। 'আল-আবওয়া' নামক স্থানের যতই নিকটবর্তী হচ্ছিলাম, ততই ভাবছিলাম, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেওয়ার পূর্বেই কেউ যদি আমাকে চিনে ফেলে, তাহলে সে নির্ঘাত আমার শিরশ্ছেদ করবে। তাই আমি আমার বেশ বদলে ফেললাম এবং নিজেকে দৃষ্টির আড়ালে রেখে সম্মুখে অগ্রসর হতে লাগলাম। এমনকি 'আল আবওয়া' থেকে এক মাইল দূরেই যানবাহন রেখে পায়ে হেঁটে এক মাইল পথ অতিক্রম করতে থাকলাম। আর প্রত্যক্ষ করলাম যে, বিপরীত দিক থেকে দলে দলে মুসলমানদের অগ্রগামী কাফেলার লোকজন মক্কার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। যখনই একটি দলের সম্মুখীন হতাম, তখনই প্রাকৃতিক প্রয়োজন বা অন্য কিছুর বাহানা করে আমি রাস্তা থেকে পাশ কাটিয়ে যেতাম এই ভয়ে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের কেউ আমাকে চিনে না ফেলে। এ অবস্থার মধ্য দিয়ে পথ অতিক্রম করার এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যানবাহনকে অগ্রসর হতে দেখলাম। আমি অনুতপ্ত ও ধিকৃত অবস্থায় এ সুযোগে তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হলাম। তিনি তাঁর মুবারক চক্ষুদ্বয় দিয়ে আমার দিকে খুব ভালো করে তাকালেন। সম্পূর্ণ অন্য বেশে দেখে আমাকে চিনতে পেরেই আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আমি আবার সে দিকেই গিয়ে দাঁড়ালাম যেন আমার প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়ে। এরপরও তিনি আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্যদিকে মুখ করলেন। আমি আবার সেই দিকেই গিয়ে উপস্থিত হলাম। এমনকি অনুরূপ অবস্থায় বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলতে থাকল। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ইসলাম গ্রহণে আনন্দিত হবেন এবং তাঁর সাহাবীগণও তাঁর আনন্দে আনন্দিত হবেন। কিন্তু সাহাবীগণ যখন দেখতে পেলেন যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারবার আমার দিক থেকে বারবার মুখ

ফিরিয়ে নিচ্ছেন ও আমার দিকে তাকাতেই পছন্দ করছেন না, তখন তারাও আমার উপস্থিতিকে ঘৃণাভরে দেখতে আরম্ভ করলেন। এমনকি সবাই আমাকে বয়কট করলেন। আমি আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাক্ষাৎ পেলাম। তিনিও আমাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন। সাহায্য-সহযোগিতার জন্য উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর শরণাপন্ন হলাম এই ভেবে যে, তার অন্তরে একটু স্থান করে নিতে পারি কি না। দেখতে পেলাম, তিনি আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর চেয়েও আমাকে অধিক ঘৃণা করছেন। এমনকি তিনি আমার উপস্থিতির জন্য শুধু ক্ষিপ্তই হয়ে উঠলেন না, এমনকি তিনি আনসারদের এক যুবককে আমার বিরুদ্ধে লেলিয়েও দিলেন।'

ঐ ব্যক্তি আমাকে কঠোর ভাষায় বললেন :

'হে খোদার দুশমন! তুমিই না আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদেরকে নিপীড়ন ও নির্যাতন করেছিলে? তাঁদের বিরুদ্ধাচরণ ও শত্রুতায় পৃথিবীকে বিষময় করে তুলেছিলে আর কবিতার মাধ্যমে নানা গালমন্দ করেছিলে?'

এমনকি তার উচ্চৈঃস্বরে গালমন্দের সমর্থনে অন্যান্য সাহাবীরাও আমার দিকে রাগান্বিত চোখে তাকাচ্ছিলেন। আমি যতই নিজেকে আত্মগোপন করার চেষ্টা করছিলাম, ততই তারা আমাকে ঘৃণা করছিলেন। এমতাবস্থায় আমার চাচা আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে দেখতে পেলাম। সাথে সাথে তাঁর কাছে আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে গেলাম এবং তাঁর কাছে আবেদন পেশ করে বললাম :

'চাচা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রক্তের সম্পর্ক ও কুরাইশ বংশে আমার মান-সম্মান ও নেতৃত্বের গুরুত্ব সম্পর্কে যা জানেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেসব বিচার করে আমার ইসলাম গ্রহণে আনন্দিত হবেন বলে আমি বিরাট আশা পোষণ করে এসেছি। আপনি আমার ব্যাপারে তাঁকে একটু সুপারিশ করুন।'

তিনি উত্তর দিলেন :

'আল্লাহর শপথ! আমি তোমার প্রতি তাঁর বিরক্তি ও ঘৃণাভাব দেখছি। তাই কোনো উপযুক্ত সুযোগ ছাড়া কোনোভাবেই সুপারিশ করতে পারব না।

কারণ, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মান ও ভক্তি করি এবং তাঁর মতামতকে শ্রদ্ধা করি।'

এ পরিপ্রেক্ষিতে নিরুপায় হয়ে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বললাম :

'চাচাজান, এ অবস্থায় আমাকে কার হাওলা করছেন?'

তিনি বললেন,

'আমার যা বলার বলেছি, তোমার ব্যাপারে এর বেশি আমার কিছুই করার নেই।'

তাঁর এই উক্তি শুনে আমি ভীষণভাবে চিন্তিত হয়ে পড়লাম। এমতাবস্থায় আমার চাচাত ভাই আলী ইবনে আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে দেখতে পেলাম। তার নিকট গিয়ে সামান্য করুণা চেয়ে আবেদন-নিবেদন করলে তিনিও সেই একই উত্তর দিলেন, যা আমার চাচা আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দিয়েছিলেন। পরিশেষে নিরুপায় হয়ে আমার চাচা আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে আবার ধরনা দিলাম এবং অনুরোধ করে বললাম যে :

'চাচাজান! আপনি যদি আমার প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হৃদয়কে দয়ার্দ্র করতে না-ই পারেন, কমপক্ষে ঐ ব্যক্তিকে তো আমাকে উচ্চৈঃস্বরে গালি ও ভর্ৎসনা দেওয়া এবং অন্যান্যদেরকে আমার বিরুদ্ধে উসকে দেওয়া থেকে বিরত রাখতে পারেন।'

তিনি বললেন :

'কে তোমাকে গালি দিচ্ছে? আমাকে তার বিবরণ দাও। চাচার নিকট সেই আনসারীর বিবরণ দিলাম। চাচা তার পরিচয় পেয়ে বললেন, সে তো নুআইমান ইবনে হারেস আন নাজাশী। তাঁকে ডেকে বললেন :

নুআইমান! আবূ সুফিয়ান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাত ভাই এবং আমার ভাতিজা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজ হয়তো তার উপর বিরক্ত হয়ে আছেন। একদিন হয়তো তার ওপর সন্তুষ্টও হতে পারেন। তুমি তাকে গালমন্দ করা থেকে বিরত থাক। সে সম্মত না হওয়া পর্যন্ত তাকে চাচা আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু অনুরোধ করেই যাচ্ছিলেন।'

পরিশেষে চাচা আব্বাসের অনুরোধে আনসারী প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, এ মুহূর্ত থেকে আর তাকে বিরক্ত করব না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'জুহ্ফা' নামক স্থানে (যা মদীনার পথে মক্কা থেকে চার মনযিল দূরে) যাত্রাবিরতিকালে যে তাঁবুতে তিনি বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, আমি সে তাঁবুর দরজায় বসে পড়ি, আর আমার ছেলে জা'ফর আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁবু থেকে বের হওয়ার সময় আমাকে দরজার সামনে বসা অবস্থায় দেখতে পান। এবারও তিনি আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আমি বারবার ব্যর্থ হচ্ছি বটে; কিন্তু একেবারে নিরাশ হইনি। যখনই তিনি কোনো স্থানে যাত্রাবিরতি করতেন, সেখানেই তাঁর তাঁবুর দরজায় বসে পড়তাম এবং সেখানেই অবস্থান নিতাম। আমার ছেলে জা'ফরকে আমার সামনে দাঁড় করিয়ে রাখতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার প্রতি নজর দিয়েই আমার দিক থেকে অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতেন। এমতাবস্থায় কয়েক দিন চলল। এক পর্যায়ে আমার উৎকণ্ঠা সীমা অতিক্রম করে গেল। আমি ভেঙে পড়লাম। এ সময় আমার স্ত্রীকে শেষ সংবাদ দিলাম :

> 'আল্লাহর শপথ করে বলছি, হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন, নয় তো আমি আমার ছেলেকে নিয়ে হতাশাগ্রস্ত মরু প্রান্তরে ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করব– এটাই আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।'
>
> রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমার এই সিদ্ধান্তের সংবাদ জানলেন, তখন আমার প্রতি সদয় হলেন। তিনি বিশ্রামাগার থেকে বের হওয়ার সময় এই প্রথম বারের মতো স্নেহের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। আমি আশা করছিলাম যে, তিনি আমার দুরবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে একটু মুচকি হাসি হাসবেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কায় প্রবেশকালে আমিও তাঁর সফরসঙ্গীগণের অন্তর্ভুক্ত হই। তিনি যখন মাসজিদুল হারামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন, আমি তখন তাঁর আগে আগে দৌড়াতে থাকি। এমনকি এক মুহূর্তের জন্যও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গ ত্যাগ করিনি।

মক্কা বিজয়ের পর পরই বনূ আহওয়াজ গোত্রের নেতৃত্বে সমস্ত আরব গোত্র সম্মিলিতভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে 'হুনাইন' নামক স্থানে এক অভিযান পরিচালনা করে। এটি এমন এক জঙ্গি অভিযান, যা ইতঃপূর্বে কারো বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছে বলে কেউ জানে না। তারা এই যুদ্ধের মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানদের চিরতরে নির্মূল করে দেওয়ার সিদ্ধান্তই নিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে সেনাপতির দায়িত্ব নিলেন। সাহাবীদের বিরাট বাহিনী নিয়ে তাদের মোকাবেলার জন্য রওয়ানা হলেন। হুনাইনের যুদ্ধ-ময়দানে পৌঁছে যখন আমি দেখতে পেলাম যে, মুশরিকদের বিরাট সমাবেশ। আমি মনে মনে শপথ নিলাম :

> 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শত্রুতায় আমার অতীত জীবনের কৃত সমস্ত অপরাধের কাফফারা আজই আদায় করে ছাড়ব এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার এই বীরত্ব ও কুরবানী দেখে এবার নিশ্চয়ই খুশি হবেন।

উভয় বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেল। মুসলমান বাহিনীর ওপর মুশরিকদের প্রচণ্ড আক্রমণের এক পর্যায়ে মুসলমান বাহিনীর মধ্যে ভীতি ছড়িয়ে পড়ল। এমনকি তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যুদ্ধের ময়দানে ফেলে রেখেই প্রাণ ভয়ে ছোটাছুটি করতে লাগল। আমরা আশঙ্কাজনক অবস্থায় পরাজয়ের সম্মুখীন হতে যাচ্ছিলাম। যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের এই চরম সন্ধিক্ষণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য আমার পিতামাতা কুরবান হোক– তিনি 'শাহ্বা' নামক অশ্বপৃষ্ঠে অসীম সাহসিকতার সঙ্গে পাহাড়ের মতো দৃঢ় অবস্থান নিলেন। তিনি নিজের ও তাঁর চতুর্দিকের সাথীদের প্রতিরক্ষায় উন্মুক্ত তালোয়ার চালাতে লাগলেন। মনে হচ্ছিল যেন ক্ষিপ্ত সিংহ। সেই চরম মুহূর্তে আমি আমার ঘোড়ার পৃষ্ঠ থেকে এক লাফে নিচে নেমে আমার তলোয়ারের খাপ ভেঙে ফেললাম এবং মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম, আমার তলোয়ার যেন আর তাতে ঢোকানোর প্রয়োজন না হয়। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, আল্লাহই সেই সময় আমার মনের অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞাত। সেই মুহূর্তে আমার জীবনের বিনিময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের নিরাপত্তাই আমার

জন্য মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াল। আমি শাহাদাতের জন্য প্রস্তুত হলাম। আমার চাচা আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অশ্ব 'শাহ্বার' লাগাম ধরে তার পাশে মযবুত অবস্থান নিয়েছিলেন আর আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপর পাশে অবস্থান নিয়ে আমার বাম হাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পা রাখার জন্য তামা বা পিতলের তৈরি রিংবিশেষ বা পাদানী শক্ত করে ধরলাম এবং ডান হাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিরক্ষায় মরণপণ তলোয়ার পরিচালনা করতে থাকলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রক্ষা করতে গিয়ে আমি জীবন বাজি রেখে ক্ষিপ্রতার সাথে শত্রুবাহিনীর চরম আঘাতের মোকাবেলা করছি দেখে তিনি আমার চাচা আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে জিজ্ঞাসা করলেন :

**চাচা, মরণপণ এই যোদ্ধা ব্যক্তিটি কে?**

উৎসাহব্যঞ্জক স্বরে তিনি উত্তর দিলেন :

এই ব্যক্তি আপনার চাচাত ভাই। আপনার চাচা হারেসের ছেলে আবূ সুফিয়ান। এটাই উপযুক্ত সময়। তিনি এর ফাঁকেই আমার জন্য সুপারিশপূর্বক আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, তার প্রতি সদয় হোন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহূর্তেই বললেন :

> 'আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট হলাম। তাঁর কৃত সারা জীবনের শত্রুতা ও বিরোধিতাকে আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। সে হবে জান্নাতে যুবকদের নেতা।'

আমার প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তোষ প্রকাশ হওয়ায় আমার অন্তর আনন্দে ভরে উঠল। সাথে সাথে আমি ঘোড়ার পাদানীতে রাখা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পায়ে আনন্দ ভরে চুমু দিলাম। আর তিনিও তৎক্ষণাৎ আমাকে সম্বোধন করে বললেন :

> 'আমার জীবনের শপথ, হে আমার প্রিয় ভাই! শত্রুর ব্যূহ ভেদ করে সামনের দিকে আক্রমণ চালাও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

এই নির্দেশবাক্য আমার জিহাদী চেতনা ও সাহসকে আগ্নেয়গিরির উদ্‌গীরণের মতো নতুনভাবে জাগিয়ে তুলল। গায়েবী শক্তিতে বলীয়ান হয়ে নব উদ্যোগে শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে তাদের ব্যূহ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। সাথে সাথেই সাহাবীদের এক জানবাজ দল আমার সাথে যোগ দিলে আমরা প্রচণ্ড ধাওয়া করে শত্রুদেরকে তিন মাইলের মতো দূরত্বে তাড়িয়ে নিয়ে গেলাম। তাদের শক্তিশালী অবস্থান ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।'

আবূ সুফিয়ান ইবনে হারেস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু 'হুনাইন' যুদ্ধের এ ঈমানী পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হওয়ার পর থেকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তর নিংড়ানো ভালোবাসার পাত্রে পরিণত হন। তিনি নিকটতম সাথীদের মর্যাদা লাভে ধন্য হলেন। এতদসত্ত্বেও আবূ সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর অতীত জীবনের কৃত অপরাধের কারণে কোনো দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতেন না। সেই লজ্জায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নজরে নজর দিতেন না। আবূ সুফিয়ান তার অন্ধকার যুগের অপকীর্তির কারণে হেদায়াতের নূর ও আল কুরআনের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকার কাফফারা হিসেবে রাত-দিন কুরআন তিলাওয়াত ও হেদায়াতের নির্দেশ আহরণে সচেষ্ট থাকতেন। দুনিয়ার রঙ্গমঞ্চ ও তার আনন্দ-উৎসব থেকে দূরে থেকে আল্লাহর ধ্যানে সর্বদা দেহমন নিমগ্ন রাখতেন। একদা মসজিদে নববীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে মসজিদে প্রবেশ করতে দেখতে পেয়ে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে জিজ্ঞাসা করলেন :

'আয়েশা! তুমি কি এই লোকটিকে চেন?'

তিনি উত্তর দিলেন :

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো তাকে চিনি না।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

'সে আমার চাচাত ভাই আবূ সুফিয়ান ইবনে হারেস। সে হলো মসজিদে নামাযের জন্য সর্বপ্রথম প্রবেশকারী ও সর্বশেষ প্রত্যাবর্তনকারী ব্যক্তি। খোদার ভয়ে যার চক্ষুদ্বয় হতে ক্রন্দনরত পানি এক মুহূর্তের জন্য পড়া বন্ধ হয় না।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকালে আবূ সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ভীষণ চিন্তিত ও ব্যথিত হন। তিনি এমনভাবে ভেঙে পড়েন, যেমন একমাত্র সন্তানের মৃত্যুতে তার মা অথবা একান্তই অন্তরঙ্গ কোনো বন্ধুর বিয়োগে তার বন্ধু ভেঙে পড়েন। তিনি এমন ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে থাকেন, যেমন একমাত্র অন্তরঙ্গ বন্ধুই তার বন্ধুর জন্য ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে থাকে। তাঁর মৃত্যুতে এমন হৃদয়গ্রাহী ভাষায়, আবেগময়ী ছন্দে মর্সিয়া রচনা করেন, যা শোনামাত্রই প্রতিটি ব্যক্তির মনে এর প্রতিটি বাক্য ব্যথা, ব্যাকুলতা ও দুঃখের প্রতিধ্বনি হিসেবে ধ্বনিত হয়।

উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খিলাফতের সময়ে আবূ সুফিয়ান ইবনে হারেস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর মৃত্যু সন্নিকটবর্তী বলে অনুধাবন করলেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি নিজ হাতেই নিজের কবর খনন করে চিরনিদ্রার বিছানায় শায়িত হওয়ার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নিলেন। এ অবস্থায় তিন দিন অতিবাহিত হতে না হতেই মৃত্যুর পূর্বাভাস পেলেন। সে যেন মৃত্যুর পূর্ব-নির্ধারিত উপস্থিতি। তিনি তাঁর স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও পরিবারের লোকজনদের ডাকলেন এবং ওসিয়ত করলেন যে,

> 'আমার মৃত্যুতে তোমরা কান্নাকাটি করো না। আল্লাহর শপথ, আমি ইসলাম গ্রহণ করার পর কোনো গুনাহে লিপ্ত হইনি। আমার জানামতে, এমন কোনো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডও করিনি, যার জন্য আমি আল্লাহর দরবারে লাঞ্ছিত হব।'

দেখতে না দেখতেই তাঁর পবিত্র আত্মা দেহ ত্যাগ করে চলে গেল। উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর নামাযে জানাযার ইমামতি করেন। তাঁর মৃত্যুতে উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ও সাহাবীরা ভীষণভাবে মর্মাহত ও ব্যথিত হন।

তাঁর মৃত্যুকে ইসলাম ও তাঁর পরিবারের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি বলে মনে করা হয়।

আবূ সুফিয়ান ইবনে হারেস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জীবনী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সহায়ক গ্রন্থাবলি :

১. আল ইসতিয়াব : ৪র্থ খণ্ড, ৮৩ পৃ.।
২. আল ইসাবাহ : ৪র্থ খণ্ড, ৯০ পৃ.।
৩. সিফাতুস সাফওয়াহ : ১ম খণ্ড, ৫১৯ পৃ. (হালব সংস্করণ)।
৪. আল কামিল লিইবনে আছীর : ২য় খণ্ড, ১৬৪ পৃ.।
৫. আস সীরাতুন নুবুবিয়াহ্ লিইবনে হিশাম : ২য় খণ্ড, ২৬৮ পৃ. ও সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।
৬. তারীখ আত তাবারী : ২য় খণ্ড, ৩২৯ পৃ.।
৭. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ : ৪র্থ খণ্ড, ২৮৭ পৃ.।
৮. আত তাবাকাতুল কুবরা : ৪র্থ খণ্ড, ৫১ পৃ.।
৯. তাবাকাত ফুহুলুশ শুয়ারা : ২-৬ পৃ.।
১০. নিহায়াহ আল আরব : ১৭শ খণ্ড, ২৯৮ পৃ.।
১১. সাইরু আলামুন নুবালা : ১ম খণ্ড, ১৩৭ পৃ.।
১২. দুয়ালুল ইসলাম : ২য় খণ্ড, ৩৬ পৃ.।
১৩. মাআর রাঈউল আওয়াল : ১০৪ পৃ.।

# সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা)

*'শত্রুদের উপর তীর নিক্ষেপ করো সা'দ ....... বীরত্বের সাথে তীর নিক্ষেপ করো,*
*তোমার প্রতি আমার পিতামাতা কুরবান হোক।'*
*— উহুদ যুদ্ধে রাসূল (স)-এর উৎসাহব্যঞ্জক বাণী।*

উহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সা'দ (রা)-কে শত্রু বাহিনীর ওপর তীর নিক্ষেপ করার জন্য নির্দেশ দিচ্ছিলেন :

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِىْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِىْ وَلِوَالِدَيْكَ اِلَىَّ الْمَصِيْرُ ـ وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَالَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَىَّ ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ـ

'আমি তো মানুষকে তাদের পিতামাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। মা সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে এবং তাদের দুধ

ছাড়ানো হয় দুই বছরে। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট। তোমার পিতামাতা যদি আমার সাথে শিরক করার জন্য তোমার প্রতি প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে, এমন শিরক যে তার সমর্থনে তোমার নিকট কোনো দলীল-প্রমাণ নেই, সে ক্ষেত্রে তুমি তোমার পিতামাতার আনুগত্য করো না। তবে দুনিয়ায় তাদের সাথে সদয় ও শ্রদ্ধাসুলভ আচরণের মাধ্যমে দিনাতিপাত করো। সদ্ভাবে এবং যে বিশুদ্ধচিত্তে আমার অভিমুখী হয়েছে, তার পথ অবলম্বন করো। অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট এবং তোমরা যা করবে সে বিষয়ে আমি তোমাদেরকে অবহিত করব।' (সূরা লোকমান : ১৪-১৫)

আল কুরআনের এই আয়াতে সত্যের পথে একান্তই শান্তশিষ্ট ও নম্র-ভদ্র এক কিশোরের ঈমানী চেতনাকে পরীক্ষা করা হয়েছে। তার তাওহীদ ও কুফরী ভাবধারা এবং মিথ্যার ওপর সত্যকে প্রাধান্য দেওয়ার অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার এক বিরল ঘটনার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। যে ঘটনা যুগ যুগ ধরে সত্য সন্ধানীদের জন্য প্রেরণার উৎস হয়ে আসছে। সত্যের পথে যে কিশোরের ঈমানী দৃঢ়তাকে কেন্দ্র করে এই ঘটনার সূত্রপাত, তিনি হলেন মক্কার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের শ্রদ্ধাভাজন পিতামাতার একমাত্র প্রাণপ্রিয় সন্তান সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস। যার প্রতি আল্লাহ নিজে সন্তুষ্ট এবং তিনিও আল্লাহর ওপর সন্তুষ্ট।

মক্কা নগরীতে যখন ইসলামের আলোর বিস্তার ঘটে, তখন তিনি উঠতি বয়সের এক কিশোর। স্বভাবে অত্যন্ত নম্র-ভদ্র ও শান্ত-শিষ্ট, পিতামাতার প্রতি একান্ত অনুগত। বিশেষ করে তিনি তার মাতার প্রতি ছিলেন বিশেষভাবে শ্রদ্ধাশীল।

সতেরো বছর বয়সের সা'দ ব্যক্তিত্বে ও বুদ্ধিমত্তায় ছিলেন সমবয়সীদের তুলনায় অনেক অগ্রসর। অপরদিকে তিনি ছিলেন নেতৃস্থানীয়দের মতো বিজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান ও দূরদর্শী। তিনি তাঁর সমবয়সী বন্ধুদের মতো হাসি-তামাশা ও আমোদ-প্রমোদপ্রিয় ছিলেন না। তীর-ধনুক তৈরির প্রতি ছিল তাঁর অসাধারণ ঝোঁক এবং তীরন্দাযীর প্রতি সীমাহীন আগ্রহ। এ ক্ষেত্রে তিনি সমকালীন আরবের অতি দক্ষ তীরন্দাযদের তুলনায় কোনো অংশেই কম ছিলেন না। তাঁকে দেখে মনে হতো যে, গুরুত্বপূর্ণ কোনো অভিযানের জন্য প্রস্তুতিতে সদাব্যস্ত। অপরদিকে শিরক ও পৌত্তলিকতায় নিমজ্জিত তাঁর জাতির কর্মকাণ্ডে তিনি মোটেও সন্তুষ্ট ছিলেন না।

তিনি সর্বদা এ অপেক্ষায় ছিলেন যে, এমন কোনো নেতার আবির্ভাব কখন ঘটবে, যখন তিনি তাঁর বিস্ময়কর গুণাবলির পূর্ণ শক্তিশালী বাহু মক্কার বিধ্বস্ত সমাজের দিকে সম্প্রসারণ করবেন এবং অন্ধকারে নিমজ্জিত মানবজাতিকে উদ্ধার করবেন।

এসব আশাবাদের এক পর্যায়ে আল্লাহ বিশ্বমানবতার মুক্তির জন্য সেই গুণাবলি সম্পন্ন মহান নেতা বিশ্বনবী মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব ঘটালেন মক্কা নগরীতে। তিনি সাথে নিয়ে এলেন চির ভাস্বর, চির মহীয়ান আল কুরআন।

সেই আলোর রোশনীতে অন্ধকারে নিমজ্জিত জাতিকে তিনি মুক্তির পথে আহ্বান জানালেন। তারা জাহিলিয়াতের শৃঙ্খল থেকে মুক্তির সন্ধান পেল। এ হক ও হেদায়াতের দাওয়াত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস-এর কাছে পৌঁছানোর সাথে সাথে তিনিও তা কবুল করে নিলেন। তিনি হলেন, প্রথম পর্যায়ের ইসলাম গ্রহণকারী তৃতীয় বা চতুর্থ সাহাবী। এ জন্যই তিনি গর্বের সাথে প্রায়ই বলতেন,

> 'সাত দিন এমনভাবে অতিবাহিত করলাম যে, আমি ইসলামের এক-তৃতীয়াংশ হিসেবেই রইলাম।'

সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ইসলাম গ্রহণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। কারণ, বাল্যকাল থেকেই সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের মধ্যে বিরাজমান প্রতিভা, প্রজ্ঞা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা এই ইঙ্গিত বহন করত যে, তিনি সহসাই এই পূর্ণিমার নতুন চাঁদ হিসেবেই আলোকিত হবেন। বংশ-পরিচয়ে তিনি অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত। স্বাভাবিক কারণেই মক্কার আরো দশ জন বালকের মতো সত্যের আহ্বানে তাঁর সাড়া দেওয়া এত সহজ ছিল না। এসব গুণাবলির ঊর্ধ্বে যা তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরো নিকটবর্তী করে তোলে, তা ছিল এই যে, তিনি সম্পর্কে ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মামা। তিনি যুহ্‌রা গোত্রের সন্তান। আর যুহ্‌রা পরিবারই হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাতা আমেনা বিনতে ওয়াহাবের পরিবার। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই মামার বংশই তাঁর দাওয়াতের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে।

একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বেশ কয়েকজন সাহাবী নিয়ে কোনো এক অনুষ্ঠানে বসেছিলেন। এমন সময় দেখতে পেলেন যে, সা'দ ইবনে

আবী ওয়াক্কাস এই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য আসছেন। সমবেত সাহাবীদের উদ্দেশ্য করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

هٰذَا خَالِىْ فَلْيُرِنِىْ امْرُؤٌ خَالَه .

'সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস আমার মামা। আমার মামার মতো ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মামা আর কার আছে?'

সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা এত স্বাভাবিক ও সহজ ঘটনা ছিল না। তিনি বিজ্ঞ ছিলেন বটে কিন্তু ঈমান আনার পথে তাঁকে কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। তাঁর এ পরীক্ষার সমর্থনে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কুরআনের আয়াত নাযিল করেছেন। তাঁর সেই দুর্লভ পরীক্ষার ঘটনা সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এভাবে বর্ণনা করেন :

'আমার ইসলাম গ্রহণের তিন রাত পূর্বে আমি স্বপ্নে দেখি, আমি যেন সমুদ্রের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হয়েছি এবং পানির তিমিরাচ্ছন্নতায় আমি আচ্ছাদিত হয়ে পড়েছি। গভীর সমুদ্রের তলদেশে ঢেউয়ের তালে তালে শুধু ওলট-পালট হচ্ছি। হঠাৎ দেখি আমার সামনে চাঁদের আলো উপস্থিত। আমি সেই চাঁদের আলোকে অনুসরণ করতে লাগলাম। এক পর্যায়ে চাঁদের নিকট পৌঁছে দেখি, সেখানে আমার পৌঁছানোর আগেই যারা সেখানে পৌঁছে গেছেন, তারা হলেন- যায়েদ ইবনে হারেসা, আলী ইবনে আবী তালিব এবং আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম।'

আমি তাঁদের প্রশ্ন করলাম :

'আপনারা কতক্ষণ আগে এখানে এসে পৌঁছেছেন?'

তাঁরা উত্তর দিলেন :

'ঘণ্টাখানেক আগে।'

এ স্বপ্ন দেখার তিন দিন যেতে না যেতেই সূর্য যখন দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি, আমার কাছে খবর পৌঁছল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোপনে গোপনে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছেন। আমি বুঝতে পারলাম যে, হয়তো আল্লাহ আমার কল্যাণই চাচ্ছেন। আমার ইসলাম গ্রহণের মধ্য দিয়ে তিনি আমাকে অন্ধকার পথ থেকে আলোর পথে আনতে চাচ্ছেন।

কালক্ষেপণ না করে তৎক্ষণাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্ধানে বের হলাম। খুঁজতে খুঁজতে তাঁকে 'শিআবে যিয়াদ' নামক স্থানে পেলাম। তিনি সবেমাত্র আসরের নামায শেষ করেছেন। আমি তাঁর হাতে হাত রেখে ইসলাম গ্রহণ করলাম। স্বপ্নে যে ক'জন ভাইকে দেখেছি সেই ক'জন ছাড়া আর কেউ আমার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেননি।'

অতঃপর ইসলাম গ্রহণের সেই সংক্ষিপ্ত ঘটনার পর পরবর্তী পরীক্ষার বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন :

'আমার আম্মা আমার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ শুনে ভীষণ ক্ষুব্ধ হলেন। তাঁর ক্ষোভ বর্ণনা করার ভাষা আমার জানা নেই। আমি তার স্নেহধন্য ও অনুগত ছেলে।'

তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন :

'কেমন ধর্ম তুমি গ্রহণ করেছ, তাতে এমন কী আছে যে, যার জন্য তোমার পিতামাতার ধর্ম পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছ? আল্লাহর শপথ, এই মুহূর্ত থেকে আমি পানাহার পরিত্যাগ করলাম, যতক্ষণ না তুমি তোমার নতুন ধর্ম পরিত্যাগ করে আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে। অন্যথায় আমি এই দুনিয়া থেকে এ অবস্থায় চিরবিদায় নেব। এ জন্য তুমি সারাজীবন অনুতাপ করতে থাকবে। এ অগ্নিজ্বালা তোমাকে সারা জীবন দগ্ধ করবে। কিয়ামত পর্যন্ত লোকে তোমাকে এর জন্য ধিক্কার ও তিরস্কার করতে থাকবে।'

আমি আমার আম্মাকে অনুরোধ করে বললাম :

'আম্মা কখনো আপনি পানাহার পরিত্যাগ করবেন না। দুনিয়ার যে কোনো কিছুর বিনিময়েই হোক না কেন, আমি আমার দীন পরিত্যাগ করব না। আমি আমার অবস্থান নিলাম। তিনিও তার মতো জিদ ধরলেন ও পানাহার পরিত্যাগ করা অবস্থায় কয়েক দিন অতিবাহিত করলেন।'

এমনকি পানাহার না করার কারণে তার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল। অস্বাভাবিক দুর্বল ও প্রায় নিস্তেজ হয়ে পড়লেন। এদিকে আমি প্রতিটি মুহূর্তেই তাঁর কাছে এসে তাঁর স্বাস্থ্যের খবরাখবর নিতে থাকি। তাঁর জীবন রক্ষার জন্য যৎকিঞ্চিৎ পানাহার করতে অনুরোধ জানাতে থাকি। তিনি প্রতিবারই কঠোরভাবে আমার কাতর আবেদন প্রত্যাখ্যান করতে থাকেন। এমনকি তিনি এতই কঠোর শপথ করে

বসলেন যে :

'হয় আমাকে আমার দীন ত্যাগ করে পৌত্তলিকতায় ফিরে আসতে হবে নতুবা তিনি পানাহার ত্যাগ করে মৃত্যুকে গ্রহণ করবেন।'

সংকট চরম আকার ধারণ করলে আম্মাকে বললাম :

'আম্মা আপনার প্রতি আমার অগাধ ভালোবাসা রয়েছে। আমি আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলকে আপনার চেয়েও অধিক ভালোবাসি। আল্লাহর শপথ, যদি আপনাকে হাজারটি রূহ দান করা হয় এবং হাজার রূহই একের পর এক মৃত্যুবরণ করে, তবু আমি সা'দ দুনিয়ার কোনো কিছুরই বিনিময়ে ইসলাম ত্যাগ করব না।'

আমার এই অবিচলিত ও সীমাহীন দৃঢ় মনোবল দেখে তিনিই অবশেষে তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে বাধ্য হন এবং অত্যন্ত ঘৃণার সঙ্গে যৎ সামান্য পানাহার করতে সম্মত হন।'

আর এই মুহূর্তেই আল্লাহ এ ঘটনার প্রেক্ষিতে পবিত্র আয়াত নাযিল করেন :

وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَالَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ـ

'তোমার পিতামাতা যদি আমার সাথে শিরক করার জন্য তোমার প্রতি প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে, এমন শিরক যে, যার সমর্থনে তোমার নিকট কোনো দলীল-প্রমাণ নেই। সে ক্ষেত্রে তুমি তোমার পিতামাতার আনুগত্য করো না। তবে দুনিয়ায় তাদের সাথে সদয় ও শ্রদ্ধাসুলভ আচরণের মাধ্যমে দিনাতিপাত করো।'

সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে যেমন মুসলমানদের মর্যাদা সমুন্নত হয়, তেমনি ইসলামের গৌরব এবং শক্তিও বৃদ্ধি পায়। বদরের যুদ্ধে তাঁর ছোট ভাই উমাইর ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ভূমিকাও চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁর ছোট ভাই উমাইর ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে উঠতি বয়সের কিশোর বলা যায়। বদরের যুদ্ধের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন যোদ্ধাদের যোগ্যতা পরিমাপের জন্য তাদের শারীরিক অবস্থা যাচাই করছিলেন, তখন বয়সের স্বল্পতার কারণে তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বাদ

পড়েন কি না তা ভেবে উমাইর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃষ্টি এড়িয়ে গোপনে অবস্থান নিচ্ছিলেন। এতদসত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দেখে ফেলেন এবং বয়সে ছোট হওয়ার কারণে তাঁকে ফেরৎ পাঠান। তাঁকে বাদ দেওয়ায় তিনি এমনভাবে কাঁদতে থাকেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হৃদয় গলে গেল। পরিশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দিলেন। এতে সা'দ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মনে আনন্দের জোয়ার বইতে লাগল। তিনি হাসিমুখে ছোট ভাই উমাইরের কাঁধে তলোয়ার ঝুলিয়ে দিলেন। মনে হচ্ছিল যেন তলোয়ারই তার চাইতে লম্বা। আনন্দের সাথে দুই সহোদর জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর জন্য যুদ্ধে রওয়ানা হলেন। যুদ্ধশেষে সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর ছোট ভাই উমাইরকে শহীদ অবস্থায় বদরের রণক্ষেত্রে রেখে আল্লাহর কাছে এর বিনিময়ে উত্তম প্রতিদানের আশা করে একাই মদীনায় ফিরে এলেন।

উহুদের যুদ্ধের এক পর্যায়ে মুসলিম বাহিনীতে শক্রদের ভয় ছড়িয়ে পড়লে তাদের পদস্খলন ঘটে। সাহাবীদের কয়েকজন ছাড়া সবাই প্রাণ বাঁচানোর জন্য নিরাপদ স্থানের উদ্দেশ্যে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ১০ জন সাহাবীও ছিলেন না। সেই চরম বিপদের সময় সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর তীরের প্রচণ্ড আঘাতের পর আঘাতে শক্রু বাহিনীকে পিছু হটতে বাধ্য করেন। এক পর্যায়ে এমন নৈপুণ্যের সাথে তীর চালনা করছিলেন যে, তাঁর প্রতিটি তীর তিনি এক একজন মুশরিককে ধরাশায়ী করছিল। তাঁর এই তীর চালনার নৈপুণ্য দেখে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে উৎসাহ প্রদান করছিলেন আর বলছিলেন যে :

> 'তীর নিক্ষেপ কর সা'দ, বীরত্বের সাথে তীর নিক্ষেপ কর, তোমার প্রতি আমার আব্বা-আম্মা কুরবান হোক।'

তাঁর প্রতি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই উদ্দীপনাময় বাক্য উচ্চারণের জন্য সারা জীবন তিনি গর্ববোধ করতেন এই বলে যে :

> 'আমি ছাড়া আর কারো ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন উদ্দীপনাময় স্বরে তাঁর মা-বাবাকে কুরবান হওয়ার কথা কখনও উচ্চারণ করেননি।'

সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর সম্মানের সর্বোচ্চ শিখরে তখন আরোহণ করেন, যখন উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু পারস্য সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দেন। উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এ উদ্দেশ্যে মুসলিম সাম্রাজ্যের সকল গভর্নরদের প্রতি এক ফরমান জারি করেন :

> 'যুদ্ধে অংশগ্রহণের উপযোগী সব জনশক্তি চাই অস্ত্রধারী যোদ্ধা হোক অথবা অশ্বারোহী তীরন্দাজ, চিকিৎসাসেবা দেওয়ার মতো চিকিৎসক হোক কিংবা পরিস্থিতির ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখার মতো বিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব। পরামর্শ দেওয়ার মতো যোগ্য ব্যক্তিই হোক কিংবা যোদ্ধাদের উদ্বুদ্ধ করার মতো কোনো কবি-সাহিত্যিক বা বক্তা– সব ধরনের ব্যক্তিকেই আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।'

দলে দলে প্রতিনিধি দল আসতে লাগল। মদীনার অলিগলি তাদের পদচারণায় সরব হয়ে উঠল। সৈন্য সংগ্রহ চূড়ান্ত হলে উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর কর্মপরিষদ এবং পরামর্শসভার যৌথ অধিবেশনে এ বিরাট বাহিনীর সেনাপতি হিসেবে কাকে নিযুক্ত করা যায় এ নিয়ে পরামর্শ করেন।

তারা সর্বসম্মতিক্রমে ও সমস্বরে বললেন :

> 'সিংহ তো সর্বদা একজনই, আর তিনি হলেন, সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।'
>
> উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নাম ঘোষণা করলেন। এবং এই বিরাট বাহিনীর সেনাপতি হিসেবে তার হাতে যুদ্ধ-পতাকা সোপর্দ করলেন।

পারস্য সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে জিহাদের উদ্দেশ্যে মদীনা মুনাওয়ারা থেকে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাদের বিদায় দেওয়ার জন্য সেনাপতি সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে ওসিয়ত করে বললেন :

> 'হে সা'দ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মামা সম্পর্কের অহংকার যেন আপনাকে পেয়ে না বসে এবং মনের মধ্যে এ অহংকার মাথাচাড়া দিয়ে না উঠে যে, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন নিকটতম সাহাবী। জেনে রাখুন, আল্লাহ কখনো পাপ

ও অন্যায়কে পাপ ও অন্যায় দিয়ে নির্বাপিত করেন না; বরং পাপ ও অন্যায়কে তিনি পুণ্য ও করুণা দিয়েই নির্বাপিত করে থাকেন। হে সা'দ! আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমেই সত্যিকারার্থে তিনি তাঁর বান্দাকে নিরূপণ করে থাকেন; বংশ-গৌরবের কারণে নয়। উচ্চ বংশীয় সম্ভ্রান্ত পরিবার নামে খ্যাত ও নিম্ন বংশীয় সাধারণ পরিবার আল্লাহর দৃষ্টিতে সবাই সমান। কারণ, আল্লাহই তাদের প্রভু। আর তারা সবাই তাঁর বান্দাহ। তাকওয়া ও আনুগত্যের ভিত্তিতেই তারা সর্বাধিক সম্মানিত। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত ও নির্দেশের প্রতি বিশেষ করে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ ও হেদায়াত আমাদের জন্য চূড়ান্ত হেদায়াত, নসীহত ও নির্দেশ।'

অতঃপর এই বিরাট বাহিনী জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। তাদের মধ্যে ছিল নিরানব্বই জন বদরী সাহাবীসহ বায়আতে রেযওয়ানসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে উপস্থিত থাকা তিনশত দশজন স্বনামধন্য বুযুর্গ সাহাবী। ফতেহ মক্কা বা মক্কা বিজয়কালের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের নিকটতম তিন শত যোদ্ধা সাহাবী ছাড়াও সাহাবী সন্তানদের সাত শত তরুণ যোদ্ধা এ বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে তার শোভা বৃদ্ধি করছিল।

সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর এই বিরাট বাহিনী নিয়ে ১৬ হিজরীতে ঐতিহাসিক কাদেসিয়া ময়দানের অভিমুখে রওয়ানা হলেন। কাদেসিয়ার যুদ্ধে আল্লাহ মুসলমানদের ঐতিহাসিক বিজয় দান করেছিলেন। এই যুদ্ধের শেষ দিনকে 'ইয়াওমুল হারীর' বা হত্যাকাণ্ডের বিভীষিকাময় দিন বলা হয়। সেই দিন মুসলমান যোদ্ধারা পারস্য বাহিনীকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে নিঃশেষ করার সিদ্ধান্ত নেন এবং তাদেরকে এমনভাবে হত্যা করতে থাকেন যে, তাদের পালানোর আর কোনো সুযোগ ছিল না। আল্লাহু আকবার তাকবীর ধ্বনির তালে তালে মুসলিম যোদ্ধারা এমনভাবে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন যে, পারস্য সেনাপতি রুস্তমের কর্তিত শির মুসলমানদের বর্শার মাথায় ঝুলানো হলে শত্রুবাহিনীর মধ্যে ভীষণভাবে ভীতির সঞ্চার হয়। তাদের এক এক করে ইঙ্গিত করামাত্রই অবনত মস্তকে মুসলিম যোদ্ধাদের সামনে উপস্থিত হলে তাদের তরবারি দ্বারাই তাদেরকে হত্যা করা হতো। গনীমত বা যুদ্ধলব্ধ ধন-সম্পদের

পরিমাণ যতই বর্ণনা করা হোক না কেন, তা ছিল সবই কম। এ যুদ্ধে পারস্য সৈনিকদের মধ্যে যাদের ছিন্নভিন্ন লাশ গণনা করা সম্ভব হয়েছিল তাদের সংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজার।

সা'দ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে আল্লাহ দীর্ঘ হায়াত ও বিশাল প্রাচুর্য দান করেছিলেন। মৃত্যুর ওসিয়তকালে তিনি তাঁর ছেঁড়া-ফাটা পশমি একখানা জামা দেখিয়ে বলেন যে :

كَفِّنُوْنِىْ بِهَا فَإِنِّىْ لَقِيْتُ بِهَا الْمُشْرِكُوْنَ يَوْمَ بَدْرٍ وَإِنِّىْ أُرِيْدُ أَنْ أَلْقَى بِهَا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ أَيْضًا ـ

'এই জামা দিয়ে আমাকে কাফন পরাবে। কারণ এই জামা পরিধান করে আমি বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম এবং আমি চাই যে, এই জামা পরা অবস্থায় কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হই। তাঁর সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করি।' আমীন!

---

সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জীবনী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সহায়ক গ্রন্থাবলি :


১. আল ইসতিয়াব : ২য় খণ্ড , ১৮ পৃ.।
২. আল ইসাবাহ : ২য় খণ্ড, ৩০ পৃ.।
৩. আল মিলালু ওয়ান নিহালু : ১ম খণ্ড, ২০ পৃ.।
৪. আশহুরু মাশাহিরিল ইসলাম : ৩য় খণ্ড, ৫২৫ পৃ.।
৫. আত তাবাকাতুল কুবরা : ১ম খণ্ড, ২১ পৃ.।
৬. তুহফাতুল আহওয়াযী : ১০ খণ্ড, ২৫৩ পৃ.।
৭. সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১ম খণ্ড, ৬২ পৃ.।
৮. যুআমাউল ইসলাম : ১১৪ পৃ.।
৯. রিজালু হাওলার রাসূল : ১৪১ পৃ.।
১০. সা'দ ইবনে আবী ওক্কাস ওয়া আবয়াতায়ালুল কাদেসিয়াহ লিস্-সাহ্হার।
১১. আর রিয়াদুল নাদিরাহ : ২য় খণ্ড, ২৯২ পৃ.।
১২. সিফাতুস সাফওয়াহ : ১ম খণ্ড, ১৩৮ পৃ.।
১৩. তাহযীব ইবনে আসাকির : ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৯৩ পৃ.।
১৪. আল মাআরিফ : ১০৬ পৃ.।
১৫. আন নুজুমুয যাহিরাত : সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।
১৬. উসদুল গাবাহ : ২য় খণ্ড, ২৯০ পৃ.।
১৭. জামহারাতু আনসাবিল আরব : ৭১ পৃ.।
১৮. তারীখুল ইসলাম : ১ম খণ্ড, ৭৯ পৃ.।
১৯. ফাতাহ মিসর ওয়া আখবারুহা : ৩১৮ পৃ.।
২০. আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ : ৮ম খণ্ড, ৭২ পৃ.।

# হুযাইফা ইবনে আল ইয়ামান (রা)

*তোমাদের জন্য হুযাইফা (রা) যা বর্ণনা করে, তা বিশ্বাস করো এবং আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) যেভাবে কুরআন তিলাওয়াত করে, তোমরা সেভাবে কুরআন তিলাওয়াত করো।*

*–রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী*

'তুমি যা পসন্দ কর, মুহাজির হিসেবেও পরিচয় দিতে পার, আর যদি আনসার হিসেবে পরিচয় দিতে চাও, তাও দিতে পার। এই দুটির মধ্যে যে পরিচয় তোমার কাছে বেশি পছন্দনীয়, সেই পরিচয়েই নিজের পরিচয় দাও।'

ইসলাম গ্রহণের পর মক্কায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে। তাঁর পরিচয়ের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপরিউক্ত কথাগুলো বলেন।

মুসলমানদের সবচাইতে সম্মানিত দুই গোষ্ঠীর মধ্যে যে কোনো এক গোষ্ঠীর পরিচয়ে পরিচিত হওয়ার মূলে রয়েছে একটি ঘটনা। ঘটনাটি হচ্ছে, হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পিতা আল ইয়ামান মক্কা নগরীর বনূ আব্‌স গোত্রের সদস্য। কোনো কারণে একজনকে হত্যা করার অপরাধে মক্কা থেকে তাঁকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। সে ইয়াসরিবে গিয়ে আবদে আশহাল গোত্রে আশ্রয় নেয়। সেই গোত্রেই বিয়ে করে। তাদের সাথেই আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ হয়। সেখানেই তাঁর পুত্র হুযাইফা জন্মগ্রহণ করে। এই প্রবাস জীবনের এক পর্যায়ে আল ইয়ামানের ওপর থেকে মক্কা প্রবেশের বাধা-নিষেধ তুলে নেওয়া হয়। তখন

থেকেই সে মক্কায় আসা-যাওয়া শুরু করে। তার মদীনায় অবস্থানকালই ছিল দীর্ঘ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনায় হিজরত করার পূর্বেই ইসলামের আলোকে আরব ভূমি আলোকিত হয়ে ওঠে। তখন হুযাইফার পিতা আল ইয়ামানের নেতৃত্বে আবদ আশহাল গোত্রের আরো এগারো জন সদস্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য মক্কায় আসেন এবং তাঁর সঙ্গে দেখা করে ইসলাম গ্রহণ করেন। এ কারণে হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মদীনায় প্রতিপালিত মাক্কী সন্তান হিসেবে পরিচিত হন।

হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মুসলিম পিতামাতার যত্নে ইসলামী পরিবেশে প্রতিপালিত হতে থাকেন। এ পরিবারের সদস্যরা ইসলামের প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণের গৌরবে গৌরবান্বিত ছিলেন। শিশু হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে না দেখেই পিতামাতার সংস্পর্শে ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এক নজর দেখে মনে শান্তি পাওয়ার জন্য শিশু সাহাবী হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মনে গভীর আগ্রহ সৃষ্টি হয়। পিতামাতার কোলে ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো আলোচনা হলেই অদম্য আগ্রহে তাঁকে খুঁজতে থাকতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে তিনি পিতা-মাতাকে নানা প্রশ্ন করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর এই আগ্রহ ক্রমেই বাড়তে থাকে। বাধ্য হয়েই আল ইয়ামান শিশু হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ লাভ করানোর জন্য মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। মক্কায় পৌঁছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ হলে শিশু সাহাবী হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করেন :

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি মুহাজির না আনসার?'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন :

'তুমি যা চাও, মুহাজির হিসেবেও পরিচয় দিতে পার, আর যদি আনসার হিসেবে পরিচয় দিতে চাও তাও দিতে পার। এ দুটির মধ্যে যে পরিচয় তোমার কাছে বেশি পছন্দনীয়, সে পরিচয়েই নিজের পরিচয় দাও।'

উত্তরে হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন :

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি বরং আনসার হিসেবে পরিচিত হতে চাই।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় হিজরত করেন, তখন হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যে সর্বক্ষণ লেগে থাকেন। তিনি এক মুহূর্তও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দূরে যেতেন না। শুধু বদরের যুদ্ধ ছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার পেছনে একটা ঘটনা রয়েছে। তিনি নিজেই সে ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেন :

'বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার পিছনে কারণ হলো, আমি ও আমার পিতা মদীনার বাইরে ছিলাম। সে সময় আমরা কুরাইশদের হাতে বন্দী হই।

জিজ্ঞাসাবাদকালে তারা বলে যে :

'তোমরা কোথায় কী উদ্দেশ্যে যাচ্ছো?'

আমরা উত্তর দিলাম :

'মদীনার উদ্দেশ্যে।'

তারা প্রশ্ন করল :

'হ্যাঁ, তোমরা মুহাম্মদের পক্ষ নিয়ে তার শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যাচ্ছ?'

আমরা উত্তর দিলাম :

আমরা শুধু মদীনার উদ্দেশ্যেই রওয়ানা হয়েছি। তারা কোনোক্রমেই এই কথা বিশ্বাস করতে চাচ্ছিল না, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিশ্রুতি না দেই যে, আমরা বদরের যুদ্ধে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করব না। কোনোভাবেই যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মিলে যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করি, এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে আমাদের ছেড়ে দেয়। মদীনায় পৌঁছে কুরাইশ বাহিনীর হাতে ধরা পড়ার ঘটনা এবং যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছাড়া পেয়েছি তা বর্ণনা করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমাদের করণীয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন :

'আমরা তাদেরকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালন করব এবং তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইব। তাদের শক্তির চেয়ে আল্লাহর শক্তিই বড় শক্তি।'

হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর পিতা আল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে উহুদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। এ যুদ্ধে হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শত্রুদের চরম আক্রমণের মুখে প্রায় নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে আল্লাহর রহমতে রক্ষা পান এবং তাঁর পিতা আল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু শাহাদাত বরণ করেন। কিন্তু এই শাহাদাত মুশরিকদের তলোয়ারের আঘাতে নয়; বরং মুসলমানদের তলোয়ারের আঘাতের কারণে।

তারও একটা ঘটনা রয়েছে, তা হলো :

উহুদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল ইয়ামান এবং সাবেত ইবনে ওয়াক্স রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমাকে তাদের অতি বার্ধক্যের কারণে মহিলা ও শিশুদের সাথে নিরাপদ আশ্রয়ে নির্ধারিত দুর্গে অবস্থান নিতে বলেন। কিন্তু যুদ্ধ চরম আকার ধারণ করলে আল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু তার সাথী সাবেত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বলেন :

'সাবেত তুমি কী চিন্তা করছো? আল্লাহর শপথ! আমরা আর কত দিন বাঁচব? বড় জোর গাধার পিপাসা লাগতে যতটুকু সময় লাগে। নিঃসন্দেহে আজ অথবা কাল মৃত্যু আমাদের প্রাণ কেড়ে নেবে সে জন্য নিঃসন্দেহে আমাদের তলোয়ার নিয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ করা উচিত। হতে পারে এ ওসীলায় আল্লাহ তাঁর নবীর সাথে আমাদেরও শাহাদাত দান করতে পারেন।'

অতঃপর উভয়েই তলোয়ার হাতে নিয়ে জিহাদের ময়দানে এসে জিহাদ শুরু করেন। আল্লাহ সাবেত ইবনে ওয়াক্স রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে শাহাদাত নসীব করেন। হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পিতা আল ইয়ামান ভুলবশত মুসলমানদের আঘাতের শিকার হন। কারণ, তারা তাঁকে চিনতেন না। এদিকে হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দূর থেকে আমার পিতা, আমার পিতা বলে চিৎকার করতে থাকেন। কিন্তু জীবন-মরণ এই জিহাদে কার কথা কে শোনে। পরিণতিতে বৃদ্ধ সাহাবী তাঁর সাথীদের তলোয়ারের আঘাতের পর আঘাতে ভূমিতে লুটিয়ে পড়েন। হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই

হৃদয়বিদারক ঘটনার জন্য দায়ী সাহাবীদের উদ্দেশ্যে শুধু এতটুকুই বললেন :

'আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দিন। তিনি অসীম করুণাময়।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে তার পিতা আল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর 'দিয়াত' বা রক্তের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ফায়সালা করেন। হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সেই রক্তের মূল্য নিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে বলেন :

'আমার পিতার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল শাহাদাত লাভ। তাঁর সে আশা পূরণ হয়েছে। হে আল্লাহ, তুমি সাক্ষী থেকো, আমি আমার পিতার রক্তের মূল্য মুসলমানদের উপঢৌকন দিলাম।'

তাঁর এই বিপ্লবী ভূমিকা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মর্যাদা অত্যধিক বৃদ্ধি করে দেয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুযাইফা ইবনে আল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমাকে নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। এ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর তিনটি গুণ পরিষ্কারভাবে পরিস্ফুটিত হয় :

১. কঠিন সমস্যায় সূক্ষ্ম উপস্থিত বুদ্ধি।

২. যে কোনো পরিস্থিতিকে দ্রুত অনুধাবন।

৩. সীমাহীন গোপনীয়তা রক্ষা করার দুর্লভ গুণ।

সাহাবীদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, যে সাহাবী যে ধরনের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন, তাকে সেই ধরনের দায়িত্ব অর্পণ করতেন।

মদীনায় মুসলমানগণ ইহুদী ও তাদের অনুচরদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে পড়েন। মুসলমানদের ছদ্মাবরণে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবীদের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে মুনাফিকদের নাম ধরে ধরে পরিচয় করিয়ে দেন। এটা ছিল এমন একটি গোপন বিষয়, যা অন্য সাহাবীরা জানতেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুনাফিকদের গতিবিধি

সম্পর্কে তাঁকে সতর্ক দৃষ্টি রাখার দায়িত্ব দেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে তাদের গোপন ষড়যন্ত্র এবং ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেন। যথাসময়ে যেন তার প্রতিকার করা সম্ভব হয়। সাহাবীগণ এ জন্য হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোপন তথ্যের সংরক্ষণাগার বলে ডাকতেন। ইসলামের স্বার্থে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ, গুরুত্বপূর্ণ এবং বিপজ্জনক খিদমতের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর উপস্থিত বুদ্ধি, তীক্ষ্ণ মেধা ও আনুগত্যকে কাজে লাগিয়েছেন। বিশেষ করে খন্দক যুদ্ধের চরম মুহূর্তে যখন মুসলিম বাহিনী সামনে ও পেছনে উভয় দিক থেকে শত্রুবাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ ছিলেন। দীর্ঘ দিনের এ অবরোধের কারণে পরিস্থিতি প্রতিনিয়ত অবনতির দিকে যাচ্ছিল। তখন এই কঠিন পরীক্ষায় মুসলমানদের ধৈর্য ও ত্যাগের সীমা অতিক্রম হতে যাচ্ছিল। প্রতিটি মুহূর্তেই বিপদ আপতিত হওয়ার ও হতাশায় আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। এমনকি দুর্বল ঈমানের মুসলমানগণ আল্লাহর সাহায্যের ব্যাপারে নানা মন্তব্য পর্যন্ত করতে শুরু করে। তখন হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন দৃঢ় ঈমানী প্রত্যয়ে প্রত্যয়ী। অন্যদিকে কুরাইশ ও তার সহযোগী বাহিনীদের অবস্থাও মুসলিম বাহিনীর চেয়ে কোনোক্রমেই ভালো ছিল না। তাদের এ দুরবস্থার সময় আল্লাহ তাদের উপর এমন এক গযব নাযিল করেন, যা তাদের মনোবলকে আরও দুর্বল করে দেয়। বিজয়ের আশা দুরাশায় পরিণত হয়। আল্লাহ তাআলা তাদের ঝড়ো হাওয়া দ্বারা বিপর্যস্ত করেন। কুরাইশদের তাঁবুসমূহ লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। বাসনপত্রের এক একটি নানাদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে। অনেকগুলো প্রবল বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে যায়। তাদের মুখমণ্ডল ধূলিতে আচ্ছাদিত হয়। চোখে ও নাকে-মুখে বালির কণা ঢুকে পড়ে। এই চরম প্রতিকূল ও বিপদসংকুল পরিবেশে তাদের ভাগ্যে পরাজয়কেই ত্বরান্বিত করে। তারা সর্বপ্রথম নিজেদের দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। তারা বিশ্বাসী ছিল যে, বিজয় তাদের অনিবার্য। কারণ, আনুগত্যে, নিয়মানুবর্তিতায়, শৃঙ্খলায় ও ত্যাগ স্বীকারে সদা প্রস্তুত ছিল তারা। কিন্তু এসব দ্বারা আল্লাহর গযব থেকে রক্ষা পাওয়া গেল না। ঠিক সেই মুহূর্তে যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল। বিজয় ছিনিয়ে আনার জন্য গুপ্তচরের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের গোপনীয়তা ও দুর্বল অবস্থা উদ্‌ঘাটন করে সেখানে আঘাত করাই

ছিল এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য হুযাইফা ইবনে আল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমার মতো গুপ্তচরের তীব্র প্রয়োজন দেখা দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে কুরাইশ সেনাপতির গতিবিধি ও শত্রুবাহিনীর প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য রাতের গভীর অন্ধকারে শত্রুবাহিনীর অভ্যন্তরে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন, যাতে শত্রু বাহিনীর ওপর আঘাত হানার আগে তাদের সঠিক অবস্থা জানতে পারেন।

এ মুহূর্তে আমরা হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নির্ঘাত মৃত্যুর মুখে যাওয়ার ঘটনাটি তাঁর নিজ বর্ণনা থেকেই তুলে ধরছি।

হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন :

> 'আমরা সেই ঝড়ের রাতে সারিবদ্ধ হয়ে চৌকসভাবে বসেছিলাম। আবূ সুফিয়ান এবং তার সহযোগী মিত্র বাহিনীর যোদ্ধারা আমাদের সামনে এবং বনূ কুরাইযার ইহুদী সম্প্রদায়ের যোদ্ধারা আমাদের পেছনে অবস্থান নিয়েছিল। আমরা তাদের পক্ষ থেকে আমাদের সন্তান ও মহিলাদের ওপর আক্রমণের আশঙ্কা করছিলাম। এ রাতের মতো এমন ভয়াবহ অন্ধকার ও ভীষণ ঝড়-তুফানের রাত আমরা জীবনে আর কখনো দেখিনি। দমকা হাওয়ার শব্দ ছিল কড়কড় বজ্রধ্বনির মতো। আর এর ভয়াবহ অন্ধকার ছিল এমন যে, আমরা কেউ আমাদের হাতের আঙুল পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমাদের মধ্যে অবস্থানরত মুনাফিকরা বিভিন্ন বাহানায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে এই বলে অনুমতি নিচ্ছিল যে, আমাদের বাড়িঘর অরক্ষিত, তাই আমাদের নিজ নিজ ঘরে ফিরে যাওয়া জরুরি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে যুদ্ধ-ময়দান ছেড়ে যেতে অনুমতি দেন। মুনাফিকদের মধ্যে যারাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে চলে যাওয়ার অনুমতি চেয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সবাইকে চলে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। এভাবে বিভিন্ন অজুহাতে যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে যেতে যেতে শেষ পর্যন্ত আমরা মাত্র ৩০০ (তিন শত) জন বা এর কিছু বেশি সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ময়দানে

অবশিষ্ট ছিলাম।' মুনাফিকদের যুদ্ধের ময়দান থেকে চলে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক এক করে আমাদের সবারই অবস্থান পর্যবেক্ষণ করার জন্য বের হন এবং আমার কাছে এসে পৌঁছেন। শীতবস্ত্র হিসেবে আমার পরিধানে ছিল আমার স্ত্রীর ওড়না বা চাদর, যা দ্বারা কোনোক্রমে আমার হাঁটুর নিচ পর্যন্ত ঢাকা হয়েছিল। তাছাড়া আর কিছু ছিল না। এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার একেবারে কাছে এগিয়ে এলেন। আমি তখন হাঁটু গেড়ে বসেছিলাম।

তিনি বললেন :

'তুমি কে?'

আমি বললাম :

'হুযাইফা।'

তিনি বললেন :

'হুযাইফ?'

তখন আমি ভীষণ ঠাণ্ডা ও ক্ষুধায় কাতর হয়ে মাটির সাথে মিশে যাচ্ছিলাম।

আমি বললাম :

'হে আল্লাহর রাসূল, আমি হুয়াইফা ইবনে আল ইয়ামান।'

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কানে কানে বললেন :

'শত্রুবাহিনীর অবস্থান জানা একান্ত দরকার, শত্রুবাহিনীর ভিতর ঢুকে পড় এবং তাদের অবস্থান সম্পর্কে আমাকে অবহিত কর। এ রাতে আমি সবচেয়ে শীত, ক্ষুধায় ও ভীতিতে আক্রান্ত হয়েছিলাম।'

আমার এই অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জন্য এই দোআ করলেন :

اَللّٰهُمَّ احْفَظْهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ عَنْ يَمِيْنِهٖ وَعَنْ شِمَالِهٖ وَمِنْ فَوْقِهٖ وَمِنْ تَحْتِهٖ ـ

'হে আল্লাহ! হুযাইফাকে তাঁর সামনে, পেছনে, ডানে, বামে এবং উপর-নিচের যাবতীয় বিপদ-মুসীবত থেকে রক্ষা করো।'

'আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আ শেষ হতে না হতেই আল্লাহ আমার মন থেকে সর্বপ্রকার ভয়-ভীতি ও শরীর থেকে শীতের আড়ষ্টতা দূর করে দিলেন।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুম পালনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডেকে বললেন :

'হুযাইফা! খবরদার শত্রুবাহিনীর মধ্যে কিছু করো না, শুধু তাদের তথ্য এনে আমাকে দেবে।'

উত্তরে বললাম :

'জী হ্যাঁ! এই বলে রাতের অন্ধকারে নির্ঘাত মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে শত্রু বাহিনীর মধ্যে সংগোপনে ঢুকে পড়লাম। কিছু দূর অগ্রসর হয়েই দেখি, কুরাইশ সেনাপতি আবূ সুফিয়ান তার সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছে। সে বলছে :

'কুরাইশদের আমি এ মর্মে সতর্ক করে দিচ্ছি যে, আমরা আশঙ্কা করছি, মুহাম্মদের অনুচররা আমাদের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারে। তাই প্রত্যেকেই যেন তার পার্শ্ববর্তী সাথীর প্রতি লক্ষ্য রাখে।'

আমি তৎক্ষণাৎ আমার পাশের ব্যক্তির হাত ধরে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার নাম কী?

সে উত্তর দিল আমি অমুকের পুত্র অমুক।'

অতঃপর আবূ সুফিয়ান তার বক্তৃতা অব্যাহত রেখে বলল :

'কুরাইশ ভাইয়েরা! আল্লাহর শপথ! আপনারা নিশ্চয়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। আমাদের উট-ঘোড়াগুলো ঝড়ের কারণে মারা গেছে। আমাদের সহযোগী ইহুদী সম্প্রদায় বনূ কুরাইযা তাদের কৃত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। আমরা প্রচণ্ড শীতে ও তুফানে আক্রান্ত হয়ে পড়েছি। আপনারা এর প্রত্যক্ষ সাক্ষী।'

অতঃপর বলল :

'অতএব যার যা অবশিষ্ট আছে, তাই নিয়ে চলুন আমরা মক্কায় ফিরে যাই। এই বলে সে তার উটের কাছে গিয়ে উটের রশি খুলে তার পিঠে উঠে বসল এবং চাবুক হাঁকিয়ে মক্কার পথে রওয়ানা হলো।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি আমাকে কোনো কিছু করা থেকে বিরত না রাখতেন বা শুধু তথ্য সংগ্রহের জন্য না পাঠাতেন, তাহলে এ সুযোগে আমি আবূ সুফিয়ানকে অবশ্যই হত্যা করতাম। এরপর আমি সেখান থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফিরে এলাম। এ সময় তিনি তাঁর কোনো এক স্ত্রীর চাদর গায়ে জড়িয়ে নামায আদায় করছিলেন। আমাকে দেখে তিনি কাছে ডেকে নিলেন এবং চাদরের একটা অংশ দিয়ে আমাকে আবৃত করলেন। আমি তাঁকে আমার রিপোর্ট পেশ করলে তিনি খুবই আনন্দিত হলেন এবং আল্লাহর প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায় করলেন।

হুযাইফা ইবনে আল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা সারা জীবনই মুনাফিকদের চরিত্র ও পরিচয় নিজের জন্য আমানত রেখে অতিবাহিত করতেন। খলীফাগণ মুনাফিকদের সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য তাঁর কাছ থেকে জেনে নিতেন। এমনকি উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর অবস্থা ছিল এই যে, কোনো মুসলমান মারা গেলে হুযাইফা ইবনে আল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা তার জানাযায় উপস্থিত হয়েছেন কি না তা জিজ্ঞাসা করতেন। যদি উত্তর পেতেন যে, হ্যাঁ তিনি জানাযায় উপস্থিত হয়েছেন, তবেই তিনি জানাযায় ইমামতি করতেন। আর যদি না-সূচক উত্তর পেতেন, তাহলে তাকে মুনাফিক হিসেবে সন্দেহ করতেন এবং তার জানাযার নামায থেকে সরে দাঁড়াতেন। একবার উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হুযাইফা ইবনে আল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমাকে জিজ্ঞাসা করেন :

'তার গভর্নরদের মধ্যে কোনো মুনাফিক আছে কি না?'

তিনি বললেন :

'হ্যাঁ, একজন আছে।'

উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন :

'সে কে তা দেখিয়ে দাও।'

হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উত্তর দিলেন :

'না, আমি তা করতে পারি না।'

হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, অল্প দিনের মধ্যেই উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাকে অপসারণ করেন, যেন সেই মুনাফিকের ব্যাপারে তিনি ইঙ্গিত লাভ করেছেন। সম্ভবত খুব স্বল্পসংখ্যক মুসলমানই একথা জানেন যে, সেনাপতি হিসেবে হুযাইফা ইবনে আল ইয়ামানই মুসলমানদের জন্য নাহাওয়ান্দ, দাইনাওয়ার, হামাদান এবং রাই শহর বিজয় করেছিলেন। বিজিত শহরগুলোতে আল্লাহর কিতাব আল কুরআন তিলাওয়াতের উচ্চারণের ব্যাপারে মুসলমানরা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করে শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার পর তিনিই আবার তাদেরকে একই তিলাওয়াতের ব্যাপারে ঐকমত্যে আনেন। বহু গুণে গুণান্বিত হওয়া সত্ত্বেও নিজের ব্যাপারে চরম খোদাভীতিই ছিল হুযাইফা ইবনে আল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমার প্রকৃত গুণ। মৃত্যুশয্যায় রোগ প্রচণ্ড আকার ধারণ করলে রাতের বেলায়ই সাহাবীরা তাঁর কাছে এলে তিনি জিজ্ঞাসা করেন :

'এটা কোন্ সময়?'

সবাই বললেন :

'একটু পরেই রাত পোহাবে।'

তিনি বললেন :

'এমন সকাল থেকে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই, যা আমাকে দোযখের দিকে নিয়ে যেতে পারে।'

অতঃপর জিজ্ঞাসা করলেন :

'আপনারা কি আমার জন্য কাফন এনেছেন?'

তারা বললেন :

'হ্যাঁ।'

তিনি বললেন :

'অধিক মূল্যবান কাফন দেবেন না। কারণ, আল্লাহর কাছে যদি আমি পুরস্কৃত হই, তাহলে এই কাফন পরিবর্তন করে উত্তম পোশাক পরিয়ে দেওয়া হবে। আর যদি বিপরীত অবস্থা হয়, তাহলে এটা আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে।'

অতঃপর বলতে থাকলেন :

اَللّٰهُمَّ إِنَّك تَعْلَمُ أَنِّيْ كُنْتُ أُحِبُّ الفَقْرَ عَلَى الْغِنٰى وَأُحِبُّ الذِّلَّةَ عَلَى الْعِزِّ وأُحِبُّ الْمَوْتَ عَلَى الْحَيَاةِ ـ

'হে আল্লাহ! তুমি জানো, আমি দারিদ্র্যকে প্রাচুর্যের উপর প্রাধান্য দিয়েছি। নম্রতাকে কঠোরতার চেয়ে এবং মৃত্যুকে জীবনের চেয়ে ভালোবেসেছি।'

তারপর তিনি জীবনের শেষ মনভরা আশা নিয়ে দু'আ করেন :

حَبِيْبٌ جَاءَ عَلَى شَوْقٍ، لا أَفْلَحَ مِنْ نَدِمٍ ـ

'হে আল্লাহ! তোমার বন্ধু সাক্ষাতের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তোমার দ্বারে হাজির, কিন্তু ত্রুটি-বিচ্যুতিতে জাহান্নামের ভয়ে একান্তই লজ্জিত।'

হুযাইফা ইবনে আল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা একজন ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। আমীন!

---

হুযাইফা ইবনে আল ইয়ামান (রা) সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সহায়ক গ্রন্থাবলি :


১. আল ইসতিয়াব : ১ম খণ্ড, ২৭৬ পৃ.।
২. আল ইসাবাহ : ১ম খণ্ড, ৩১৭ পৃ.।
৩. আত তাবাকাতুল কুবরা : ১ম খণ্ড, ২৫ পৃ.।
৪. সিয়া আলামুন নুবালা : ২য় খণ্ড, ২৬০ পৃ.।
৫. তাহযীবুত তাহযীব : ২য় খণ্ড, ২১৯ পৃ.।
৬. সিফাতুস সাফাওয়াহ : ১ম খণ্ড, ২৪৯ পৃ.।
৭, উসদুল গাবাহ : ১ম খণ্ড, ২৯০ পৃ.।
৮. তারীখুল ইসলাম : ২য় খণ্ড, ১৫২ পৃ.।
৯. আল মাআরিফ : ১১৪ পৃ.।
১০. আন নুজুমুয যাহিরাহ : ১ম খণ্ড, ৭৬, ৮৫, ও ১০২ পৃ.।

# উক্‌বা ইবনে আমের আল জুহানী (রা)

*আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁরাও আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন।*

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটল। মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার প্রবেশ-দ্বারে এসে পৌঁছলেন। উৎসুক মদীনাবাসী প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথী আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে এক নজর দেখার জন্য ব্যাকুল। তারা ঘরের ছাদে ও উঁচু জায়গায় ভীড় জমিয়ে 'আল্লাহু আকবার' তাকবীরধ্বনির মাধ্যমে মদীনার আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তোলে। তাঁকে এক নজর দেখে চক্ষুদ্বয়কে শীতল করার জন্য রাস্তায় বের হয়ে পড়ে।

মদীনার ছোট ছোট শিশুরা দফ্ হাতে আনন্দের গান গেয়ে গেয়ে নবীজীকে এ ভাষায় অভ্যর্থনা জানাতে থাকে :

أَقْبَلَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا

مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوِدَاعْ

وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا

مَادَعَا لِلّٰهِ دَاعْ ـ

'পূর্ণিমার চাঁদ সানিয়াতুল বিদা থেকে উদিত হয়ে আমাদের মাঝে আগমন করেছেন। আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী যতদিন আহ্বান জানাবেন, ততদিন তাঁর আগমনের জন্য আমাদের শোকরগুযারী করা একান্ত কর্তব্য।'

রাস্তার দু'ধারে উৎসুক নারী-পুরুষ ও শিশুরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর কাফেলা ধীরে ধীরে মদীনায় প্রবেশ করছেন। তাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক নজর দেখে অনেকের আনন্দের অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ছে। ব্যাকুল মন শান্ত ও পরিতৃপ্ত হচ্ছে।

কিন্তু উক্‌বা ইবনে আমের আল জুহানী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাফেলাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য উৎসুক জনতার সঙ্গে যোগ দিতে পারেননি। কারণ, তিনি তাঁর বকরি পালের তত্ত্বাবধানে মদীনা থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছিলেন। ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় বকরিগুলো যাতে কষ্ট না পায় এ জন্য তিনি সেখানে এ দায়িত্ব পালন করছিলেন। হ্যাঁ, মদীনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনে আনন্দ ও খুশির জোয়ার আসে প্রতিটি ঘরে ঘরে। মদীনার শহর-সীমানা অতিক্রম করে দূর-দূরান্তের বেদুইন তাঁবুগুলোতেও সেই আনন্দ-উৎসবের ঢেউ লাগে। এ আনন্দের বার্তা উক্‌বা ইবনে আমের আল জুহানী পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে।

উক্‌বা ইবনে আমের আল জুহানী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কিভাবে সাক্ষাৎ করেন, সেই সাক্ষাতের কাহিনী তাঁর কাছ থেকেই শুনুন।

তিনি বর্ণনা করেন :

> 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন আমি আমার বকরির পাল চরাতে মদীনা থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছিলাম। সেখানেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদীনায় পৌঁছার সংবাদ পাই। এই শুভ সংবাদ পেয়েই আমি সেখানে বকরির পাল রেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে দেখা করার জন্য রওয়ানা হই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমার বাইআত গ্রহণ করবেন?

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : 'তুমি কে?'

আমি উত্তর দিলাম : উক্‌বা ইবনে আমের আল জুহানী।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

> 'বাইআত দুই ধরনের। যেমন, বেদুইনদের থেকে বাইআত নেওয়া। এটা স্বাভাবিক বাইআত এবং অপরটি হচ্ছে হিজরতের বাইআত। তোমার জন্য কোন্‌টি গ্রহণ করব?'

আমি বললাম, বরং হিজরতের বাইআত গ্রহণ করুন!

অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার থেকে মুহাজিরদের কৃত বাইআতের মতো বাইআত গ্রহণ করলেন। সেখানে এক রাত কাটিয়ে আমি আমার বকরি পালের জায়গায় ফিরে এলাম।

আমরা এক সঙ্গে বারো জন মদীনা শহর থেকে অনেক দূরে মরু এলাকায় বকরি চরাতাম। আমরা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করি। আমরা পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করলাম :

'আমরা যদি ইসলামের বিধি-বিধান শিক্ষার উদ্দেশ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত না হই, তবে আমাদের কোনো কল্যাণ নেই।'

অতএব, আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে, প্রতিদিন আমাদের একজন করে মদীনায় যাবে। তার বকরির পাল আমাদের কাছে থাকবে। এভাবে পালাক্রমে আমরা প্রত্যেকেই মদীনায় যাব। আমি বকরি পালনে বেশি আন্তরিক ছিলাম। তাই এ ব্যাপারে অন্যের ওপর আমার আস্থা ছিল না বিধায় তাদেরকে বললাম :

ঠিক আছে, আমিই তোমাদের প্রত্যেকের বকরির পালের দায়িত্ব নিলাম। তোমরা পালাক্রমে একজন করে প্রতিদিনই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হও।

এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিদিন খুব ভোরে একজন করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে রওয়ানা হতো। আমি থাকতাম তার বকরির পাল দেখাশোনার দায়িত্বে। সে ফিরে এসে তার বকরির পাল ফেরৎ নিত এবং যা যা শিখে আসত তা আমার কাছে বলতো। তার থেকে আমি ঐসব শিখে নিতাম।

কিন্তু এ পদ্ধতিতে জ্ঞানার্জনে পরিতৃপ্ত হতে পারলাম না। ইসলামী জ্ঞানার্জনের সরাসরি পথই আমি গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়ে পড়লাম। দুনিয়ার মোহমুক্তির পথ তালাশ করতে লাগলাম। ভাবলাম, বকরির পাল চরানো দ্বারা আমি বিত্তবানও হব না, দুনিয়ার মোহে থাকলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চিনতে ও জানতেও পারব না। আমি কুরআনের শিক্ষা সরাসরি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে গ্রহণ না করে তো ভুল করছি। এ ভুল তো করা উচিত হচ্ছে না।

এসব চিন্তা-ভাবনা করে বকরি পালনের দায়-দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ালাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদে নববীতে আসহাবে সুফফার সাথে অবস্থানের সিদ্ধান্ত নিয়ে মদীনায় চলে আসলাম।

উক্‌বা ইবনে আমের আল জুহানী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়েননি বা বিচলিত ভাবও দেখাননি। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি কাজ শুরু করে দেন।

এ ছিল প্রত্যেকের কাছেই কল্পনাতীত ব্যাপার যে, তিনি মাত্র দশ বছরের মধ্যেই আলিম সাহাবীদের মধ্যে ইলমুল কিরাআতের শীর্ষস্থানীয় ইমাম হবেন। ইসলামের বিজয়ে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধসমূহের সেনাপতির দায়িত্ব পালন করবেন এবং হাতেগোনা মাত্র কয়েকজন খ্যাতি অর্জনকারী গভর্নরের অন্যতম হিসেবে ইসলামের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তিনিই কি এমন ধারণা করতে পেরেছিলেন যে, তিনি তাঁর বকরি পালের দায়িত্ব ছেড়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে এমন যোগ্যতা অর্জন করতে পারবেন, যে যোগ্যতা তাঁকে ইসলামী বাহিনীর সেনাপতি পদে উন্নীত করবে? যে দামেশ্‌ককে সেকালে দুনিয়ার সভ্যতা-সংস্কৃতির 'মা' বলা হতো সেই দামেশ্‌কের বিজয়ী হবেন, এ কথা কি তিনি ভাবতে পেরেছিলেন? দামেশ্‌কের প্রবেশপথে 'তুমা' নামক স্থানে মনোরম বাগানে তাঁর আলীশান বাসগৃহ তৈরি করা হবে এবং প্রাচীন সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র মিসর বিজয়ী সেনা-কর্মকর্তাদের অন্যতম সেনা-কর্মকর্তা হবেন এবং পরবর্তী সময়ে মিসরের গভর্নরের পদ অলংকৃত করবেন। প্রসিদ্ধ 'আল মুকাত্তাম' পাহাড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যময় চূড়ার পাদদেশে নিজের জন্য বাড়ি তৈরি করবেন। এ সবই ছিল পর্দার আড়ালে লুক্কায়িত তাঁর সৌভাগ্যের লিখন, যা একমাত্র আল্লাহই জ্ঞাত ছিলেন।

হ্যাঁ, উক্‌বা ইবনে আমের আল জুহানী রাদিয়াল্লাহু তাআল্লা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অত্যন্ত নিবিড় সাহচর্য লাভ করেন। তিনি সারাক্ষণই যেন ছায়ার মতো তাঁর সাথে লেগে থাকতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে যেতেন, তিনিও সেখানেই যেতেন এবং ঘোড়ার লাগাম ধরে থাকতেন। অধিকাংশ সময়ই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের ঘোড়াটির পিছনে বসিয়ে নিতেন। এত অধিকবার তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে একই ঘোড়ায় আরোহণ করেছেন যে,

তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে ঘোড়ায় আরোহণকারী হিসেবেই খ্যাতি লাভ করেন। এমনকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো তাঁর ঘোড়া থেকে নেমে হেঁটে চলেছেন আর তাকে ঘোড়ার পিঠেই অবস্থান নিতে বলেছেন। উক্‌বা ইবনে আমের আল জুহানী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেন :

মদীনার কোনো এক বাগানে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়েছিলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন :

হে উক্‌বা! তুমি কি ঘোড়ায় উঠবে না?

আমি না-সূচক উত্তর দিতে মনস্থ করে আবার ভাবলাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাঁর ঘোড়ায় চড়তে বলেছেন, আর আমি যদি তাঁর নির্দেশ অমান্য করি, তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে বেয়াদবী হবে এবং এতে গোনাহ হবে– এই আশঙ্কায় বললাম :

ইয়া রাসূলাল্লাহ আমি উঠছি।

অতঃপর তিনি ঘোড়ার লাগাম ধরে হেঁটে চললেন আর আমি তাঁর নির্দেশ পালনার্থে ঘোড়ায় চড়ে যেতে লাগলাম। কিছু দূর যেতে না যেতেই আমি ঘোড়া থেকে নেমে পড়লাম এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করতে অনুরোধ জানালাম। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন :

'উক্‌বা! তোমাকে আজ এমন দুটি সূরা শিক্ষা দেব, যা নিঃসন্দেহে অন্য যে কোনো সূরার গুরুত্বের চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।'

আমি আরয করলাম : নিশ্চয়ই ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি তা শিখব।

অতঃপর তিনি আমাকে সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করে শোনালেন। নামাযের সময় হলে তিনি ইমামতি করার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন এবং এ দুটি সূরা দিয়েই নামায আদায় করলেন। নামাযশেষে বললেন :

'যখনই ঘুমাতে যাবে কিংবা ঘুম থেকে জাগ্রত হবে, তখনই এ সূরা দুটি পাঠ করবে।'

উক্‌বা ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু তাআল্লা আনহু বলেন :

'আমি যতদিন জীবিত থাকব, ততদিনই এ দুটি সূরা পাঠ অব্যাহত রাখব।'

উক্‌বা ইবনে আমের আল জুহানী রাদিয়াল্লাহু তাআল্লা আনহু সারা জীবন দুটি বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে তৎপর ছিলেন। তন্মধ্যে একটি হলো ইলম শিক্ষা করা ও অপরটি জিহাদে অংশগ্রহণ করা। নিজের জীবনের চেয়েও এ দুটি বিষয়ের প্রতি খুব বেশি গুরুত্ব দিতেন, এমনকি এ জন্য তিনি আর্থিক কুরবানীও করেন।

বিদ্যাচর্চা বা জ্ঞানার্জনে স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যবান মুবারক থেকেই নিয়মিত কুরআন মাজীদের হিফ্য ও এর শিক্ষা গ্রহণ করতেন। ফলে তিনি জগদ্বিখ্যাত কারী, ওয়ায়েয, মুহাদ্দিস, ফকীহ, ফারায়েয বিশেষজ্ঞ, সাহিত্যিক ও কবি হিসেবে সর্বজনগ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল অত্যন্ত মধুর। মধুর কণ্ঠে তিনি যখন কুরআন তিলাওয়াত করতেন, তখন শ্রোতারা তন্ময় হয়ে তিলাওয়াত শুনতেন। তিনি রাতের গভীরে কুরআন তিলাওয়াত করতেন বেশি। কুরআনের আয়াতে বায়্যিনাতসমূহ বেশি বেশি পাঠ করতেন। সাহাবীগণ প্রাণভরে তাঁর তিলাওয়াত শ্রবণ করে নিজেদের অন্তরকে পরিতৃপ্ত করতেন। এমনও হতো যে, তাঁর তিলাওয়াতের মাঝে সবাই আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে পড়তেন। তাদের দু'চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ত। একদিন উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁকে ডেকে নিয়ে বললেন :

'উক্‌বা আমাকে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করে শোনাও।'

উক্‌বা ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন :

অবশ্যই হে খালীফাতুল মুসলিমীন।

অতঃপর তিনি তিলাওয়াত শুরু করলেন। তিলাওয়াত শুনতে শুনতে উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এমনভাবে ক্রন্দন করতে থাকলেন যে, তাঁর চোখের পানি দু'গাল বেয়ে তাঁর দাড়ি মুবারক পর্যন্ত ভিজিয়ে দিল।

উক্‌বা ইবনে আমের আল জুহানী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু স্বহস্তে লিখিত একখানা কুরআন মাজীদ রেখে যান, যে কুরআন মাজীদখানা মাত্র কয়েক শ' বছর পূর্বেও মিসরের 'উক্‌বা ইবনে আমের জামে মসজিদের' লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত ছিল। যার শেষে লিখা ছিল :

"كَتَبَهُ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرْ اَلْجُهَنِى"

'এটি উক্‌বা ইবনে আমের আল জুহানীর স্বহস্তে লিখিত।'

উক্‌বা ইবনে আমের আল জুহানী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কর্তৃক লিখিত কুরআন পৃথিবীতে সবচেয়ে প্রাচীন হাতে লেখা কুরআন শরীফ। ইসলামী বিশ্বের নষ্ট হয়ে যাওয়া অনেক দুর্লভ ও মূল্যবান বই সম্পদের মতো এই কুরআন শরীফখানাও সেখান থেকে হারিয়ে যায়, আর মুসলিম সমাজের এই মূল্যবান সম্পদের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

জিহাদের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান হলো– তিনি উহুদের যুদ্ধ থেকে শুরু করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে সংঘটিত সব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি দুর্ধর্ষ, দুঃসাহসী, তেজস্বী ও শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাদের অন্যতম ছিলেন। দামেশ্‌ক বিজয়ের দিন তাঁকে জীবনের কঠিনতম পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। এ কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন মুসলিম বিশ্বের সেনাপতি আবূ উবায়দা ইবনে জাররাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পক্ষ থেকে। সেটাও এইভাবে যে, দামেশ্‌ক বিজয়ের সুসংবাদ নিয়ে খালীফাতুল মুসলিমীন উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খিদমতে উপস্থিত হওয়ার জন্য তাঁকে দামেশ্‌ক থেকে মদীনার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়। তিনি এ সংবাদ বহন করে এক শুক্রবার থেকে অন্য শুক্রবার পর্যন্ত রাত-দিন ক্রমাগত আট দিন ও সাত রাত কোনোরূপ বিশ্রাম বা বিরতি না রেখে এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে এই বিরাট বিজয়ের খবর পৌছান।

মিসর বিজয়ের যুদ্ধে তিনি মুসলিম বাহিনীর একাংশের সেনাপতি ছিলেন। আমীরুল মু'মিনীন মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে সেখানে ক্রমাগত তিন বছর গভর্নর পদে বহাল রাখেন। অতঃপর ভূমধ্যসাগরের 'রুড্‌স' দ্বীপ বিজয়ের উদ্দেশ্যে উক্‌বা ইবনে আমের আল জুহানী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে প্রেরণ করেন। জিহাদ সম্পর্কিত হাদীসসমূহের দ্বারা তাঁর অন্তর পরিপূর্ণ ছিল। যা তিনি বিশেষভাবে মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বর্ণনা করেন। তিনি যুগশ্রেষ্ঠ তীরন্দায ছিলেন, এমনকি তিনি একটু অবসর সময় কাটাতে চাইলে তীরন্দাযী বা তীর চালনার মাধ্যমে কাটাতেন।

মিসরে অবস্থানকালে উক্‌বা ইবনে আমের আল জুহানী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইন্‌তিকালের পূর্ব মুহূর্তে তাঁর সন্তানদের ডেকে ওসিয়ত করেন :

يَابُنَيَّ أَنْهَاكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ فَاحْتَفِظُوْا بِهِنَّ : لَا تَقْبَلُوْا الْحَدِيْثَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِلَّا مِنْ ثِقَةٍ وَلَا تَسْتَدِيْنُوْا وَلَوْ لَبِسْتُمُ الْعَبَاءَ وَلَا تَكْتُبُوْا شِعْرًا فَتَشْغَلُوْا بِهٖ قُلُوْبَكُمْ عَنِ الْقُرْاٰنِ ـ

'হে বৎসগণ! তিনটি কাজ করা থেকে তোমাদের নিষেধ করছি। তোমরা এ তিনটি বিষয় ভালোভাবে স্মরণ রাখবে :

১. বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী বা 'ছেকাহ' রাবী ছাড়া অনির্ভরযোগ্য কোনো ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করলে তা কখনও গ্রহণ করবে না।

২. কোনো অবস্থাতেই ঋণ গ্রহণ করবে না; যদিও বা অভাবের তাড়নায় ছেঁড়া চাদর পরিধান করতে হয়।

৩. এবং কখনো কবিতা চর্চায় নিমগ্ন হয়ো না, কারণ কবিতা চর্চা তোমাদের অন্তরকে কুরআনের চর্চা থেকে ফিরিয়ে রাখবে।'

তাঁর ইনতিকাল হলে তাঁকে কায়রোর প্রবেশপথের উঁচু টিলার পাদদেশে দাফন করা হয়। দাফন শেষ হলে বাড়ি ফিরে এসে তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তির হিসাব করা হলে দেখা যায় যে, সম্পদ হিসেবে একাত্তর বা তিয়াত্তরটি ধনুক এবং প্রত্যেকটি ধনুকের সাথেই তীর চালানোর সাজ-সরঞ্জাম এবং এসব জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর কাজে ব্যবহার করার জন্য ওসিয়তনামা।

বিশ্বখ্যাত ক্বারী এবং গাযী মুজাহিদ উক্‌বা ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর চেহারা মুবারককে আল্লাহ নূরের আলোয় আলোকিত করুন এবং ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষ থেকে তাঁকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন। আমীন!

---

উক্‌বা ইবনে আমের আল জুহানী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য সহায়ক গ্রন্থাবলি :

১. আল ইসতিয়াব : ৩য় খণ্ড, ১০৬ পৃ.।
২. উসদুল গাবাহ : ৩য় খণ্ড, ৪১৭ পৃ.।
৩. আল ইসাবাহ : ২য় খণ্ড, ৪৮২ পৃ.।
৪. সিয়ারু ইলামুন নুবালা : ২য় খণ্ড, ৩৩৪ পৃ.।
৫. জামহারাতুল আনসাব : ৪১৬ পৃ.।
৬. আল মাআরিফ : ১২১ পৃ.।
৭. কালাইদুল জুমান : ৪১ পৃ.।
৮. আন নুজুমুয্ যাহেরাহ : ১ম খণ্ড, ১৯/২১/৬২/৮১ পৃ.।
৯. তাবাকাত উলামাউ আফ্রিকীয়াহ এবং তিউনিস : ৭০-৮৫ পৃ.।
১০. ফাতহুল মিস্‌রে ওয়া আখবারুহা : ২৮৭ পৃ.।
১১. তাহযীবুত্ তাহযীব : ৭ম খণ্ড, ২৪২ পৃ.।
১২. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায : ১ম খণ্ড, ৪২ পৃ.।

# হাবীব ইবনে যায়েদ (রা)

*হাবীব ইবনে যায়েদ আল আনসারী (রা) ও তাঁর আহলে বাইতের প্রতি রাসূলুল্লাহ (স)-এর দু'আ।*

*'আমার আহলে বাইতের পক্ষ থেকে আল্লাহ তোমাদের প্রতি রহমত ও বরকত দান করুন।' –মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)*

হাবীব ইবনে যায়েদ আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্ধারিত জীবনধারার অমোঘ নিয়মে এমন এক পরিবারে প্রতিপালিত হচ্ছিলেন, যে পরিবারের প্রত্যেক সদস্যই যেমন ছিলেন ঈমানী চেতনায় বলীয়ান, তেমনি এ বিপ্লবী দাওয়াত ছড়িয়ে দিতেও তাঁদের ভূমিকা ছিল অতুলনীয়। এ পরিবারের প্রতিটি সদস্য দীনের দাবি পূরণে যে ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সীমাহীন কুরবানীর অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, তা জনপদের প্রত্যেককে ঈমানী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করত।

তাঁর পিতা যায়েদ ইবনে আসেম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা ইয়াসরিবের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব এবং বায়'আত আল আকাবায় অংশ গ্রহণকারী ৭০ সাহাবীর অন্যতম ছিলেন। সে অনুষ্ঠানে তিনি দুই ছেলেসহ সস্ত্রীক বায়'আত করার গৌরবে গৌরবান্বিত হন। তাঁর মা উম্মু আম্মারা নুসায়বাতুল মাযনিয়াহ ইসলামের ইতিহাসে সেই প্রথম মহিলা, যিনি আল্লাহর দীনের হেফাযত ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিরক্ষায় হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিলেন। তাঁর ভাই আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা

উহুদের যুদ্ধে নিজের বক্ষকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হেফাযতের জন্য ঢালস্বরূপ ব্যবহার করেন। তিনি শত্রুপক্ষের অসংখ্য তীর-বর্শার আঘাত থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রক্ষা করার গৌরবে গৌরবান্বিত সাহাবী। তাঁর স্বীকৃতিস্বরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য এ দু'আ করেন–

بَارَكَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اَهْلِ بَيْتٍ
رَحِمَكُمُ اللّٰهُ مِنْ اَهْلِ بَيْتٍ ـ

'আমার আহলে বাইতের পক্ষ থেকে আল্লাহ তোমাদের প্রতি রহমত ও বরকত দান করুন।'

শিশুকালেই নিষ্পাপ হাবীব ইবনে যায়েদের অন্তর ঈমানের আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। মা-বাবা, খালা ও ভাইয়ের সাথে মক্কাগামী ইতিহাসখ্যাত সেই সত্তর জন সাহাবীর কাফেলায় যোগদানের সৌভাগ্যও তাঁর হয়েছিল। গভীর রাতের অন্ধকারে অনুষ্ঠিত বায়'আতে আকাবায় শিশু হাবীবও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে কোমল দু' হাত রেখে বায়'আত গ্রহণ করেন এবং সেদিন থেকে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর পিতামাতার চেয়েও প্রিয় মনে করেন ও তাঁর জীবনের বিনিময়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠাকে একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেন।

শিশু সাহাবী হাবীব ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা একান্তই ছোট হওয়ার কারণে 'বদরের যুদ্ধে' অংশগ্রহণ করতে পারেননি। এমনকি যুদ্ধাস্ত্র বহনের বয়স না হওয়ায় তিনি উহুদের যুদ্ধেও অংশগ্রহণে অক্ষম হন। এর পরে সংঘটিত প্রতিটি যুদ্ধেই তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অংশগ্রহণ করেন। এসব যুদ্ধে তিনি বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা, ত্যাগ, ধৈর্য ও নৈপুণ্যে শত্রুবাহিনীকে পরাস্ত করতে সক্ষম হন। বিশাল শত্রুবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে তাঁর তীক্ষ্ণ রণ-কৌশল, দৃঢ় ঈমানী চেতনা, উচ্চ মনোবল এবং সীমাহীন মানসিক প্রস্তুতি একান্তভাবে প্রশংসনীয় ছিল।

প্রিয় পাঠক! হাবীব ইবনে যায়েদ আল আনসারী (রা)-এর জীবনে ঘটে যাওয়া একটি রোমহর্ষক ঘটনার প্রতি আলোকপাত করতে চাচ্ছি, যা অতি ভয়ঙ্কর ও হৃদয়বিদারক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় থেকে পরবর্তী

সময়ে এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে ঘটনার স্মরণে মানুষের অন্তর কেঁপে উঠত, ঘটনাটি সত্যিই অবিস্মরণীয়।

হিজরী নবম সালে ইসলামী রাষ্ট্র সগৌরবে পূর্ণাঙ্গ রূপ নিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আরব দেশের প্রতিটি প্রান্ত থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে প্রতিনিধি দল উপস্থিত হতে থাকে। ইসলাম গ্রহণ ও ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকারের ঘোষণা দানের জন্য একের পর এক বিভিন্ন আরব গোত্রের প্রতিনিধি দলের মদীনায় আগমন। তাদের মধ্যে নজদের ঘনবসতি অধ্যুষিত উঁচু প্রান্তর থেকে আসা গোত্র বনূ হুনাইফার প্রতিনিধি দলের ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। বনূ হুনায়ফার এই প্রতিনিধিদল মদীনার প্রান্তেই তাদের উট বহরের অবস্থান নিয়ে মুসাইলামা ইবনে হাবীব আল হানাফী নামক এক ব্যক্তিকে উটবহর ও সরঞ্জামাদির পাহারার দায়িত্বে নিয়োজিত করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে তাদের গোত্রের ইসলাম গ্রহণ ও ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকারের ঘোষণাদানই তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনন্দের সাথে এ প্রতিনিধি দলকে অভ্যর্থনা জানান। উত্তম আতিথেয়তা দান করেন এবং প্রতিনিধি দলের প্রত্যেক সদস্যকে, এমনকি উটবহরের পাহারায় নিযুক্ত ব্যক্তিকেও অন্যান্য প্রতিনিধিদের মতো উপঢৌকন প্রদানের নির্দেশ দেন। এই প্রতিনিধি দল নজদে ফিরে যেতে না যেতেই সেই মুসাইলামা ইবনে হাবীব ইসলাম পরিত্যাগ করে এবং তার গোত্রের জনগোষ্ঠীকে এই বলে আহ্বান জানায় যে, সেও একজন প্রেরিত নবী। যাকে আল্লাহ বনূ হুনায়ফা গোত্রের জন্য প্রেরণ করেছেন, যেমন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুরাইশ গোত্রে প্রেরণ করেছেন। দেখতে না দেখতেই তার গোত্রের জনশক্তি নানা বাহানায় মুসাইলামাতুল কাযযাবের চারপাশে সমবেত হয়ে তার শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকে। এসব বাহানার অন্যতম ছিল গোত্রপ্রীতি। তার অনুসারীদের এক গোত্রীয় নেতা এই বলে ঘোষণা দেয় যে :

> 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিঃসন্দেহে সত্য নবী এবং মুসায়লামা একজন ভণ্ড। কিন্তু স্ব রবিয়া গোত্রীয় ভণ্ড নবী কুরাইশ বংশের একজন সত্য নবীর চেয়ে আমার নিকট অধিক প্রিয়।'

অতঃপর যখন মুসাইলামাতুল কাযযাবের চারপাশে মুরতাদদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল এবং সে প্রভাববিস্তারে সমর্থ হলো, তখন সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে একটি পত্র প্রেরণ করে। যার ভাষা ছিল আল্লাহর রাসূল মুসাইলামার পক্ষ থেকে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি :

'আস্‌সালামু আলাইকা। অতঃপর আমাকে অবশ্যই আপনার নবুয়তের অংশীদার করা হয়েছে। আরব ভূখণ্ডের অর্ধেক আমাদের আর অর্ধেক কুরাইশ গোত্রের। কিন্তু কুরাইশ সীমালংঘনকারী গোত্র।'

এ চিঠি তার অন্ধ অনুসারী মুরতাদদের দু'জনকে দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রেরণ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে এ চিঠি পাঠ করে শোনানো হলে পত্রবাহক দু'জনকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের দু'জনের বক্তব্য কী? তারা উত্তর দেয়, মুসায়লামার বক্তব্যই আমাদের বক্তব্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন :

'আল্লাহর শপথ! দূতদের হত্যা করা বিধিসম্মত হলে আমি অবশ্যই তোমাদের শিরশ্ছেদ করতাম।'

অতঃপর মুসাইলামাতুল কাযযাবের পত্রের জবাবে লিখেন :

بسمِ اللّٰهِ الرحمنِ الرحيم

من محمدٍ رسول الله إلى مسيلمةَ الكذَابِ. اَلسَّلَامُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى، أمَّا بعدُ.

فَإِنَّ الْأَرضَ لِلّٰهِ يُورِثُهَا مَن يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ والعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِين.

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

'আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে মুসাইলামাতুল কাযযাবের প্রতি।

হেদায়াতের অনুসারীদের প্রতি সালাম। অতঃপর প্রণিধানযোগ্য যে, এই ভূখণ্ডের সার্বভৌমত্ব নিশ্চয়ই একমাত্র আল্লাহরই। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে পছন্দ করেন, তাকে এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিয়ে থাকেন। আর শেষ পরিণাম শুধুমাত্র মুত্তাকীদের জন্যই।'

সেই মুরতাদদ্বয়ের হাতেই এ উত্তরখানা মুসাইলামাতুল কাযযাবকে প্রেরণ করা হয়। এর ফলে হেদায়াতের পথে ফেরৎ আসার পরিবর্তে মুসাইলামাতুল কাযযাব আল্লাহদ্রোহিতা ও নৈরাজ্য সৃষ্টিতে আরো উন্মত্ত হয়ে পড়ে। মুসাইলামাতুল কাযযাবকে তার ভণ্ডামি ও ভ্রষ্টপথ পরিহার করে হেদায়াতের পথে ফিরিয়ে আনার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি দাওয়াতী পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেন। সেই চিঠি বহন করার জন্য এ কাহিনীর মূল চরিত্র হাবীব ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমাকে দূত হিসেবে মনোনীত করেন। হাবীব ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা একদিকে যেমন ছিলেন রাজকীয় চেহারার সুপুরুষ যুবক, অন্যদিকে ছিলেন আপাদমস্তক ঈমানের প্রতিচ্ছবি। হাবীব ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা কোনোরূপ ভয়ভীতি, দুর্বলতা ও শঙ্কা প্রকাশ না করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সোপর্দ করা গুরুদায়িত্ব পালনে তৎক্ষণাৎ রওয়ানা হলেন। তিনি একের পর এক পাহাড়, পর্বত ও নিম্নভূমি অতিক্রম করে নজদের ঘনবসতিপূর্ণ উঁচু ভূ-খণ্ডে বনূ হুনাইফা গোত্রে এসে মুসাইলামাতুল কাযযাবকে সেই পত্র হস্তান্তর করলেন। হাবীব ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমার বহন করে আনা পত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার সৌভাগ্যের পরিবর্তে ভণ্ড মুসাইলামা হিংসা-বিদ্বেষ ও অহমিকায় ফেটে পড়ে। এমনকি তার ফর্সা মুখমণ্ডল বিশ্বাসঘাতকতা, নাশকতা ও পাপাচারের কালিমায় আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দূত হাবীব ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমাকে বন্দী করে পায়ে শৃঙ্খলাবদ্ধাবস্থায় পরের দিন দ্বিপ্রহরে গণ-আদালতে তার সামনে উপস্থিত করার নির্দেশ দেয়। মুসাইলামাতুল কাযযাব গণ-আদালত-এর সভাপতির আসনে সমাসীন হয়ে তার ডান ও বামপার্শ্বে মুরতাদদের দুই জল্লাদকে নিয়োজিত করে করে। সেখানে যথাসময়ে হাবীব ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমাকে উপস্থিত করা হয়। বন্দী বেশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দূত হাবীব ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা দু' পায়ে শৃঙ্খলাবদ্ধাবস্থাতে শান্ত ও নির্ভীকচিত্তে ধীরগতিতে অগ্রসর হতে থাকেন। হাবীব ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা বলিষ্ঠ ঈমানী চেতনা ও সাহসী মনোবলসহ গণ-আদালতে এসে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে গেলেন। ভয়ভীতিহীন যেন এক লৌহমানব। যে কোনো পরিস্থিতির উত্তরের জন্য নির্বিকার। তার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মুসাইলামাতুল কাযযাব জিজ্ঞাসা করল :

'তুমি কি মুহাম্মদকে আল্লাহর রাসূল হিসেবে সাক্ষ্য প্রদান কর?'

তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন :

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।'

মুসাইলামাতুল কাযযাব তাঁর এ উত্তরে রাগে ও ক্ষোভে ফেটে পড়ে আবার জিজ্ঞাসা করে :

'আমি যে আল্লাহর রাসূল তা কি তুমি স্বীকার কর ?'

এবার হাবীব ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা উপহাসের ভঙ্গিতে তাকে জবাব দিলেন :

'তুমি যা বলছো তা আমি শুনতে পাচ্ছি না। কী বলতে চাও স্পষ্ট করে বল।'

আর যায় কোথায়, রাগে ও ক্ষোভে মুসাইলামার চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল। তার ঠোঁট কাঁপতে থাকল। সঙ্গে সঙ্গে জল্লাদকে নির্দেশ দিল :

'তার দেহের একাংশ কেটে ফেল। সাথে সাথে জল্লাদ তরবারির আঘাতে তাঁর দেহের একাংশ কেটে ফেলল।'

কর্তিত অংশটুকু মাটিতে ছিটকে পড়ে লাফাতে লাগল। পুনরায় মুসাইলামাতুল কাযযাব তাকে একই প্রশ্ন করল :

'তুমি কি মুহাম্মদকে আল্লাহর রাসূল হিসেবে সাক্ষ্য দাও ?'

হাবীব ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা জবাব দিলেন :

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।'

অতঃপর সে বলল :

'আমাকেও কি আল্লাহর রাসূল হিসেবে তুমি স্বীকার করো?'

হাবীব ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা উত্তর দিলেন :

'আমি তো তোমাকে বলেছি, তুমি যা বলছো তা আমি শুনতে পাচ্ছি না। কেননা, আমার কানে বধিরতা দেখা দেয়।'

এবারও সে  হাবীব ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমার দেহের আরেকটি অংশ কেটে ফেলতে জল্লাদকে নির্দেশ দেয়। নির্দেশ পাওয়ামাত্রই জল্লাদ তাঁর আরেকটি অংশ কেটে ফেলে এবং সেটি পূর্বোক্ত অংশের পাশেই ছিটকে পড়ে লাফাতে লাফাতে নিথর হয়ে গেল। লোকজন বিস্মিত দৃষ্টিতে  তা দেখছিল। এভাবেই মুসাইলামাতুল কাযযাব হাবীব ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমাকে একের পর এক প্রশ্ন করে যাচ্ছিল। আর তিনিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের সাক্ষ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন আর মুসাইলামাতুল কাযযাবও তাঁর দেহ থেকে এক এক অংশ কেটে ফেলার নির্দেশ দিচ্ছিল। তাঁর দেহের অর্ধাংশ টুকরো টুকরো হয়ে  মাটির ওপর পতিত হলো। আর তিনি অবশিষ্ট কর্তিত দেহে উচ্চারণ করে যাচ্ছিলেন 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ'।

যে শিশু বালক তাঁর আম্মা-আব্বার সাথে আকাবার গভীর রজনীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে হাত মিলিয়ে বায়'আত করেছিলেন, যৌবনে পদার্পণ করে সে সাক্ষ্যেরই দাবি পূরণে তাঁর দু'ঠোঁটে 'ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ'  উচ্চারণ করতে করতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এবং তাঁর পবিত্র আত্মা ইল্লিয়্যীনের পথে দেহ থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করে। শাহাদাতের সংবাদ বহনকারী বার্তাবাহক তাঁর মা নুসাইবা আল মাযনিয়াহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে হাবীব ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমার শাহাদাতের সংবাদ জানালে তিনি একান্তই শান্তচিত্তে উত্তর দেন :

> 'এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে শাহাদাত বরণ করার লক্ষ্যেই তাঁকে প্রস্তুত করে তুলেছিলাম। আল্লাহর নিকট অবশ্যই সে পুরস্কৃত হবে। শৈশবে আকাবার রজনীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে যে বায়'আত সে করেছিল... বড় হয়ে তা পূরণ করল। আল্লাহ যদি তাওফীক দেন, তাহলে মুসাইলামাতুল কাযযাবকে বর্শার আঘাতে হত্যা করে তার প্রতিশোধ নেব ও তার সন্তানদেরকে তার মৃত্যুতে মাতম করিয়ে ছাড়ব।'

নুসাইবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার এ আশা পূরণ হতে বেশি দিন অপেক্ষা করতে হলো না। মদীনায় আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পক্ষ থেকে ভণ্ড নবী মুসাইলামা ও ইসলাম ত্যাগীদের বিরুদ্ধে জিহাদের আহ্বান

জানানো হলো। মুসলমানরা চরম উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভণ্ড নবীর শিরশ্ছেদ করার জন্য জিহাদে অংশগ্রহণ করতে লাগল। সে বাহিনীতে নুসাইবা আল মাযনিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাসহ তাঁর বড় ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমাও অংশগ্রহণ করেন। মুসাইলামাতুল কাযযাবের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের এক চরম সন্ধিক্ষণে বর্শা হাতে নুসাইবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা দুঃসাহসী সিংহীর মতো শত্রুবাহিনীর কাতার ভেদ করে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছিলেন, আর উচ্চৈঃস্বরে বলছিলেন :

> 'কোথায় সেই আল্লাহর দুশমন মুসাইলামাতুল কাযযাব? কোথায় সেই আল্লাহর দুশমন? আমাকে বলে দাও কোথায় সে?'

পরিশেষে, নুসাইবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বর্শা হাতে যখন মুসাইলামাতুল কাযযাবের নিকট পৌঁছলেন, ততক্ষণে মুসলমানদের বর্শা ও তরবারি ভণ্ডনবী মুসাইলামাকে রক্তে রঞ্জিত করে জাহান্নামের অতল গহবরে নিক্ষেপ করেছে। মুসাইলামাতুল কাযযাবের ভূলুণ্ঠিত রক্তাক্ত লাশ দেখে সন্তানের প্রতিশোধের জ্বালা নিবারণ ও চক্ষুদ্বয়কে শান্ত করলেন তিনি। কেন করবেন না? আল্লাহর দুশমন পাপিষ্ঠ ভণ্ডের হাতে তাঁর আল্লাহভীরু নেক সন্তান জীবন দিয়েছেন। তার প্রতিশোধ আল্লাহ নিবেন না? হ্যাঁ, অবশ্যই নিবেন। উভয়েই তাদের রবের দরবারে পৌঁছে গেছে। তবে পার্থক্য এই যে, একজনের স্থান হলো জান্নাতে এবং আরেকজনের জাহান্নামে।

---

হাবীব ইবনে যায়েদ আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমার জীবনী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সহায়ক গ্রন্থাবলি :

১. উসদুল গাবাহ : ১ম খণ্ড, ৪৪৩ পৃ. অথবা তরজমা অংশ : ১০৪৯ নং।
২. আনসাবুল আশরাফ : ২৫০ ও ৩২৫ পৃ.।
৩. আত তাবাকাতুল কুবরা : ৪র্থ খণ্ড, ৩১৬ পৃ.।
৪. আস সীরাতুন নুবুবিয়াহ লি ইবনি হিশাম : সূচিপত্র দ্রষ্টব্য ।
৫. আল ইসাবা : ১ম খণ্ড, ৩০৬ পৃ. অথবা আত তারজামা : ১৫৮৪ নং।
৬. শুহাদা-উল-ইসলাম ফী আহদিন নুবুওয়াহ লিন্ নাশার।

# আবূ তালহা আল আনসারী (রা)

*'উম্মু সুলায়মকে দেওয়া আবূ তালহার মহরের মতো এত উত্তম মহর আর আমরা দেখিনি। তার মহর ছিল ইসলাম।'*

*– মদীনার মুসলিম রমণীদের উক্তি*

যায়েদ ইবনে সাহল আন নাজ্জারী তাঁর স্বগোত্রে আবূ তালহা নামে পরিচিত ছিলেন। রুমাইছা বিনতে মিলহান (যাকে উম্মু সুলায়ম নামে ডাকা হতো) তাঁর স্বামীর মৃত্যুতে বিধবা হলে এ সংবাদকে আবূ তালহা অত্যন্ত আনন্দের সংবাদ বলে গ্রহণ করল। প্রকৃতপক্ষে তাতে অবাক হওয়ারও কিছু ছিল না। কারণ, উম্মু সুলাইম (রা) জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, নৈতিকতা ও চারিত্রিক গুণাবলির দিক দিয়ে ছিলেন নেত্রীস্থানীয় মহিলা। এমন গুণে গুণান্বিত মহিলার দিকে কার না দৃষ্টি পড়ে? সুতরাং সঙ্গত কারণেই আবূ তালহা অন্য কোনো প্রস্তাব আসার পূর্বেই তার প্রস্তাব পেশ করাকে সর্বোত্তম মনে করল। আবূ তালহার বিশ্বাস ছিল, উম্মু সুলাইম তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে অন্য কারো প্রস্তাবে রাজি হতে পারেন না। কারণ, ধন-সম্পদে, জ্ঞানে-গুণে, সামাজিক মান-মর্যাদায় ও সুস্বাস্থ্যের দিক দিয়ে সে সুপুরুষই শুধু নয়; বরং সে নাজ্জার গোত্রের শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী ও ইয়াসরিবের দক্ষ তীরন্দাযেরও অন্যতম।

সে ধরে নিল, তার মতো এমন এক ব্যক্তির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়ার কোনো কারণ নেই এবং তা হতেও পারে না। আবূ তালহা অনেক চিন্তা-ভাবনা করে উম্মু সুলাইমের বাড়ির দিকে রওয়ানা হলো; কিন্তু পথে এক 'দুঃসংবাদ' তাঁর কানে এল। উম্মু সুলাইম মক্কা থেকে আগত দাঈর ডাকে সাড়া দিয়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ঈমান এনেছেন ও পিতৃধর্ম পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। কিছুক্ষণ এ সংবাদের ওপর চিন্তা করল, তারপর বলল :

'তাতে এমন কী আসে-যায়? তাঁর মরহুম স্বামীও তো ইসলাম গ্রহণ না করে পিতৃধর্মের অনুসারী হিসেবেই উম্মু সুলাইমের সাথে ঘর-সংসার করেছে। আমিও তো তা করতে পারি।'

হিসেবের এই যোগ-বিয়োগ করতে করতে আবূ তালহা উম্মু সুলাইমের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলে এবং উম্মু সুলাইমের সাক্ষাৎপ্রার্থী হলে আবূ তালহাকে সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া হলো। উম্মু সুলাইম এবং তার ছেলে আনাসের উপস্থিতিতে আবূ তালহা উম্মু সুলাইমের কাছে প্রস্তাব পেশ করলে উম্মু সুলাইম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা উত্তরে বললেন :

'আবূ তালহা! আপনার মতো ব্যক্তির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা যায় না। কিন্তু যেহেতু আপনি একজন কাফির এবং আমি একজন মুসলমান সে জন্য আমি আপনার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারি না।'

উত্তর শুনে আবূ তালহা ভাবতে লাগল :

উম্মু সুলাইম হয়তো আমার চেয়ে বেশি ধনাঢ্য ও ক্ষমতাবান কোনো ব্যক্তিকে কথা দিয়ে ফেলেছেন। তাই এই খোঁড়া অজুহাতের মাধ্যমে আমাকে বিদায় দিতে চাচ্ছেন।'

এসব চিন্তা-ভাবনা করে সে বলল :

'হে উম্মু সুলাইম! আল্লাহর শপথ! আমার প্রস্তাব গ্রহণের পথে এটি কোনো কারণ নয়।'

উম্মু সুলাইম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বললেন :

'তাহলে আমার সামনে বাধা কী বলে আপনি মনে করেন?'

আবূ তালহা বলল :

'সোনা, চাঁদি, হীরা-জাওহার ইত্যাদির প্রাচুর্যই হয়তো বা!'

উম্মু সুলাইম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বিস্ময়ের স্বরে বললেন :

'সোনা-চাঁদি?'

আবূ তালহা বলল :

'মনে হয়, তা-ই।'

উম্মু সুলাইম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বললেন :

'আবূ তালহা আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাক্ষী রেখে স্পষ্ট ভাষায় বলছি , 'আপনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন, তাহলে সোনা-চাঁদি ছাড়াই আপনাকে আমি স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি আছি। আপনার ইসলাম গ্রহণকেই আমার মহর হিসেবে গণ্য করা হবে।'

উম্মু সুলাইমের এ উত্তর শোনামাত্রই চন্দন কাঠের তৈরি রং- রওশন করা তার সেই মূর্তির পা মনে পড়ল, যে মূর্তিকে অন্যান্য আরব নেতাদের ন্যায় নিজের পূজা-অর্চনার জন্য পরম ভক্তির সাথে সংরক্ষণ করে আসছিল। ভাবল, আমি যদি মুসলমান হয়ে যাই, তাহলে এই দেবতার কী হবে? উম্মু সুলাইম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বুঝতে পারলেন, আবূ তালহা কী ভাবছে! এই সুযোগকে কাজে লাগালেন উম্মু সুলাইম।

তিনি বললেন :

'আবূ তালহা! একবার কি চিন্তা করে দেখেছেন যে, আল্লাহকে ছাড়া আপনি যে দেবতার পূজা-অর্চনা করছেন, তা মাটি থেকে উৎপাদিত একটি বৃক্ষের অংশ ছাড়া আর কিছুই নয় ?'

আবূ তালহা বলল :

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন।'

উম্মু সুলাইম বললেন :

'আপনার কি এখনো লজ্জা হচ্ছে না?'

আপনি এমন একটি কাষ্ঠফলকের পূজা করে যাচ্ছেন, যার একাংশকে আপনি নিজের জন্য প্রভু হিসেবে তৈরি করে নিয়েছেন। আর অপরাংশকে অন্য কেউ রান্নার জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করছে। আবূ তালহা! আপনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন, তাহলে আপনাকে আমি স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত। ইসলাম গ্রহণ করা ছাড়া অন্য কিছুই আমি আপনার নিকট থেকে মহর হিসেবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নই।

আবূ তালহা বলল : 'কে আমাকে ইসলামে দীক্ষিত করবে ?'

উম্মু সুলায়ম বললেন : 'আমিই এ কাজের জন্য যথেষ্ট।'

আবূ তালহা বলল : 'কিভাবে?'

উম্মু সুলাইম বললেন :

> 'সত্যের সাক্ষ্য দিন এবং বলুন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই এবং এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।' অতঃপর বাড়ি ফিরে মূর্তিকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলুন!

আবূ তালহা ইসলাম গ্রহণ করলে আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলামের বিধি মোতাবেক উম্মু সুলাইম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তাকে বিয়ে করলেন। মুসলমান রমণীগণ বলতে শুরু করলেন, উম্মু সুলাইম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার মহরের মতো এত সম্মানজনক ও গৌরবময় মহরের কথা আর আমরা কখনো শুনিনি, যিনি তাঁর পুরো মহরকেই ইসলামের জন্য কুরবানী করে দিয়েছেন। ইসলাম গ্রহণের দিন থেকে আবূ তালহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইসলামের বিজয়ের জন্য তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে আল আকাবায় বায়'আত গ্রহণকারী ৭০ জন সাহাবীর মধ্যে তাঁর স্ত্রী উম্মু সুলাইম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা সহ তিনিও একজন ছিলেন। ইয়াসরিবে মুসলমানদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বারো জন নকীব বা দায়িত্বশীল নিযুক্ত করেছিলেন আবূ তালহা তাঁদের একজন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ যুদ্ধে শত্রুপক্ষ দ্বারা চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ত্যাগ ও কুরবানীর নজির স্থাপন করেন। উহুদ যুদ্ধে তিনি যে পরীক্ষার সম্মুখীন হন, তা সত্যিই তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা। সে ঘটনাটি হলো :

আবূ তালহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অন্তরের অন্তস্তল থেকে ভালোবাসতেন। তাঁর প্রতিটি রক্তকণা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেমে তরঙ্গায়িত হতো। যত বারই তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে তাকাতেন, তত বারই তিনি তৃষ্ণার্ত থেকে যেতেন। যত বারই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

কথা শুনতেন, তার শ্রবণ-ক্ষুধা আরও বৃদ্ধি পেত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতেন :

'আমার জীবন আপনার জন্য নিবেদিত। আমার সম্মান আপনার সম্মান ও সুখ্যাতির জন্য কুরবান হোক।'

উহুদ যুদ্ধের এক পর্যায়ে যখন মুসলিম যোদ্ধারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অরক্ষিত রেখে তাদের বিজয় সুনিশ্চিত ভেবে গনীমতের মাল আহরণে ব্যস্ত হয়ে পড়েন, তখন মুশরিকরা চতুর্দিক থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রচণ্ড আক্রমণের এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি পবিত্র দাঁত ভেঙে যায় এবং তাঁর পবিত্র চেহারা আহত ও রক্তাক্ত হয়ে পড়ে। ঠোঁট আঘাতপ্রাপ্ত হয় এবং মুখমণ্ডলে রক্তের ধারা বইতে থাকে। শত্রুপক্ষ থেকে গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হয় যে, মুহাম্মদ নিহত হয়েছেন। মুসলমানদের ক্ষণিকের বিজয় মুহূর্তের মধ্যেই পরাজয়ের রূপ নেয় এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হত্যার সংবাদে মুসলমানরা শুধু মুষড়েই পড়েননি; বরং আল্লাহর দুশমন শত্রুবাহিনীর দিকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাতে থাকেন। এই চরম সন্ধিক্ষণে যে কয়েকজন জানবায সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে ছিলেন, আবূ তালহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আন্হু তাঁদের অন্যতম। আবূ তালহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে যান। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শত্রুবাহিনীর নিক্ষিপ্ত তীর ও বর্শার আঘাত থেকে হেফাযত করতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রক্ষা করতে আবূ তালহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শত্রুবাহিনীর দিকে লক্ষ্য করে এমন দ্রুতগতিতে তীর নিক্ষেপ আরম্ভ করেন যে, প্রতিটি তীর শত্রুবাহিনীর এক একজনকে ধরাশায়ী করতে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ তালহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পেছনে অবস্থান নিয়ে উঁচু হয়ে নিক্ষিপ্ত তীরের লক্ষ্যবস্তুর প্রতি প্রত্যক্ষ করছিলেন। কিন্তু আবূ তালহা তাঁর পিছনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আশ্রয় গ্রহণের অনুরোধ করছিলেন এই বলে যে :

'আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক, ওদের দিকে উঁচু হয়ে তাকাবেন না। শত্রুবাহিনীর বর্ষিত তীর আপনাকে আঘাত হানতে পারে।

আমার বক্ষ আপনার বক্ষের জন্য এবং আমার শির আপনার সম্মানের জন্য নিবেদিত। আমি নিজেকে আপনার জন্য কুরবান করে দিয়েছি, যেন আপনার ওপর কোনো আঘাত না আসে।'

ইতোমধ্যেই মুসলমান বাহিনীর এক যোদ্ধা তীরের এক বোঝা নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছিল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উচ্চৈঃস্বরে ডেকে বলতে লাগলেন :

انْثُرْ سِهامَكَ بَيْنَ يَدَىْ أبى طَلْحَةَ ولاتَمْضِ بها هارِبًا.

'তীরের বোঝাটা আবূ তালহার সামনে রাখো, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিও না।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হেফাযতে আবূ তালহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন। এ যুদ্ধে তাঁর তিন তিনটি ধনুক ভেঙে যায়। তিনি শত্রুবাহিনীর উল্লেখযোগ্য যোদ্ধাদের নিধন করেন। আস্তে আস্তে যুদ্ধ থেমে যায়। আল্লাহ তাঁর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রক্ষা করেন। আবূ তালহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কুরবানীকে সত্যিকার কুরবানী হিসাবে গ্রহণ করা হয়। যুদ্ধের সংকট সন্ধিক্ষণে যেমন আবূ তালহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন একজন বীর যোদ্ধা, তেমনি দাতা হিসেবেও ছিলেন তিনি একজন শ্রেষ্ঠ দানবীর। মদীনায় সুপেয় শীতল পানি ও উন্নত ফলজ বৃক্ষ সমৃদ্ধ সুবিশাল দুটি বিরাট আঙ্গুর ও খেজুরের বাগান ছিল তাঁর।

অপূর্ব সৌন্দর্যঘেরা খেজুর বাগানে মৃদু বাতাসে খেজুর শাখাগুলো ঝিরঝির শব্দে হালকাভাবে দুলছে। তারই শীতল ছায়ায় একদিন আবূ তালহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নামায আদায় করছিলেন। সে সময় লাল ঠোঁট, রঙিন পা ও সবুজ রঙের একটি সুন্দর পাখি তার নামাযের একাগ্রতায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করল। পাখিটি গাছের ডালে নেচে নেচে মধুর সুরে গান গাইছিল। সুন্দর এই পাখিটির স্বাধীন ও মুক্ত বিচরণ আবূ তালহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নামাযের একাগ্রতাকে নষ্ট করল। মনটা ফিরে এলে তিনি ক'রাকাআত নামায পড়েছেন, তা আর মনে করতে পারলেন না। এই ঘটনা তাঁকে মর্মাহত করল। তিনি অন্য চিন্তা-ভাবনা

করতে বাধ্য হলেন। নামায শেষে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাজির হয়ে এই সাজানো বাগানের বিবরণ এবং সুন্দর পাখিটি কিভাবে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে নামাযে তাঁকে অন্যমনস্ক করে তোলে এ সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা দেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলেন :

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকে সাক্ষী রেখে এই বাগানকে আল্লাহর পথে দান করছি। আল্লাহ ও আপনার পছন্দনীয় পথে এই বাগানের ব্যবহার করুন।'

তাঁর সম্পর্কে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকালের পর তিনি ৩০ বছর জীবিত ছিলেন। বছরে যে ক'দিন রোযা রাখা নিষিদ্ধ সে ক'দিন ছাড়া তিনি সারা বছর রোযা রাখতেন। তিনি বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও কর্মক্ষেত্রে ছিলেন যে কোনো যুবকের মতো উদ্যমী ও সক্রিয়। দীনের দাওয়াতে দূর-দূরান্তে গমন এবং জিহাদে অংশগ্রহণ থেকে তাঁকে কেউ বিরত রাখতে পারেনি। উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সময় মুসলিম বাহিনী যখন সমুদ্রপথে জিহাদের উদ্যোগ গ্রহণ করে, আবূ তালহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একজন যোদ্ধা হিসেবে তাতে অংশগ্রহণ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। তাঁর এ প্রস্তুতি দেখে তাঁর ছেলেরা তাঁকে বললেন :

'হে আমাদের পিতা! আপনার ওপর আল্লাহর করুণা বর্ষিত হোক। আশির উপর আপনার বয়স। জীবনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবূ বকর সিদ্দীক ও উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জিহাদ করেছেন। এখন কি একটুও আরাম করবেন না? আমাদের অনুমতি দিন, আপনার পক্ষ থেকে আমরাই জিহাদে অংশ নিই।'

আবূ তালহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন :

انْفِرُوا خِفَافًا وَّثِقَالًا.

'তোমরা যে কোনো অবস্থাতেই থাকো না কেন, জিহাদের জন্য বের হয়ে পড়ো।'

এ বাক্যের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে জিহাদে অংশ গ্রহণের কথা বলেছেন। বৃদ্ধ ও যুবক সবাই এ আদেশের অন্তর্ভুক্ত। জিহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য আল্লাহ বয়সের কোনো সীমারেখা নির্ধারণ করেননি। ছেলেদের অনুরোধ উপেক্ষা করেই তিনি জিহাদে বের হয়ে পড়লেন।

অশীতিপর বৃদ্ধ আবূ তালহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সৈনিক বেশে যখন মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে জাহাজে উঠলেন, তখন তাঁকে খুবই উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল। জাহাজটি যখন মধ্য সমুদ্রে, তখন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ অসুখেই তিনি ইনতিকাল করেন। মুসলিম বাহিনী আবূ তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দাফন করার জন্য দ্বীপের সন্ধান করতে থাকে । এক সপ্তাহ পর একটি দ্বীপের সন্ধান পাওয়া গেল। এই এক সপ্তাহে আবূ তালহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মরদেহের বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন ঘটেনি। তা এমনভাবে শায়িত ছিল, মনে হচ্ছিল যে, তিনি ঘুমের মধ্যে রয়েছেন। গভীর সমুদ্রের মাঝে এক দ্বীপে সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও জন্মভূমি থেকে দূরে, বহু দূরে...। আবূ তালহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে দাফন করা হলো। তাতে তাঁর কোনো আফসোস নেই। কেননা, তখন তিনি আল্লাহর নিকটে পৌছেছেন। যেহেতু আল্লাহর নৈকট্য লাভই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তাই এতে তাঁর পরিবার-পরিজনেরও কোনো আফসোস বা দুঃখ-ব্যথা নেই।

---

আবূ তালহা আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জীবনী সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার সহায়ক গ্রন্থাবলি :

১. আল ইসাবাহ : ১ম খণ্ড, ৫০৬ পৃ.।
২. উসদুল গাবাহ (আত তারজামা) : নং ১৮৪৩ ।
৩. আল ইসতিয়াব : ১ম খণ্ড, ৫৪৯ পৃ. টীকা দ্রষ্টব্য।
৪. আত তাবাকাতুল কুবরা ঃ ৩য় খণ্ড, ৫০৪ পৃ.।
৫. সিফাতুস সাফওয়াহ : ১ম খণ্ড, ১৯০ পৃ.।
৬. তাহযীবুত তাহযীব : ৩য় খণ্ড, ৪১৪ পৃ.।
৭. তারীখুত ত্বাবারী : ২য় খণ্ড,৬১৯ পৃ., ৩য় খণ্ড, ১২৪, ১৮১ পৃঃ, ৪র্থ খণ্ড, ১৯২ পৃ.।
দারুল মাআরিফ সংস্করণ, ১০ম খণ্ডের সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।
৮. তাহযীব ইবনে আসাকির : ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪ পৃ.।
৯. আস সীরাতু লি-ইবনি হিশাম : সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।
১০. হায়াতুস সাহাবা : ৪র্থ খণ্ডের সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।

# রামলাহ বিনতে আবূ সুফিয়ান (রা)

*'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তিনি জীবনের সবকিছুর ওপর প্রাধান্য দান করেন। অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হতে মানুষ যেমন অপছন্দ করে, তেমনি তিনি পৌত্তলিকতায় ফিরে যাওয়াকে অপছন্দ করতেন।' – ঐতিহাসিকদের উক্তি*

মক্কায় আবূ সুফিয়ান ইবনে হারবের প্রচণ্ড দাপট ও একচ্ছত্র প্রতাপ-প্রতিপত্তি। কুরাইশ বংশে তার কঠোর আচরণ ও সীমাহীন নিয়ন্ত্রণের মুখে প্রতিটি ব্যক্তি। এমন কার সাহস যে, তার নির্দেশের সামান্যতম অবাধ্য হয়? তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেয়? কল্পনাই করা যায় না যে, তার প্রতি মক্কাবাসীর সে কি সীমাহীন আনুগত্য। কিন্তু তারই কন্যা উম্মু হাবীবা, যিনি রামলাহ্ নামে খ্যাত, সেই লৌহমানব পিতার প্রতিষ্ঠিত প্রভাবকে একেবারেই তুচ্ছ প্রমাণিত করে দিলেন। তিনি ও তাঁর স্বামী উবায়দুল্লাহ ইবনে জাহ্শ তাঁর পিতা আবূ সুফিয়ান ইবনে হারবের দেবতাকে অস্বীকার ও তার নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে বসলেন। তাঁরা এক আল্লাহর ওপর ঈমান আনলেন এবং মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের স্বীকৃতি ঘোষণা করলেন।

আবূ সুফিয়ান তার প্রচণ্ড প্রভাব-প্রতিপত্তির সবটুকু প্রয়োগ করা সত্ত্বেও কন্যা রামলাহ্ ও তাঁর স্বামীকে তাদের পৈতৃক ধর্ম পৌত্তলিকতায় ফিরিয়ে আনতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হলো। কন্যা রামলাহর অন্তরে ঈমান যেভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে

শেকড় গেড়েছে, পিতা আবূ সুফিয়ানের যুলুম-নির্যাতনের ঝড়ো হওয়া তা উপড়ে ফেলতে ব্যর্থ হলো। শুধু তাই নয়, ইসলামকে আরো দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকতে তাঁর জিদ বাড়িয়ে দিল এবং সংকল্পকে করল অধিকতর ঈমানী বলে বলীয়ান। কন্যার ঈমানের কাছে পিতার সর্বাত্মক বিরোধিতা পরাভূত হলো। এ ব্যর্থতার গ্লানিময় মুখখানা সে কুরাইশদের কিভাবে দেখাবে, এ প্রশ্নই তার কাছে বড় হয়ে দেখা দিল।

রামলাহ ও তাঁর স্বামীর ওপর আবূ সুফিয়ানের ক্ষুব্ধ ও সহিংস প্রতিক্রিয়া অসহনীয় আকার ধারণকালে তাদের মক্কায় বসবাস করা দুর্বিষহ হয়ে উঠল। মক্কার অন্যান্য মুসলমানের ওপরও অব্যাহত নির্যাতন অকল্পনীয় রূপ ধারণ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ অবস্থায় তাঁদেরকে ঈমান রক্ষার স্বার্থে হাবশায় হিজরত করার অনুমতি দিলেন। রামলাহ শিশু কন্যা হাবীবা ও তাঁর স্বামী উবায়দুল্লাহ ইবনে জাহ্শকে সঙ্গে নিয়ে তাদের ঈমানের হেফাযতের তাগিদে নাজ্জাশীর আশ্রয়ে হিজরত করেন। তাঁরাই হিজরতকারীদের প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু আবূ সুফিয়ান ইবনে হারব ও কুরাইশদের হাতছাড়া হয়ে রামলাহ ও তাঁর স্বামী এবং মুসলমানরা নিরাপদে হাবশায় (বর্তমান ইথিওপিয়ায়) পৌছে শান্তির নিঃশ্বাস নেবে, এ ছিল কুরাইশদের জন্য অসহনীয় ব্যাপার।

এ কারণে তারা হাবশায় বাদশাহ নাজ্জাশীর কাছে প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে। উদ্দেশ্য ছিল নাজ্জাশীকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তাদের ফেরত আনা। এই কুরাইশ প্রতিনিধি দল খ্রিস্টান বাদশাহ নাজ্জাশীকে এই বলে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে যে, মুসলমানরা ঈসা আলাইহিস সালাম ও তাঁর মা মারইয়াম আলাইহীস সালাম সম্পর্কে আপত্তিকর কথাবার্তা বলে থাকে। কুরাইশ প্রতিনিধি দলের এ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বাদশাহ নাজ্জাশী মুহাজির নেতৃবৃন্দকে তাঁর কাছে ডেকে পাঠান। উদ্দেশ্য, ইসলামের নিগূঢ় তত্ত্ব ও আকীদা-বিশ্বাস এবং ঈসা আলাইহিস সালাম ও মারইয়াম আলাইহীস সালাম সম্পর্কে তাদের ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে অবহিত হওয়া। মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অবতীর্ণ পবিত্র কুরআনের কিছু অংশ তিলাওয়াত করে শোনাতে বলেন বাদশাহ নাজ্জাশী। মুহাজির নেতৃবৃন্দ তাঁর কাছে ইসলামের আকীদা ও হাকীকত সম্পর্কে

পরিচ্ছন্ন ধারণা পেশ করেন এবং পবিত্র কুরআন মাজীদ থেকে তাঁকে কিছু অংশ তিলাওয়াত করে শোনান। কালামে পাক থেকে তিলাওয়াত শুনে বাদশাহ নাজ্জাশী কেঁদে উঠলেন। সে কান্নায় তাঁর দাড়ি অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠে। তিনি স্বাভাবিক হয়ে মুহাজির নেতাদের বললেন, 'যা কিছু এখন আপনাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর নাযিল করা হচ্ছে এবং যা কিছু ইতঃপূর্বে ঈসা আলাইহিস সালামের ওপর নাযিল করা হয়েছিল, নিঃসন্দেহে উভয়ই একই নূরের উৎস থেকে নাযিলকৃত।' –এই বলে বাদশাহ নাজ্জাশী 'লা-শারীক আল্লাহ'র ওপর ঈমান আনার কথা ঘোষণা দেন এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করেন। মুসলমানদের যারা হাবশায় হিজরত করে এসেছেন, তাদেরকে তিনি আশ্রয় দেওয়ার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

বাদশাহ নাজ্জাশী ইসলাম গ্রহণ করা সত্ত্বেও তাঁর মন্ত্রিপরিষদ, উচ্চ পদস্থ আমলারা ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। তারা খ্রিস্টান ধর্মে থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। উম্মু হাবীবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ভাবলেন, দীর্ঘদিন নানা নির্যাতন ভোগের পর এখন হয়তো একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা যাবে। হাবশায় বসবাসের দিনগুলো শান্তিতে কাটবে। কিন্তু তার তাকদীরে এমন ঈমানী পরীক্ষা আরও যে কত আছে, তা কি তিনি জানতেন? আল্লাহ রাব্বুল আলামীন উম্মু হাবীবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে কঠিনতর পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁর জন্য সংরক্ষিত কল্যাণের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সাথে সাথে শুরু হলো কঠিন থেকে কঠিনতর পরীক্ষা। তিনি আল্লাহর রহমতে উত্তীর্ণ হলেন এ পরীক্ষায়। আল্লাহর এই গোপন ইচ্ছা কোনো মানব সন্তানের পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না, যতক্ষণ তিনি তা প্রকাশ না করেন। উম্মু হাবীবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা প্রতিদিনের ন্যায় বিছানায় ঘুমিয়ে পড়লে তিনি স্বপ্নে দেখলেন :

> 'তাঁর স্বামী উবায়দুল্লাহ ইবনে জাহ্‌শ গভীর সমুদ্রের অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছেন। উত্তাল তরঙ্গমালা তাকে আঘাতের পর আঘাত হানছে এবং সে অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছে। কী যে করুণ দৃশ্য... ।'

উম্মু হাবীবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার ঘুম ভেঙে গেল। তিনি ভীত বিহবল

হয়ে বসে পড়লেন। দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনাগ্রস্ত অশান্ত মনে ভাবলেন, এ স্বপ্নের কথা তিনি কাউকে বলবেন না, এমনকি তাঁর স্বামী উবায়দুল্লাহকেও না। কিন্তু তিনি এ স্বপ্নের কথা কাউকে না বললেও স্বপ্নের ফলাফল তো বাস্তবায়ন হতেই চলল। পরের দিন শেষ হতে না হতেই এর ফলাফল প্রকাশ পেল। উবায়দুল্লাহ ইবনে জাহ্শ সে দিনই ইসলাম পরিত্যাগ করে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে ও অস্বাভাবিক মদপানে ঝুঁকে পড়ে। মুরতাদ উবায়দুল্লাহ ইবনে জাহ্শ উম্মে হাবীবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার জন্য বিকল্প দুটি প্রস্তাব রাখল। তার যে কোনো একটি গ্রহণ করার স্বাধীনতা দিল তাকে। যার একটি হলো, তালাকের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন হওয়া অথবা ইসলাম পরিত্যাগ করে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করা। এ প্রস্তাব শোনার পর উম্মু হাবীবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা সুস্পষ্টভাবে দেখলেন, তার সামনে তিনটি পথ খোলা। এ তিনটি পথের যে কোনো একটি তাকে গ্রহণ করতে হবে। যার একটি অপরটির চেয়েও দুর্বিষহ। প্রথম পথটি হচ্ছে :

> 'তাঁর স্বামীর প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে তাঁর খ্রিস্টান হয়ে যাওয়া। কিন্তু ইসলাম পরিত্যাগ করে মুরতাদ হওয়া তো আদৌ সম্ভব নয়। মুরতাদ হওয়া মানে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ত্যাগ করা। এর মানে স্বেচ্ছায় জাহান্নামের আযাবকে কবুল করে নেওয়া।'

উম্মু হাবীবা ধিক্কারের সাথে এ পথ পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে এ সংকল্প ও সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন :

> 'যদি লোহার চিরুনি দিয়ে আমার হাড় থেকে গোশত আলাদা করা হয়, তাহলেও আমি মুরতাদ হওয়ার পথ বেছে নেব না।'

দ্বিতীয় পথটি তাঁর সামনে ছিল :

> 'মক্কায় তাঁর পিতার বাড়িতে চলে যাওয়া। যদিও সে বাড়ি এখনও শিরকের মহাদুর্গ। ঈমানী চেতনার বলিষ্ঠ ঘোষণা এল, না! সেখানে ঈমান পরিত্যাগ-এর জন্য অত্যাচার-নির্যাতনের মাত্রা অত্যধিক বাড়িয়ে দেওয়া হবে। দীন ইসলাম অনুযায়ী সেখানে জীবন যাপন হবে কঠিনতর।'

এ চিন্তা করে সে পথও তিনি পরিত্যাগ করলেন।

তৃতীয় পথটি ছিল :

'এ পথে নিরাপত্তা আছে; কিন্তু আপনজন ছাড়া এই বিদেশ-বিভুঁইয়ে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন আর জীবিকা নির্বাহের প্রশ্নটিও জড়িত।'

তিনি একজন মহিলা, অপারগতা ও সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ। নানা আশঙ্কায় শঙ্কিত। অনেক চিন্তা-ভাবনার পর তৃতীয় পথকেই আল্লাহর ওপর ভরসা করে বেছে নিলেন। হ্যাঁ, তিনি বিচ্ছিন্নাবস্থায় হাবশায়ই থাকবেন, যতদিন না আল্লাহ্ কোনো সুরাহা করে দেন।

আল্লাহর পক্ষ থেকে অবিলম্বে সাহায্য এল। উম্মু হাবীবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে বেশি দিন অপেক্ষা করতে হলো না। 'ইদ্দত' পালনের দিনগুলো শেষ হতে না হতেই তাঁর বিপদ কেটে গেল। দুঃখ-কষ্টের এ অমানিশা দূর হয়ে যেন হেরার রোশনীতে তাঁর জীবন-দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

কোনো এক সকালে হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন 'আবরাহা' নামক বাদশাহ নাজ্জাশীর এক বিশেষ রাজকীয় মহিলা দূত তাঁর দ্বারে অপেক্ষমাণ। মহিলা দূত উম্মু হাবীবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে স্বাগতম জানালেন। ঘরের ভিতরে প্রবেশের অনুমতি পেয়ে তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন এবং সালাম ও কুশল বিনিময়ের পর তাঁর জন্য বহন করে আনা বাদশাহর পয়গাম অবগত করলেন :

'বাদশাহ নাজ্জাশী আপনাকে সালাম জানিয়ে এ সুসংবাদ দিয়েছেন যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে তাঁর জীবনসঙ্গিনী হিসেবে পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন এবং বাদশাহকে পত্র মারফত তা অবগত করেছেন।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাদশাহর নিকট যে পত্র পাঠিয়েছেন, তাতে তিনি এ শুভ কাজ আঞ্জাম দেওয়ার জন্য তাঁকেই তাঁর উকিল নিযুক্ত করেছেন। আপনার পক্ষ থেকে যাকে পছন্দ উকিল নিযুক্ত করুন। রাজকীয় মহিলা দূতের মাধ্যমে এ প্রস্তাব উম্মু হাবীবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেন এবং দূতকে উদ্দেশ্য করে বলতে থাকেন :

'হে দূত! এ শুভ সংবাদের জন্য আল্লাহ আপনাকে খুশি করুন...।

হে দূত! আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল করুন...।'

প্রত্যুত্তরে দূত বললেন :

'এ শুভ সংবাদের জন্য আল্লাহ্ আপনাকেও খুশি করুন।'

আনন্দময় এই বাক্য বিনিময়ের পর উম্মু হাবীবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা নিজের দু'হাতের বালা খুলে দূতকে পরিয়ে দিলেন। পায়ের নূপুর দুটিও খুলে দূতকে পরিয়ে দিলেন। তাতেও যেন পরিতৃপ্তি পেলেন না। গলার হার ও কানের দুটি বালি এবং আংটিগুলো খুলে তাকে পরিয়ে বললেন, এ সংবাদে তিনি এতই আনন্দিত হয়েছেন যে, যদি দুনিয়ার সব হীরা, মুক্তা ও স্বর্ণ-রৌপ্যের মালিক তিনি হতেন, তাহলেও আনন্দের আতিশয্যে এ মুহূর্তে তাকে তা দান করে দিতেন। অতঃপর তিনি দূতকে জানিয়ে দিলেন :

'খালিদ ইবনে সাঈদ আল আসকে আমার পক্ষ থেকে উকিল নিযুক্ত করলাম। কারণ, তিনিই এখন আমার একমাত্র নিকটাত্মীয়।'

হাবশার এক পাহাড়ি টিলায় বাদশাহ নাজ্জাশীর রাজকীয় প্রাসাদ। চারদিকের নৈসর্গিক পরিবেশ, অপূর্ব সুন্দর বাগান ও গাছপালা বাদশাহ নাজ্জাশীর রাজকীয় প্রাসাদের শোভা বৃদ্ধি করছে। প্রাসাদটি নানা বর্ণের কারুকার্যখচিত ঝাড়বাতির বর্ণিল আলোয় আলোকিত। মূল্যবান পাথরের তৈরি ঝকমকে মেঝে এবং রাজকীয় সোফা ও গালিচায় সুসজ্জিত বিরাট হলরুমে জা'ফর ইবনে আবী তালিব, খালিদ ইবনে সাঈদ ইবনে আল আস, আবদুল্লাহ ইবনে হুযাইফা আসসাহ্মী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম-এর মতো শ্রদ্ধাভাজন ও সম্মানী সাহাবী নেতৃবৃন্দ এবং হাবশায় উপস্থিত মুহাজির সাহাবীগণ এ অনুষ্ঠানে সানন্দে অংশগ্রহণ করেন। বাদশাহ নাজ্জাশী নিজ ওকালতিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে উম্মু হাবীবা বিনতে আবূ সুফিয়ানের বিবাহ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। সম্মানিত উপস্থিতিদের উদ্দেশ্যে বাদশাহ নাজ্জাশী নিম্নোক্ত ভাষণে বলেন :

'মহাপরাক্রমশালী একমাত্র শক্তিধর, পূর্ণ নিরাপত্তা দানকারী, সব দুর্বলতা ও অক্ষমতার উর্ধ্বে যার স্থান, তিনি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। তাঁরই সমস্ত

প্রশংসা জ্ঞাপন করছি এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা প্রভু ও ইলাহ নেই। আমি এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দাহ ও তাঁরই প্রেরিত রাসূল। ঈসা আলাইহিস সালাম যাঁর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছিলেন।'

অতঃপর এই মহান অনুষ্ঠানে তিনি ঘোষণা দেন :

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন :

'আবূ সুফিয়ানের কন্যা উম্মু হাবীবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার সাথে তাঁকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়ে দেই। তাঁর এ নির্দেশে সাড়া দিয়ে আমি এ বিবাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত হিসেবে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে উম্মু হাবীবার জন্য মহরানাস্বরূপ চারশত স্বর্ণমুদ্রা ধার্য করে এই মহতী অনুষ্ঠানে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর সাথে তাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করালাম।'

এই বলে তিনি উম্মু হাবীবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার নিযুক্ত উকিল খালিদ ইবনে সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সামনে তা পেশ করেন। এরপর খালিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর আসন থেকে দাঁড়িয়ে এ মহান অনুষ্ঠানে বাদশাহের ঘোষণার সমর্থনে বলেন :

'সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর, তাঁর কাছে সাহায্য কামনা করছি। তাঁর দরবারেই গুনাহ মাফ চাচ্ছি এবং তাওবা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই আল্লাহর রাসূল। যাঁকে হেদায়াত ও সত্য ধর্ম বা দীনে হক দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। যিনি কাফির-মুশরিকদের সর্বপ্রকার বিরোধিতা সত্ত্বেও মানবজাতির জীবনবিধান ইসলামকে মানব রচিত সমস্ত জীবন বিধান ও ধর্মের উপর বিজয়ী করেছেন।'

অতঃপর আমার বক্তব্য হলো :

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এই মহতী অনুষ্ঠানে উম্মু হাবীবা বিনতে আবূ সুফিয়ানের উকিল হিসেবে আমি আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ-এর সাথে তাঁকে বিবাহ দিলাম।'

'আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর স্ত্রীর ওপর বরকত নাযিল করুন। আল্লাহ উম্মু হাবীবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার জন্য যে কল্যাণ নির্ধারিত করে রেখেছেন তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ।'

এই বলে উম্মু হাবীবার মহরানা বহন করে তাঁকে সোপর্দ করার উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁর সঙ্গী-সাথীরাও চলে যাওয়ার জন্য ওঠে দাঁড়ালেন। তৎক্ষণাৎ বাদশাহ নাজ্জাশী তাঁদের উদ্দেশ্যে বললেন :

'অনুগ্রহপূর্বক বসুন। কারণ, সর্বকালেই নবীদের সুন্নাত হলো বিয়েতে ওয়ালীমার ব্যবস্থা করা।'

আগে থেকেই দাওয়াতের আয়োজন ছিল। মেহমানদের জন্য খাবার পেশ করা হলো। সবাই তৃপ্তি সহকারে পানাহার করে আনন্দের সাথে বিদায় নিলেন।

উম্মু হাবীবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তাঁর বিবাহোত্তর খুশির বর্ণনা দিয়ে বলেন যে,

'মহরানার স্বর্ণমুদ্রাগুলো আমার কাছে পৌঁছলে তা থেকে ৫০ মিছকাল বা ৭৫ তোলা স্বর্ণ আমি বিবাহের শুভ সংবাদদানকারিণী 'আবরাহা'র জন্য পাঠিয়ে দেই এবং তাঁকে বলি যে, বাদশাহর দূত হিসেবে বিয়ের শুভ সংবাদ দানের সাথে সাথে আপনাকে পুরস্কার দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সে সময় আমার কাছে কোনো অর্থ ছিল না। ৫০ মিছকাল স্বর্ণ প্রেরণের কিছুক্ষণের মধ্যেই 'আবরাহা' আমার কাছে উপস্থিত হয়ে স্বর্ণমুদ্রাগুলো এবং সাথে করে নিয়ে আসা সুন্দর এক মোড়কে রাখা আমার অলংকারগুলোও আমাকে ফেরত দিলেন, যা আমি তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব শুনে উপহার হিসেবে দিয়েছিলাম।'

তিনি এসব ফেরত দিয়ে বললেন :

বাদশাহ অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেছেন :

'আমি এসবের কিছুই যেন গ্রহণ না করি।'

বাদশাহ তাঁর স্ত্রীদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন :

তাদের নিকট যত সুগন্ধি রয়েছে তা সবই যেন আপনার খিদমতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

পরের দিন 'আবরাহা' যা'ফরান, নানা রকমের মূল্যবান সুগন্ধি, মিশক-আম্বর ইত্যাদি নিয়ে আবার উপস্থিত হয়ে বলেন :

'আপনার নিকট আমার একটু অনুরোধ।'

জিজ্ঞাসা করলাম :

'সেটা কী? '

তিনি বললেন :

'আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ জানিয়ে তাঁকে আমার সালাম জানাবেন। এটা কিন্তু ভুলবেন না। এ কথা বলে আমাকে সাজাতে লেগে গেলেন।'

অতঃপর আমাকে হাবশা থেকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আনা হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাতে বিবাহ প্রস্তাব, আবরাহার সাথে আমার সংলাপ ও ঘটনাবলির বর্ণনা দেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আবরাহার সালাম পেশ করি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব শুনে খুবই আনন্দিত হন এবং বলেন :

'আবরাহার ওপরও আমার সালাম এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক তার উপর।'

---

রামলাহ বিনতে আবূ সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার জীবনী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য সহায়ক গ্রন্থাবলি :

১. আল ইসাবাহ : ৪র্থ খণ্ড, ৪৪১ পৃ.।
২. আল ইসতিয়াব : ৪র্থ খণ্ড, ৩০৩ পৃ.।
৩. উসদুল গাবাহ : ৫ম খণ্ড, ৪৫৭ পৃ.।
৪. সিফাতুস সাফওয়াহ : ২য় খণ্ড, ২২ পৃ.।
৫. আল মাআরিফ লি-ইবনি কুতাইবা : ১৩৬ ও ৪৪০ পৃ.।
৬. সিয়ারু আলামুন নুবালা।
৭. মিরআতুল জিনান লিল ইয়াফেয়ী।
৮. আস্ সীরাতুন নুবুবিয়াহ লি-ইবনি হিশাম (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।

৯. তারীখুত তাবারী : (১০ম খণ্ডের সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
১০. তাবাকাত ইবনে সা'দ : (৮ম খণ্ডের সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
১১. তাহযীবুত তাহযীব লি-ইবনি হাজার।
১২. হায়াতুস সাহাবা : (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
১৩. আলামুন্ নিসা লিকাহালাহ : ১ম খণ্ড, ৪৬৪ পৃ.।

# ওয়াহ্শী ইবনে হারব (রা)

*'সে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতের সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তিটিকে যেমন হত্যা করেছে, তেমনি তার কাফফারায় ইসলামের ইতিহাসে সবচেয়ে নিকৃষ্টতম ব্যক্তিটির হত্যাকারীও সে।' - ঐতিহাসিকদের উক্তি*

কে সেই ব্যক্তি– যে উহুদের যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা আরবের খ্যাতনামা পাহলওয়ান হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে হত্যা করেছিল– কে সেই ব্যক্তি? যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তরকে ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছিল? অতঃপর সেই ব্যক্তিই তার কাফফারাস্বরূপ ইয়ামামার যুদ্ধে ভণ্ডনবী 'মুসাইলামাতুল কায্যাব'কে হত্যা করেও মুসলমানদের ব্যথা সে প্রশমিত করেছিল!

হ্যাঁ, সে ব্যক্তি হলো আবূ দাসামা নামে খ্যাত ওয়াহ্শী ইবনে হারব আল হাবশী। তার সেই নির্মম ও হৃদয়বিদারক ঘটনা যুগ যুগ ধরে স্মরণীয় হয়ে আছে। তার নিজ বর্ণনা থেকেই এই দুঃখজনক ঘটনাটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করুন।

ওয়াহ্শী ইবনে হারব বর্ণনায় বলেন :

> 'আমি জনৈক কুরাইশ সরদার জুবায়ের ইবনে মুত্ইমের ক্রীতদাস ছিলাম। তার চাচা তুয়ামাই বদরের যুদ্ধে হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাতে নিহত হয়। এতে সে চরমভাবে শোকাহত ও ক্ষুব্ধ হয় এবং লাত ও উয্যার নামে শপথ করে বলে যে, সে অবশ্যই হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব থেকে তার চাচার রক্তের প্রতিশোধ নেবে। এই

শপথের দাবি পূরণে সে হামযা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে হত্যার সুযোগ খুঁজতে থাকে।'

'কিছুদিন পর কুরাইশ নেতৃবৃন্দ উহুদের প্রান্তরে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চিরতরে এ দুনিয়া থেকে বিদায় এবং বদরের যুদ্ধে তাদের নিহত আত্মীয়-স্বজনদের রক্তের প্রতিশোধের লক্ষ্যে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সে উদ্দেশ্যে সেনাবিন্যাসের কাজ আরম্ভ করে। নির্দিষ্ট কোঠায় পৌঁছানোর জন্য মিত্রদেরসহ সর্বস্তরে যোদ্ধা সংগ্রহের কাজ চলতে থাকে। সর্বাত্মক প্রস্তুতির পর আবূ সুফিয়ান ইবনে হারবকে সেনাপতি নিযুক্ত করা হলো। কুরাইশ সেনাপতি আবূ সুফিয়ান সৈন্যদের যুদ্ধে উত্তেজিত করা এবং তারা যাতে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে না যায়, সে জন্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়। সে লক্ষ্য অর্জনের কৌশল হিসাবে বদর যুদ্ধে যাদের পিতা, ভাই, ভাতিজা, চাচা, ফুফা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন নিহত হয়েছে, তাদের পরিবারের মহিলাদের সমন্বয়ে গঠিত একটি দলকে যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয়। তার পরিকল্পনা মোতাবেক যেসব মহিলা এ যুদ্ধে তার সাথে অংশগ্রহণ করে তাদের মধ্যে তার স্ত্রী হিন্দ বিনতে উতবা ছিল সর্বাগ্রে। কারণ, তার পিতা, চাচা ও ভাই সবাই বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছিল।'

ওয়াহ্শী ইবনে হারব তার বর্ণনা অব্যাহত রেখে বলে :

জিঘাংসায় উদ্বুদ্ধ সৈন্যবাহিনী রওয়ানা হওয়ার পূর্বক্ষণে জুবায়ের ইবনে মুত্ইমের দৃষ্টি আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়। সে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলে :

'আবু দাসামা! তুমি কি দাসত্বের জিঞ্জির থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চাও?'

তাকে পাল্টা প্রশ্ন করলাম :

'এমন কে আছে, যে আমাকে এ কাজে সহায়তা করতে পারে ?'

সে উত্তর দিল : 'আমিই তোমাকে এ কাজে সহায়তা করতে প্রস্তুত।'

জিজ্ঞাসা করলাম : 'কিভাবে?'

সে বলল :

'মুহাম্মদ-এর চাচা হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিবকে আমার নিহত চাচা তুয়াইমা ইবনে আদীর পরিবর্তে হত্যা করতে পারলেই তুমি দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে।'

আমি বললাম :

'এ শর্ত পূরণে কে আমাকে জামানত বা নিশ্চয়তা দান করবে?'

সে উত্তর দিল :

'তুমি যাকে চাও তাকেই সাক্ষী নিযুক্ত করতে পার। আর আমি জনসমক্ষে এর ঘোষণা দিতেও প্রস্তুত।'

উত্তরে বললাম :

'হ্যাঁ, এ কাজের জন্য আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম।'

ওয়াহশী ইবনে হারব বর্ণনা করে যে :

'আমি একজন হাব্শী। অন্য হাব্শীদের মতো অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বর্শা নিক্ষেপে আমি ছিলাম শীর্ষে। আমার নিক্ষিপ্ত কোনো বর্শাই লক্ষ্যভ্রষ্ট হতো না। আমার মুক্ত হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর আমি বর্শা হাতে কুরাইশ সৈন্যদের সাথে মিলিত হয়ে সৈন্যদের পেছন সারিতে মহিলাদের প্রায় কাছাকাছি স্থানে অবস্থান নিলাম। কেননা, যুদ্ধ করার আমার কোনোই ইচ্ছা ছিল না। জয়-পরাজয়ও আমার উদ্দেশ্য ছিল না।'

যখনই আমি আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দার পাশ দিয়ে অতিক্রম করতাম কিংবা সে আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করত, সূর্যের আলোকচ্ছটায় আমার হাতের বর্শার ঝিলিক দেখেই সে বলে উঠত :

'আবু দাসামা! হামযা ও তার ভাতিজা মুহাম্মদ-এর ওপর আমাদের অন্তরে যে ক্রোধের আগুন জ্বলছে তা একমাত্র তুমিই নির্বাপিত করতে পার।'

'কুরাইশ বাহিনী উহুদ প্রান্তরে পৌঁছলে উভয়পক্ষে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বেধে গেল। আমি হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সন্ধানে বের হলাম। আমি তাঁকে আগে থেকেই চিনতাম। এমনিতেই হামযা কারো দৃষ্টির আড়ালে থাকার মতো ব্যক্তি ছিলেন না। আরবীয় বীর যোদ্ধাদের ন্যায় তিনিও পালক দ্বারা বিশেষভাবে তৈরি 'পাহলওয়ান মুকুট' ব্যবহার করতেন। কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পরই হামযাকে পেয়ে গেলাম। বিশালকায় শক্তিশালী উট গর্জে উঠলে যেমন তার চারপাশের লোকজন ভয়ে ছোটাছুটি করে, তেমনি তাঁর তলোয়ারের আঘাতে তাঁর দু'পাশের শত্রুরা একের পর এক কচুকাটা হচ্ছিল। এমনকি সামনে কেউ দাঁড়াতেও সাহস পাচ্ছিল না, তাঁকে কেউ আঘাত হানতেও সমর্থ হচ্ছিল না। আমি দূর থেকে

তাঁকে আঘাত হানার উদ্দেশ্যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখলাম। কোনো গাছ বা উঁচু টিলার আড়ালে লুকিয়ে থেকে আমি তাঁর কাছাকাছি পৌঁছানোর অপেক্ষায় থাকলাম। এ মুহূর্তে সিবায়া ইবনে আবদুল উয্যা নামক অশ্বারোহী কুরাইশ যোদ্ধা অগ্রসর হয়ে হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে চ্যালেঞ্জ করে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করতে লাগল। হামযা! সাহস থাকলে আমার সামনে এস। এস সাহস থাকলে আমার সামনে এস।

হামযা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন : 'হে মুশরিক সন্তান, এস আমার সামনে এস...।'

'দেখতে দেখতে হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহুর তরবারির আঘাতে সে মাটিতে ছিটকে পড়ল এবং তাঁর সামনেই রক্তাক্ত দেহ ছটফট করতে লাগল। এ সময়ই হামযা রাদিয়াল্লাহহু আনহুকে আঘাত করার মোক্ষম সুযোগ হিসেবে বেছে নিলাম। তাঁর দিকে অগ্রসর হতে থাকলাম। আমার বর্শাটি ভালোভাবে দেখে নিলাম। বর্শার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া মাত্রই তা তাঁর দিকে সজোরে ছুঁড়ে মারলাম। সাথে সাথে তা তাঁর তল পেটের সম্মুখ দিয়ে ঢুকে পিছন দিয়ে বের হয়ে গেল। এ অবস্থাতেও তিনি দু'কদম আমার দিকে অগ্রসর হলেন এবং শেষ পর্যন্ত পড়ে গেলেন। আমি ততক্ষণ পর্যন্ত মাটিতে তাঁর দেহকে বর্শাবিদ্ধ রাখলাম, যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত না হলাম।'

'অতঃপর তাঁর দেহ থেকে বর্শা খুলে নিয়ে নিজ তাঁবুতে গিয়ে নিশ্চিন্তে বসে পড়লাম। কারণ, যুদ্ধের জয়-পরাজয়ে আমার কোনো আগ্রহ ছিল না। হামযাকে হত্যা করার মাধ্যমে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাওয়াই আমার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। যুদ্ধ তুমুল আকার ধারণ করল। উভয় পক্ষে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া চলতে লাগল। এক পর্যায়ে রণক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রণ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের বিপক্ষে চলে গেল। তাঁদের অনেক প্রাণহানি ঘটল। তখন হিন্দা বিনতে উতবার নেতৃত্বে নর্তকীদের একদল ছুটে গিয়ে কুরাইশ সৈন্যদের পিছনে মুসলমানদের মৃতদেহকে বিকৃত (মৃতদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, নাক, কান, ইত্যাদি কেটে ও চোখ উপড়ে ফেলার মতো চরম নৃশংস আচরণ) করতে লাগল। তারা শহীদ সাহাবীদের পেট কেটে দেহ থেকে কলিজা বিচ্ছিন্ন করতে থাকল। চক্ষু উপড়ে ফেলতে থাকল। নাক ও কান কেটে তাদের পরিচয়ের বিকৃতি ঘটাতে থাকল।

তাদের ঐসব কাটা নাক, কান, চক্ষু দ্বারা গলার মালা ও কানের বালি তৈরি করে পরিধান করে মনের ক্ষোভ মেটাতে লাগল।'

আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা তার গলার সোনার হারখানি এবং শহীদদের কর্তিত নাক-কানের তৈরি মালা ও বালা আমাকে পরিয়ে দিয়ে বলল :

'এগুলো তোমার হে আবু দাসামা এগুলো তোমার। এগুলো তুমি ভালো করে সংরক্ষণ কর। কারণ, এগুলো অতীব মূল্যবান।'

'উহুদের প্রান্তর শান্ত হলে এবং যুদ্ধ থেমে গেলে কুরাইশ বাহিনীর সাথে আমি মক্কায় ফিরে আসি। জুবাইর ইবনে মুতইম আমার প্রতি খুশি হয়ে তার প্রতিশ্রুতি পূরণ করে আমাকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে দেয়। তখন থেকেই আমি স্বাধীন মানুষের মর্যাদা লাভ করি।'

অপরদিকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত প্রতিদিনই সম্প্রসারিত হতে লাগল। প্রতি মুহূর্তেই মুসলিম জনশক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকল। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত যত দ্রুত বিস্তার লাভ করতে থাকল আমিও তত বেশি চিন্তাযুক্ত হতে লাগলাম। ভয় ও আশঙ্কা আমার মন-মানসিকতাকে ভীষণভাবে আক্রান্ত করে ফেলল। এই দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনার মাঝেই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দুর্ধর্ষ মুসলিম বাহিনী নিয়ে বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করলেন। কালবিলম্ব না করে আমি তায়েফকে নিরাপদ আশ্রয়-স্থান ভেবে সে উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে পলায়ন করলাম। কিন্তু দেখতে না দেখতেই নামেমাত্র প্রতিরোধ করে তায়েফবাসীরাও ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পরিকল্পনা করল। তারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে দেখা করে তায়েফবাসীদের ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার সংবাদ অবগত করার জন্য এক প্রতিনিধিদল মনোনীত করল এবং তাদের মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। এ দেখে আমি ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লাম ও চতুর্দিকে অন্ধকার দেখতে লাগলাম। সুবিশাল পৃথিবী আমার জন্য সংকুচিত হয়ে এল। পলায়নের সমস্ত পথও বন্ধ হয়ে গেল। চিন্তা করতে লাগলাম, সিরিয়ায় পলায়ন করব, নাকি ইয়ামেনে, না অন্য কোনো দেশে? ভেবে কোনো কূল-কিনারা পাচ্ছিলাম না। আল্লাহর শপথ! প্রতিনিয়ত আমি যেন শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করছিলাম।'

এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি তার পরামর্শের হাত আমার দিকে বাড়িয়ে দিল।

সে আমাকে বলল :

'তোমার জন্য আফসোস ওয়াহ্‌শী! কেন তুমি দুশ্চিন্তায় ভুগছ? আল্লাহর শপথ! কোনো লোক ইসলাম গ্রহণ করলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কক্ষনো হত্যা করেন না।'

'তার এই অভয়বাণী শুনে অন্য কোনো দেশে পলায়নের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করে মদীনায় গিয়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে আত্মসমর্পণ করাই শ্রেয় মনে করলাম। মদীনায় পৌঁছে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তাঁর অবস্থান সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করতে আরম্ভ করলাম। জানতে পারলাম যে, তিনি মসজিদে অবস্থান করছেন। মসজিদে প্রবেশ করে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ভীত ও সন্ত্রস্ত মনে তাঁর দিকে অগ্রসর হতে থাকলাম। এমনকি তাঁর একেবারে মাথার কাছে গিয়ে উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলাম, 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ও আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহূ।'

কালেমা শাহাদাতের আওয়াজ শোনামাত্রই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দিকে দৃষ্টি তুলে তাকালেন। আমাকে দেখেই তিনি তাঁর দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে বললেন : 'তুমিই কি ওয়াহ্‌শী?'

আমি ভয়ে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে আতঙ্কিতাবস্থায় উত্তর দিলাম,

'হে আল্লাহর রাসূল! আমিই ওয়াহ্‌শী ইবনে হারব।'

আমার উত্তর শুনে তিনি বললেন : 'বস, আমাকে বর্ণনা দাও কিভাবে হামযাকে হত্যা করেছ?'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মোতাবেক তাঁর কাছে বসে হামযা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে হত্যার পুরো ঘটনা বর্ণনা করলাম। বর্ণনাশেষে তিনি খুবই বিরক্তভাবে আমার থেকে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং বলেন :

'ওয়াহ্‌শী! তোমার মুখকে সর্বদা আমার নজর থেকে দূরে রাখবে। এরপর থেকে কখনো যেন তোমাকে আমি না দেখি।'

ওয়াহ্‌শী বলেন : 'এরপর থেকে আমি সর্বদাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃষ্টি এড়িয়ে চলতাম, যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নজর আমার ওপর না পড়ে।'

'সাহাবাদের গণ-মজলিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্মুখভাগে অবস্থান নিলে আমি তাঁর পিছনে গিয়ে বসতাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত পর্যন্ত এভাবেই তাঁর নজর এড়িয়ে চলতে থাকলাম।'

ওয়াহ্শী ইবনে হারব তাঁর পরবর্তী সময়ের ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বলেন,

'ইসলাম গ্রহণ করলে পূর্ববর্তী পাপ মুছে যায়, ইসলামের এ মর্মবাণী খুব ভালো করে জানা সত্ত্বেও কৃতকর্মের জন্য আমি সর্বদাই নিজেকে অভিশপ্ত মনে করতাম। আমি ইসলাম ও মুসলমানদের যে কী অপরিমেয় ক্ষতিসাধন করেছি, তা ভেবে আমি সর্বদাই উৎকণ্ঠিত থাকতাম। সেই মহাপাপের কাফ্‌ফারা কিভাবে আদায় করা যায়, সেই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকালের পর আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ওপর খিলাফতের গুরুদায়িত্ব অর্পিত হলো। মুসাইলামাতুল কাযযাব নামক এক ভণ্ড নবুওয়াতের দাবি করলে বনূ হুনায়ফা গোত্রের লোকজন ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে মুরতাদ হতে থাকল। খালীফাতুল মুসলিমীন আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বনূ হুনায়ফা গোত্রের জনগণকে পুনরায় ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার আহ্বান জানান। তারা তাঁর আহবানে সাড়া না দিলে বাধ্য হয়ে তিনি ভণ্ডনবী মুসাইলামাতুল কাযযাবের মোকাবেলার উদ্দেশ্যে জিহাদের ডাক দিলেন। সামরিক প্রস্তুতি আরম্ভ হলো। এবার আমি মনে মনে আল্লাহর শপথ করে বললাম :

'ওয়াহ্শী! এবার তোমার একটা সুবর্ণ সুযোগ। একে সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ কর। এ সুযোগ যেন কোনোক্রমেই তোমার হাতছাড়া না হয়।'

যে বর্শা দিয়ে 'সাইয়েদুশ' শুহাদা হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে শহীদ করেছিলাম, সেই বর্শাখানা হাতে নিলাম এবং শপথ গ্রহণ করলাম :

'এর দ্বারা মুসাইলামাতুল কাযযাবকে হত্যা করব, নয়তো এ যুদ্ধে অবশ্যই শাহাদাত বরণ করব।'

সেই বিশাল বাগান, যে বাগান মুরতাদদের মৃতদেহের স্তূপে ভরে গিয়েছিল, যা ইসলামের ইতিহাসে 'হাদীকাতুল মাওত' নামে খ্যাত। যুদ্ধের এক পর্যায়ে সেই বাগানে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল মুসাইলামাতুল কাযযাব ও তার বাহিনী। মুরতাদদের ওপর যখন মুসলিম বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাদের প্রতিরোধকে

ছিন্নভিন্ন করে ফেলল, সে মুহূর্তে আমি মুসাইলামাতুল কাযযাবকে খুঁজতে আরম্ভ করলাম এবং তাকে দেখতে পেলাম যে, সে তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে আছে। আমি যেভাবে তাকে লক্ষ্যবস্তু করেছিলাম, ঠিক সেভাবেই অপর এক আনসারী যুবকও তাকে সেভাবেই লক্ষ্যবস্তু করেছিল। আমাদের উভয়ের লক্ষ্য ছিল তাকে হত্যা করা। সুযোগ বুঝে আমার বর্শা তাক করে নিলাম এবং সজোরে তার দিকে নিক্ষেপ করলাম। বর্শা তার দেহ ভেদ করে বিপরীত দিক দিয়ে বের হয়ে গেল। ঠিক একই মুহূর্তে, যে মুহূর্তে আমার বর্শা তাকে ভেদ করে বিপরীত দিক দিয়ে বের হয়ে পড়ে, সেই আনসারী যুবক সাহাবীও তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ও সজোরে তলোয়ারের আঘাত হানে।'

আল্লাহই ভালো জানেন যে, আমাদের দু'জনের কার আঘাতে ভণ্ডনবী মুসাইলামাতুল কাযযাব নিহত হয়েছে। ওয়াহ্শী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন :

> 'আমিই যদি তার হত্যাকারী হই, তাহলে মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে আপন ব্যক্তির যেমন আমি হত্যাকারী, তেমনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সবচাইতে ঘৃণিত পাপিষ্ঠের হত্যাকারীও আমি।'

---

ওয়াহ্শী ইবনে হারব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জীবনী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সহায়ক গ্রন্থাবলি :


১. আল ইসাবাহ : ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩১৫ পৃ.।
২. উসদুল গাবাহ ৫ম খণ্ড, ৭৩-৮৩ পৃঃ।
৩. আল ইসতিয়াব : হায়দারাবাদ সংস্করণ, ২য় খণ্ড, ৬০৮-৬০৯ পৃ.।
৪. আত তারীখুল কাবীর : ৪র্থ খণ্ড, ২য় খণ্ড : ১৮০ পৃ.।
৫. আল জামউ বাইনা রিজালিস সহীহাইন : ২য় খণ্ড, ৫৪৬ পৃ.।
৬. তাজরীদু আসমাউস সাহাবা : ২য় খণ্ড, ১৩৬ পৃ.।
৭. তাহযীবুত তাহযীব : ১১তম খণ্ড, ১১৩ পৃঃ ।
৮. আস সীরাতু লিইবনি হিশাম : সূচিপত্র দ্রষ্টব্য ।
৯. মুসনাদে আবু দাউদ : ১৮৬ পৃঃ ।
১০. আল কামিলু লি-ইবনি আসীর : ২য় খণ্ড, ১০৮ পৃঃ ।
১১. তারীখুত তাবারী : ১০ম খন্ডের সূচিপত্র দ্রষ্টব্য ।
১২. ইমতাউ আসমাঈ : ১ম খণ্ড, ১৫২-১৫৩ পৃ.।
১৩. সিয়ারু আ'লামুন নুবালা : ১ম খণ্ড, ১২৯-১৩০ পৃ.।
১৪. আল মাআরিফ লি-ইবনি কুতায়বা : ১৪৪ পৃ.।
১৫. তারীখুল ইসলাম লিযযাহাবী : ১ম খণ্ড, ২৫২ পৃ.।

# হাকীম ইবনে হিযাম (রা)

*'মক্কায় এমন চার ব্যক্তি আছে, যারা শিরকে নিমজ্জিত থাকুক- এটা আমি মোটেও চাইনি। আমি প্রতি মুহূর্তেই তাদের ইসলাম গ্রহণের জন্য উদগ্রীব থাকতাম। তাদেরই একজন হাকীম ইবনে হিযাম। - মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)*

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন এক সাহাবী সম্পর্কে আপনারা অবগত আছেন কি, যিনি পবিত্র কা'বাগৃহের অভ্যন্তরে ভূমিষ্ঠ হন?

হ্যাঁ! পবিত্র কা'বার ইতিহাসে তিনিই একমাত্র সেই স্বনামধন্য ব্যক্তি।

কা'বাগৃহের ভিতরে জন্মগ্রহণের সংক্ষিপ্ত ঘটনাটি হলো, বিশেষ এক অনুষ্ঠান বা উৎসব উপলক্ষে একদা জনসাধারণের জন্য কা'বাগৃহের দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। এই সুযোগে হাকীম ইবনে হিযাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মা এই আনন্দ-উৎসবে তার নিকটাত্মীয়া ও বান্ধবীদের সাথে কা'বাগৃহে বেড়াতে আসেন। সে সময় তিনি ছিলেন পূর্ণ গর্ভবতী। কা'বাগৃহের ভিতরে অবস্থানকালে হঠাৎ তীব্রভাবে তার প্রসব বেদনা শুরু হয় এবং তা দ্রুত বাড়তে থাকে। এমনকি সেখান থেকে বের হওয়ার সময়টুকুও তিনি পাননি। তড়িঘড়ি করে একখণ্ড চামড়ার বিছানা আনা হলে তার ওপরই তিনি সন্তান প্রসব করেন। ইতিহাসে পবিত্র ঘরের ভিতরে একমাত্র জন্মগ্রহণকারী সন্তান। উম্মুল মু'মিনীন খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার ভাতিজা হাকীম ইবনে হিযাম ইবনে খুওয়াইলিদ। তিনি মক্কার অভিজাত পরিবারে বেড়ে ওঠেন। সম্পদের

প্রাচুর্যে ভরা এই পরিবারে লালিত-পালিত হতে থাকেন। বয়স বাড়ার সাথে সাথে দেখা গেল তাঁর চরিত্রে অনেক ভালো গুণের প্রকাশ ঘটছে। তার মধ্যে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হতে থাকলো নিরহঙ্কার ও বিনয়গুণ। বালক বয়সে তাঁর মধ্যে দেখা গেল মেধার বহুমুখী স্ফুরণ, যে কারণে পরিণত বয়সে তাঁর গোত্রীয় জনগণ তাকে গোত্রীয় নেতার পদে সমাসীন করে। দীন-হীন অনাথ নিঃস্বদের পুনর্বাসন এবং দস্যুকবলিত হাজীদের সাহায্য কমিটির প্রধানের দায়িত্বও তাঁকে দেওয়া হয়। ইসলামপূর্ব যুগে বা আইয়ামে জাহিলিয়াতের যুগে বাইতুল্লাহ শরীফের উদ্দেশ্যে হজ্জ করতে আসা অনেক হাজীই দস্যুকবলিত হয়ে সর্বস্ব হারাতেন। এ হাজীদের অভাব মোচন ও আর্থিক যোগান দিতে গিয়ে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত ধনভাণ্ডার থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ দারাজ হাতে বিলিয়ে দিতেন।

তিনি বয়সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে পাঁচ বছরের বড় হওয়া সত্ত্বেও ইসলামপূর্বকালেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। বিভিন্ন বৈঠক ও সমাবেশে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে স্থান করে নিতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁর প্রতি ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিতেন। তাঁর ফুফু খাদীজাতুল কুবরার সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিয়ে হওয়ায় আত্মীয়তার এই নতুন সম্পর্ক তাদের পরস্পরের আন্তরিকতাকে আরো সুদৃঢ় করে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এ গভীরতম এবং আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্কের পরও হাকীম ইবনে হিযাম মক্কা বিজয়ের দিন পর্যন্ত নবুওয়াতের বিশ বছরের দীর্ঘ সময়েও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহ্বানে সাড়া দেননি; বরং পাশ কাটিয়ে চলতেন।

যে কোনো সচেতন ব্যক্তিমাত্রই চিন্তা করতে বাধ্য হবেন যে, হাকীম ইবনে হিযামের মতো ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তাআলা এত মেধা দিয়েছিলেন, ধনভাণ্ডার দ্বারা সমৃদ্ধ করেছিলেন, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরঙ্গ বন্ধুদের একজন ছিলেন, নিকটাত্মীয় ছিলেন, তারই তো সর্বপ্রথম ঈমান আনার এবং ইসলামের মর্মবাণী ও নবুওয়াতের প্রতি বিশ্বাস আনার কথা ছিল। কিন্তু

তিনি কেন পাশ কাটাতে থাকলেন? এ প্রশ্নের উত্তর আল্লাহই ভালো জানেন। সবই আল্লাহর ইচ্ছা। আমরা যেমন হাকীম ইবনে হিযামের বিলম্বে ইসলাম গ্রহণে বিস্মিত হই, তেমনি তিনি নিজেও এ বিলম্বের জন্য বিস্মিত হয়েছেন। তিনি যখন ইসলামে প্রবেশ করে ঈমানী চেতনায় বলীয়ান হলেন, তখন থেকে প্রায়ই তিনি নিজের অতীত জীবনের কথা চিন্তা করে অনুতপ্ত হতেন। যে দীর্ঘ জীবন তিনি শিরকে নিমজ্জিত হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করে জীবন যাপন করেছেন, তার জন্য পরিতাপ ও আফসোস করতেন। ইসলাম গ্রহণের পর একদিন তাঁকে ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখে তাঁর ছেলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন :

'আব্বাজান! আপনি কাঁদছেন কেন?'

হাকীম ইবনে হিযাম বললেন :

'আমার কান্নার কারণ বহুবিধ।

**প্রথমত**

'বিলম্বে ইসলাম গ্রহণের কারণে আমি এমন সব গুরুত্বপূর্ণ ভালো কাজ থেকে বঞ্চিত হয়েছি যে, গোটা পৃথিবীর সমপরিমাণ সোনার বিনিময়েও সে মর্যাদা লাভে সমর্থ হব না।'

**দ্বিতীয়ত**

'আল্লাহর রহমতে আমি বদর ও উহুদের যুদ্ধে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে আসি। তখন কৃতজ্ঞতাস্বরূপ শপথ করেছিলাম যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে আর কখনোই কুরাইশদের সহায়তার জন্য মক্কার সীমানা অতিক্রম করব না। কিন্তু আমি যত চেষ্টাই করে থাকি না কেন, তারা আমাকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে টেনে-হেঁচড়ে ঘর থেকে বের করেই ছেড়েছে।'

**তৃতীয়ত**

'আমি যখনই ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তখনই আমার সামনে কুরাইশ বংশে আমার মুরব্বীদের জাহেলী যুগের চিন্তা-চেতনা ও ভাবধারা এবং তাদের অনুসৃত নীতি ও পথ বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি তাদের

কুসংস্কারের কাছে অন্ধ হয়ে গিয়েছি। আহ! কি অন্যায়ই না করেছি! কতই না ভালো হতো, যদি ওসব না করতাম। খোদাদ্রোহী নেতৃবর্গ ও পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণই আমাকে ধ্বংসের অতল গহবরে নিমজ্জিত করেছে। তারপরও হে বৎস! কেন ক্রন্দন করব না?'

হাকীম ইবনে হিযাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বিলম্বে ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি যেমন আমাদের নিকট এক বিস্ময় তেমনি তাঁর নিজের কাছেও ছিল বিস্ময়, সে কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও হাকীম ইবনে হিযামের কথা চিন্তা করে অবাক হতেন। কেনই বা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাকীম-এর জন্য অবাক হবেন না? কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো এটাই চাইতেন যে, তাঁর মতো প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি দ্রুত ইসলামে দীক্ষিত হোন।

মক্কা বিজয়ের রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের বলেন :

'মক্কায় এমন চার ব্যক্তি আছে, যারা বিন্দুমাত্র শিরকে নিমজ্জিত থাকুক তা আমি মোটেও চাই না। আমি প্রতি মুহূর্তেই তাদের ইসলাম গ্রহণের জন্য আকাঙ্ক্ষিত থাকতাম।'

সাহাবীগণ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু প্রশ্ন করলেন :

'ইয়া রাসূলাল্লাহ, সেই চার ব্যক্তি কারা ?'

তিনি উত্তর দিলেন :

'আত্তাব ইবনে উসাইদ, জুবায়ের ইবনে মুত্‌ইম, হাকীম ইবনে হিযাম ও সুহাইল ইবনে আমর। আল্লাহর রহমতে পরবর্তীতে তারা সবাই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশা পূরণ হয়।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিজয়ী বেশে মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন হাকীম ইবনে হিযামের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন না করে পারেননি।

তাই তিনি তাঁর ঘোষককে এই কথা ঘোষণা করার নির্দেশ দেন :

১. 'যে সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দাহ ও রাসূল, সে নিরাপদ।

২. যে অস্ত্র সমর্পণ করে কা'বাগৃহের পাশে বসে থাকবে, সেও নিরাপদ।

৩. যে নিজ গৃহের দরজা বন্ধ করে ভেতরে অবস্থান করবে, সেও নিরাপদ।

৪. যে ব্যক্তি আবূ সুফিয়ানের বাড়িতে আশ্রয় নেবে, সেও নিরাপদ। এবং

৫. যে ব্যক্তি হাকীম ইবনে হিযামের বাড়িতে প্রবেশ করবে, সেও নিরাপদ।'

হাকীম ইবনে হিযামের বাড়ি ছিল মক্কার সমতলভূমি এলাকায় এবং আবূ সুফিয়ানের বাড়ি ছিল মক্কার পাহাড়ি টিলায়। হাকীম ইবনে হিযাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষণার মর্মবাণী পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন করেই ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি সিদ্ধান্ত নেন, প্রতি মুহূর্তের নেক আমল দ্বারা জাহেলী যুগের কৃত সমস্ত অপরাধের কাফ্ফারা আদায় করবেন। ইসলামের বিরোধিতায় তিনি যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছেন, সেই পরিমাণ অর্থ ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারণের জন্য ব্যয় করতে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। তিনি সে প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়িতও করেছিলেন। তিনি মক্কার ঐতিহাসিক 'দারুন নাদওয়া' ভবনের মালিক ছিলেন। এই 'দারুন নাদওয়া'তেই কুরাইশ নেতৃবর্গ জাহেলী যুগে তাদের পরামর্শসভা ও সম্মেলনের আয়োজন করত। এখানেই কুরাইশ সরদার ও নেতৃবর্গ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যাবতীয় ষড়যন্ত্র করার সিদ্ধান্ত নিতে একত্রিত হতো। হাকীম ইবনে হিযাম এ ঘরের অতীত স্মৃতিকে নিঃশেষ করে দিয়ে চিরমুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। অভিশপ্ত এ অতীতকে তিনি ভুলে যেতে চাইলেন। বিষাদময় স্মৃতি বিস্মৃত হতে চাইলেন। বিস্মৃতির পর্দা দিয়ে ঢেকে দিতে চাইলেন। তাই তিনি সেই নাদওয়া ভবনকে এক লক্ষ দিরহামে বিক্রি করে দিলেন। এই স্মৃতিময় ভবন বিক্রির সময় জনৈক কুরাইশ যুবক তাঁকে বলে,

'হে চাচা! কুরাইশদের অতীত স্মৃতির সর্বশেষ নিদর্শনটি বিক্রি করে দিলেন?'

হাকীম ইবনে হিযাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাকে বললেন :

'আফসোস হে বৎস! তাকওয়ার মর্যাদা ছাড়া আর সবরকম মর্যাদার অবসান হয়েছে। আমি শুধু এ কারণে এ ঘর বিক্রি করেছি যে, এর মূল্য দিয়ে জান্নাতে একটি ঘর খরিদ করব। আমি তোমাদেরকে এ ব্যাপারে সাক্ষী রাখছি যে, এর বিক্রয়লব্ধ অর্থ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য দান করলাম।'

হাকীম ইবনে হিযাম ইসলাম গ্রহণের পর প্রথম যে হজ্জ করেন সে হজ্জের উদ্দেশ্যে গমনকালে তাঁর অগ্রভাগে উজ্জ্বল মূল্যবান কাপড়ে আবৃত একশত উটের একটি বহরকে মিনার দিকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং এসব আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কুরবানী করা হয়।

দ্বিতীয় হজ্জে তিনি যখন আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করেন, তখন তাঁর সাথে একশত ক্রীতদাস ছিল। যাদের প্রত্যেকের গলায় রৌপ্যের মেডেল পরানো ছিল। তাতে লেখা ছিল, হাকীম ইবনে হিযামের পক্ষ থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আরাফাতের ময়দানে সবাইকে আযাদ করে দেওয়া হলো।

তৃতীয় হজ্জে এক হাজার বকরি, হ্যাঁ, উত্তম জাতের এক হাজার বকরি মিনাতে কুরবানী করা হয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিকল্পে মুসলমান ফকীর-মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। হুনাইনের যুদ্ধ শেষে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের কাছে গনীমতের সম্পদের আবেদন করলে তাঁকে তা দেওয়া হয়। এর পরেও তিনি আবারও আবেদন করেন, এবার আরো বাড়িয়ে দেওয়া হয়। আবারও আবেদন করেন। এবার আরো বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এভাবে এর সংখ্যা একশতটি উটে গিয়ে দাঁড়ায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেন :

'হে হাকীম! এসব মাল-সম্পদ খুবই প্রিয় ও আকর্ষণীয়, যারা তা কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করে আল্লাহ তাতে বরকত দান করেন। আর অকৃতজ্ঞ বা লোভীদের জন্য আল্লাহ তাতে কোনো বরকত রাখেননি; বরং তাদের জন্য রয়েছে শুধু অতৃপ্তি আর অতৃপ্তি। সে ঐ ক্ষুধার্ত পেটের ন্যায়, যা বারবার আহারের পরও অতৃপ্ত থাকে। হে হাকীম! জেনে রেখো, গ্রহণকারীর হাতের চেয়ে দাতার হাত সর্বদাই উত্তম।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে এই নসীহত শোনার পর হাকীম ইবনে হিযাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন :

'হে আল্লাহর রাসূল! যিনি আপনাকে সত্য দীন সহকারে প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ! আপনার পরে আর কারো কাছে কোনো প্রকার আবেদন করব না। শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আর কারো কাছ থেকে কোনো সাহায্য নেব না।'

হাকীম ইবনে হিযাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু অবশিষ্ট জীবনে তাঁর কৃত শপথকে বাস্তবে পরিণত করে দেখিয়েছিলেন।

আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খিলাফতকালে একাধিকবার রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে তাঁর নির্ধারিত অর্থ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানানোর পরও তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। এমনিভাবে উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খিলাফতকালেও রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে তাঁর নির্ধারিত অর্থ নেওয়ার জন্য আহ্বান জানানোর পর প্রথম খলীফাকে যেমন উত্তর দিয়েছিলেন, তেমনি এবারও তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। এমনকি পরিশেষে উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জনসম্মুখে এর ব্যাখ্যায় বাধ্য হয়ে ঘোষণা দেন যে :

'হে মুসলিম ভাই-বোনেরা! আমি বারবার হাকীম ইবনে হিযামকে তাঁর নির্দিষ্ট অংশ নেওয়ার জন্য অনুরোধ করে আসছি। কিন্তু তিনি বারবারই তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে আসছেন।'

এভাবেই হাকীম ইবনে হিযাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত অন্যের কাছ থেকে বা রাষ্ট্রের কাছ থেকে কোনো প্রকার অর্থ গ্রহণ করেননি।

---

হাকীম ইবনে হিযাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সহায়ক গ্রন্থাবলি :

১. আল ইসতিয়াব : ১ম খণ্ড, ৩৬৮ পৃ.।
২. আল ইসাবাহ : ১ম খণ্ড, ৩২৭ পৃ.।
৩. আল মিলালু ওয়ান নেহাল : ১ম খণ্ড, ২৭ পৃ.।
৪. তাবাকাতুল কুবরা : ১ম খণ্ড, ২৬ পৃ.।

৫. সিয়ারু আলামুন নুবালা : ৩য় খণ্ড, ১৬৪ পৃ.।
৬. যুআমাউল ইসলাম : ১৯০-১৯৬ পৃ.।
৭. হামাতুল ইসলাম : ১ম খণ্ড, ১২১ পৃ.।
৮. তারীখুল খুলাফা : ১২৬ পৃ.।
৯. সিফাতুস সাফওয়াহ : ১ম খণ্ড, ৩১৯ পৃ.।
১০. আল মাআরিফ : ৯২-৯৩ পৃ.।
১১. উসদুল গাবা : ২য় খণ্ড, ৯-১৫ পৃ.।
১২. মুহাদ্বরাতুল উদাবা : ৪র্থ খণ্ড, ৪৭৮ পৃ.।
১৩. মুরাওয়ে জুযযাহাব : ২য় খণ্ড, ৩০২ পৃ.।

# আব্বাদ ইবনে বিশর (রা)

*'তিনজন আনসারীর ফযীলত এত বেশি যে, মর্যাদায় কেউই তাদের সমকক্ষ হতে পারেনি। তারা হলেন, সা'দ বিন মুআয, উসাইদ বিন হুদাইর এবং আব্বাদ বিন বিশর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম।'*

*–উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা*

ইসলামী দাওয়াতের ইতিহাসে আব্বাদ ইবনে বিশরের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। যদি আল্লাহভীরু ব্যক্তিদের সারিতে তাঁর অবস্থান অনুসন্ধান করতে চান, তাহলে নিঃসন্দেহে তাঁকে একজন পূত-পবিত্র চরিত্রের অধিকারী, আল্লাহপ্রেমিক, তাহাজ্জুদ নামাযে আল কুরআনের বিভিন্ন অংশ তিলাওয়াতকারী আবেদ হিসেবে দেখতে পাবেন।

যদি তাঁকে বীর যোদ্ধাদের সারিতে সন্ধান করেন, তাহলেও তাঁকে অকুতোভয় বীর যোদ্ধা ও আল্লাহর কালেমা বুলন্দকারী এমন এক সাহসী যোদ্ধা হিসেবে দেখতে পাবেন, যার সমকক্ষ খুঁজে পাওয়াই দুরূহ।

এমনিভাবে, যদি তদানীন্তন ইসলামী বিশ্বের প্রাদেশিক গভর্নরদের সারিতে তাঁর অবস্থান নির্ণয় করতে চান, তাহলেও তাঁকে অত্যন্ত সফল ও  সচেতন শাসক হিসেবে দেখতে পাবেন। রাষ্ট্রীয় অর্থের আমানতদার এক বিশাল ব্যক্তিত্ব হিসেবে তাঁকে দেখা যাবে।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এবং তাঁর গোত্রের অপর দু'জন সাহাবী তাঁর প্রশংসায় বলেছেন,

'আবদুল আশহাল' গোত্রে এমন তিনজন আনসারী আছেন, যাদের ফযীলত ও মর্যাদায় সমকক্ষ হওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। তারা সবাই আবদুল আশহালের সন্তান।'

'তারা হলেন, সা'দ ইবনে মুআয, উসাইদ বিন হুদাইর এবং আব্বাদ ইবনে বিশর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম।'

ইয়াসরিবে দাওয়াতে ইসলামীর সূচনাকালে আব্বাদ ইবনে বিশর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আল আনসারী ছিলেন যৌবনদীপ্ত তরতাজা এক যুবক। তাঁর চেহারায় ছিল নিষ্পাপ লাবণ্য ও উজ্জ্বলতার ছাপ, যাঁর আচার-আচরণে প্রতিফলিত হতো যুগশ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের মতো বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতা। অথচ তাঁর বয়স তখনো পঁচিশ অতিক্রম করেনি।

ইয়াসরিবে আগন্তুক মক্কার প্রথম দাঈ ইলাল্লাহ যুবক মুসআব ইবনে উমাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাথে মিলিত হতে না হতেই পরস্পরের মধ্যে দৃঢ় ঈমানী বন্ধনের সৃষ্টি হয়। মৌলিক মানবীয় ও চারিত্রিক গুণাবলির একান্ত সাদৃশ্যের কারণে তাঁদের মধ্যে হৃদ্যতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে ওঠে।

মুসআব ইবনে উমাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সুললিত মধুর স্বরে ও আবেগময়ী সুরে কুরআন তিলাওয়াত করতে শুনে তিনিও তাঁর মতো কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন এবং তাঁর অন্ধকার অন্তরও আল কুরআনের নূরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। তাঁরা উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে, ভ্রমণে ও নিজ গৃহে অবস্থানকালে আল কুরআনের মধুর তিলাওয়াতে মগ্ন থাকতেন। যার ফলে সাহাবীদের মধ্যে তাঁরা ঈমান ও কুরআনের বন্ধু হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো এক রাতে মাসজিদুন নববী সংলগ্ন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার ঘরে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করছিলেন। মসজিদে আব্বাদ ইবনে বিশর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে সুললিত কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করতে শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে জিজ্ঞাসা করলেন :

'আয়েশা! এ কি আব্বাদ ইবনে বিশরের কণ্ঠ? জিবরাঈল আলাইহিস সালাম যেভাবে ও যে মিষ্টি স্বরে আমার ওপর কুরআন নাযিল করেন, সেই মিষ্টিস্বরে তিলাওয়াত শুনছি!'

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা উত্তর দিলেন : 'হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ।'

এটি আব্বাদের আওয়াজ নিশ্চিত হওয়ার পর তাঁর জন্য তিনি আল্লাহর দরবারে এই বলে দু'আ করলেন : 'হে আল্লাহ! তাঁর সমস্ত গুনাহ মাফ করে দাও।'

আব্বাদ ইবনে বিশর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে সংঘটিত সব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং প্রতিটি যুদ্ধেই তিনি আল কুরআনের ধারক-বাহকের যথাযোগ্য দায়িত্ব পালন করেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'যাতুর রিকা' অভিযান থেকে ফেরার পথে পাহাড়ি একটি ঘাঁটিতে রাত্রি যাপনের জন্য যাত্রাবিরতি করেন। এ যুদ্ধে কোনো এক মুসলিম যোদ্ধা যুদ্ধ চলাকালে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন প্রতিপক্ষের এক মহিলা যোদ্ধাকে বন্দী করে আনে। স্বামী এই মহিলাকে না পেয়ে লাত এবং উয্যা দেবতার কসম করে বলে :

'আমি মুহাম্মদ ও তার সাথীদের অবশ্যই অনুসরণ করতে থাকব এবং এর প্রতিশোধে রক্তপাত না ঘটানো পর্যন্ত ক্ষান্ত হব না।'

এ ঘাঁটিতে মুসলিম বাহিনী তাদের উটবহরকে নিরাপদ স্থানে বসানোর আগেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বললেন :

'আজকের রাতে পাহারার দায়িত্ব কে পালন করবে?'

আব্বাদ ইবনে বিশর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবং আম্মার ইবনে ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আরয করলেন :

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার অনুমতি পেলে আমরা দু'জনই পাহারার দায়িত্ব পালন করব।'

মদীনায় মুহাজিরগণ আগমন করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দু'জনের পরস্পরকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়েছিলেন। তাঁরা দু'জনেই সেই পাহাড়ি ঘাঁটির প্রবেশপথে এলে আব্বাদ ইবনে বিশর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর ভাই আম্মার রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বললেন :

'রাতের দু'ভাগের কোন্ ভাগে আপনি ঘুমানো পছন্দ করবেন? প্রথম ভাগে, নাকি শেষ ভাগে?"

আম্মার ইবনে ইয়াসার উত্তর দিলেন :

'রাতের প্রথম ভাগেই আমি নিদ্রা যেতে চাই। তাই আব্বাদ ইবনে বিশরের থেকে একটু দূরেই তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।'

নীরব নিস্তব্ধ রজনী। ধীরে ধীরে মৃদু-মন্দ বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে। গোটা পরিবেশ শান্ত ও স্তব্ধ। আসমানে তারকারাজি জ্বলছে। পাহাড়-পর্বত, গাছ- গাছালি আর বালুকণা সবই আল্লাহর তাসবীহ ও পবিত্রতা বর্ণনায় নিমগ্ন হয়ে পড়েছে। আব্বাদ ইবনে বিশর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মন ইবাদতের জন্য ব্যস্ত এবং কুরআন তিলাওয়াতের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল।

তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াতের চেয়ে নামাযে তিলাওয়াতে বেশি স্বাদ পেতেন। আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে নামাযে নিমগ্ন হয়ে কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমেই বেশি পুণ্য। তাই তিনি কিবলামুখী হয়ে নিয়ত করে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। মধুর স্বরে তিনি সূরা কাহ্ফ তিলাওয়াত আরম্ভ করলেন। তিলাওয়াতের স্বাদে তাঁর আত্মা এমনভাবে উদ্বেলিত হলো, যেন তা আসমানে উড়ে চলেছে। নামাযে তাঁর গভীর একাগ্রতার এক পর্যায়ে ইসলামী বাহিনীর সন্ধানে সেই ব্যক্তি দ্রুত এগিয়ে আসে। পাহাড়ি ঘাঁটির সম্মুখ দিয়ে অতিক্রমকালে দূর থেকে আব্বাদকে দণ্ডায়মান দেখে বুঝতে পারে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীরা গুহার অভ্যন্তরে রাত্রি যাপনের জন্য যাত্রাবিরতি করছেন। আর দণ্ডায়মান ব্যক্তি তাদেরকে পাহারা দিচ্ছে। সে এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে তার থলে থেকে তীরগুচ্ছ বের করে ধনুক তাক করেই সজোরে আব্বাদ ইবনে বিশরের দিকে নিক্ষেপ করল। সাথে সাথে তা আব্বাদ ইবনে বিশর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর দেহে বিদ্ধ হলো। আব্বাদ ইবনে বিশর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আস্তে করে তীরখানা তাঁর দেহ থেকে খুলে ফেলে আবার একাগ্রতার সাথে নামাযের মাধ্যমে কুরআন তিলাওয়াতে মনোনিবেশ করলেন। সেই ব্যক্তি আব্বাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর দিকে আবার তীর নিক্ষেপ করল এবং তাও তাঁর দেহে বিদ্ধ হলো। বিশর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু পূর্বের ন্যায় এ তীরটিও তাঁর দেহ থেকে খুলে তিলাওয়াত অব্যাহত রাখলেন। সে তৃতীয় বারের মতো আবার তীর নিক্ষেপ করলে পূর্বের মতো সেটিও তাঁর দেহে বিদ্ধ হলো এবং তিনি সেটিও খুলে ফেললেন। এবার আব্বাদ ইবনে বিশর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর অদূরেই ঘুমানো আম্মার ইবনে ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে এই বলে ডেকে উঠালেন যে :

'বিষাক্ত তীরের যখমে আমি নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছি।'

আম্মার রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তৎক্ষণাৎ জেগে উঠলে তীর নিক্ষেপকারী তাদের দু'জনকে দেখে পালিয়ে গেল। আম্মার রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর দৃষ্টি আব্বাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর দিকে পড়ামাত্রই দেখতে পেলেন যে, আব্বাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর তিন তিনটি যখম থেকে রক্ত ফিনকি দিয়ে

বের হচ্ছে। আম্মার রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আব্বাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বললেন :

يا سبحان اللّٰهِ هَلَّا أَيْقَظْتَنِى عِنْدَ أَوَّلِ سَهْمٍ رماك بِهِ؟

'সুবহানাল্লাহ! আপনার প্রতি প্রথম তীর নিক্ষেপ করার সাথে সাথেই কেন আমাকে জাগাননি?' আব্বাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন :

'আমি এমন একটি সূরা তিলাওয়াত করছিলাম, তাতে মোটেও চাচ্ছিলাম না যে, তার তিলাওয়াত অপূর্ণাঙ্গ থেকে যাক। আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পাহাড়ি গুহার পাহারায় আমাদের নিযুক্ত করেছেন যদি তার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা না করতাম, তাহলে সূরাটির তিলাওয়াত অপূর্ণাঙ্গ থাকার চেয়ে মৃত্যুকেই প্রাধান্য দিতাম।'

আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খিলাফতের সময় 'রিদ্দার' যুদ্ধের সূচনা হলে আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মুসাইলামাতুল কাযযাবের সৃষ্ট ফিতনার মূলোৎপাটন এবং মুরতাদদের আবার ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে এক বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করেন। আব্বাদ ইবনে বিশর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন সেই বাহিনীর অগ্রগামী নেতাদের অন্যতম। এ যুদ্ধে মুসলমানদের পারস্পরিক অনাস্থার সূত্রপাত ঘটে। আনসার ও মুহাজিরদের, গ্রাম ও শহরবাসীদের পরস্পরের প্রতি অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ– অভিমানের কারণে আশানুরূপ বিজয় সূচিত না হওয়ায় তিনি ভীষণভাবে মর্মাহত হন। যুদ্ধ করার পরিবর্তে তারা পারস্পরিক দোষারোপে লিপ্ত হওয়ায় তাঁর মনে এ আশঙ্কা বদ্ধমূল হয়ে পড়ে যে, এই ভয়াবহ ও বিভীষিকাময় যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় সম্ভব হবে না। যদি না আনসার ও মুহাজির এবং গ্রামবাসী ও শহরবাসীদের ভিন্ন ভিন্ন রেজিমেন্টে বিভক্ত না করা হয় এবং প্রত্যেক রেজিমেন্টকে নিজ নিজ জয়-পরাজয়ের জন্য দায়ী না করা যায়।

পরদিন চরম ও রক্তক্ষয়ী এ যুদ্ধ সংঘটনের আগের রাতে আব্বাদ ইবনে বিশর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু স্বপ্নে দেখেন :

'আকাশের বুককে তাঁর জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। তিনি সেখানে প্রবেশ করলে আকাশ তাঁকে তার ভিতরে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।'

সকালে আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে তাঁর এ স্বপ্নের কথা বললে তিনি তার তা'বীরে বলেন :

'হে আব্বাদ ইবনে বিশর নিঃসন্দেহে এর তা'বীর শাহাদাত ছাড়া অন্য কিছুই নয়।'

পরের দিন যুদ্ধ চরম আকার ধারণ করলে আব্বাদ ইবনে বিশর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু পাহাড়ি টিলার ওপর থেকে সকল আনসারকে তাঁর দিকে আহ্বান জানিয়ে বললেন :

'হে আনসার ভাইয়েরা! অন্য যোদ্ধাদের থেকে আলাদা হয়ে আসুন এবং তলোয়ারের কোষ ভেঙে ফেলুন, যেন এই তলোয়ার দ্বিতীয় বার তাতে ঢুকানোর প্রয়োজন না হয়। ইসলামের বিজয়কে অন্যের করুণার ওপর ছেড়ে দেবেন না।'

এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে সাবেত ইবনে কায়েস, বারাআ ইবনে মালেক এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তলোয়ার রক্ষক আবূ দুজানা আনহুমের নেতৃত্বে চারশত আনসার তাঁর পাশে সমবেত হন। আব্বাদ ইবনে বিশর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এসব সাহাবীকে নিয়ে শত্রুবাহিনীর ওপর এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লেন যে, তাতে মুসাইলামাতুল কাযযাবের সুরক্ষিত ব্যূহ ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। মুসাইলামা ও তার যোদ্ধারা যুদ্ধ-ময়দান পরিত্যাগ করে সুরক্ষিত উঁচু দেয়ালঘেরা বিশাল বাগানে আশ্রয় নেয়। মুসাইলামা ও তার যোদ্ধাদের লাশে এই বাগান ভরে গেলে এই বাগান 'হাদীকাতুল মাওত' বা 'মৃত্যুর বাগান' নামে পরিচিত হয়। সেই সুরক্ষিত প্রাচীরের ভেতরে প্রবেশের পর শত্রুবাহিনীর আক্রমণে রক্তে রঞ্জিত আব্বাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শাহাদাত বরণ করেন। যুদ্ধশেষে দেখা গেল, তাঁর সারা দেহে তলোয়ারের আঘাত, বর্শার যখম ও এমনভাবে বিদ্ধ তীরে জর্জরিত যে, তাঁকে চেনার কোনো উপায় ছিল না। পরিশেষে তাঁর শরীরের একটি চিহ্ন দেখে তাঁকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়।

---

আব্বাদ ইবনে বিশর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জীবনী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সহায়ক গ্রন্থাবলি :

১. তারীখুল ইসলাম লিয যাহাবী : ১ম খণ্ড, ৩৭০ পৃ.।
২. তাহযীবুত তাহযীব : ৫ম খণ্ড, ৯০ পৃ.।
৩. আত তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনি সা'দ : ৩য় খণ্ড, ৪৪০ পৃ.।
৪. আল মুহাব্বারু ফিত্তারীখ : ২৮২ পৃ.।
৫. সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১ম খণ্ড, ২৪৩ পৃ.।
৬. হায়াতুস সাহাবা : ১ম খণ্ড, ৭১৬ পৃ. এবং সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।

# যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা)

*'কবি হাসসান ও তাঁর ছেলে সাবেতের পরে যেমন ইলমে কাফিয়ার কোনো উল্লেখযোগ্য ইমাম নেই, তেমনি যায়েদ ইবনে ছাবেতকে বাদ দিলে ইলমে মা'আনীর বা আল কুরআনের অর্থ ও নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনেরও কোনো ইমাম নেই।'*

*–হাসসান ইবনে ছাবেত (রা)*

দ্বিতীয় হিজরীর কথা। মদীনা মুনাওয়ারায় বদর যুদ্ধের প্রস্তুতির এক পর্যায়ে লোকদের ভীড় জমে উঠেছে। আল্লাহর জমিনে তাঁরই কালেমা বুলন্দ করার লক্ষ্যে নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর ডাক দিয়েছেন। সে ডাকে সাড়া দিয়ে সশস্ত্র যোদ্ধারা উপস্থিত। সারিবদ্ধ যোদ্ধাদের শেষবারের মতো পর্যবেক্ষণ করার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এক এক করে প্রত্যেককে দেখে নিচ্ছেন। এক পর্যায়ে যার বয়স তেরোতে পৌঁছেনি, এমন একটি ছেলেকে দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁর চেহারায় ফুটে উঠছিল তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার আভাস এবং দৃঢ় মনোবলের ছাপ। তাঁর হাতে ছিল একটি তলোয়ার, যা দৈর্ঘ্যে তাঁর সমান বা তাঁর চেয়েও একটু লম্বা। তিনি তা হাতে ধারণ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে এগিয়ে এসে বললেন :

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যেহেতু নিজেকে আপনার জন্য কুরবান করে দিয়েছি, তাই আমি আপনার সাথেই এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার এবং আপনার জিহাদী পতাকার নিচে আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার অধিকার রাখি। আমাকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দিন।'

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এই দৃঢ় মনোবল ও চেতনা দেখে যেমন খুশি হলেন, তেমনি হলেন অবাক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাঁধে স্নেহভরে একটি মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন :

'সাবাস!'

তাঁর এই জিহাদী মনোভাব ও সাহসের জন্য আনন্দ প্রকাশ করলেও বয়সের স্বল্পতার জন্য জিহাদে অংশগ্রহণ থেকে তাঁকে বিরত রাখলেন। আদর-স্নেহের ভাষায় তাঁকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। বেদনাহত হয়ে যায়েদ ইবনে ছাবেত তাঁর তলোয়ার মাটিতে টেনে টেনে নিয়ে মন ভার করে বাড়ির দিকে রওয়ানা হলেন। তাঁর মনে আফসোস, ইসলামের প্রথম জিহাদে যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে সংঘটিত হচ্ছে, সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে সে বঞ্চিত হলো। তাঁর মা নাওয়ার বিনতে মালেক, সেও ছেলের এই ব্যর্থতায় গভীরভাবে মর্মাহত হয়ে ছেলের পেছনে পেছনে বাড়ি ফিরলেন। তার মনেও বিরাট আশা ছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পতাকাতলে বদরী মুজাহিদদের সাথে তার ছেলে এ জিহাদে অংশ নিয়ে যুদ্ধ করবে ও তার আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাবে। এই স্মৃতি বহন করে জীবনের বাকি দিনগুলো সে কাটিয়ে দেবে। যদি তাঁর পিতা ছাবেত আজ জীবিত থাকতেন, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন। কিন্তু এই আনসার বালক যায়েদ থেমে যাওয়ার পাত্র নয়। তাঁর প্রতিভা তাঁকে আরও এগিয়ে নিয়ে এল। বয়স কম হওয়ার জন্য যেহেতু যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভ করতে সমর্থ হননি সেহেতু তাঁর প্রতিভাকে গুরুত্বপূর্ণ এমন এক দিকে বিকাশ করার সিদ্ধান্ত নিলেন, বয়সসীমার সাথে যার কোনো সম্পর্ক নেই, যা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য ও সাহচর্য লাভের আরও অধিক সুযোগ করে দেবে। আর সেটি হলো জ্ঞানচর্চা ও আল কুরআনের হিফয-এর মাধ্যম। বালক সাহাবী যায়েদ তাঁর এই সুপরিকল্পিত কর্মসূচি তাঁর মায়ের কাছে উপস্থাপন করলেন। তাঁর মা ছেলের এই পরিকল্পনা শুনে অতীব আনন্দিত ও খুশি হলেন। এ পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন।

এক পর্যায়ে যায়েদের মা নাওয়ার ছেলের এই মনোবাসনা ও প্রচেষ্টা তাঁর গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের নজরে আনলেন এবং হিফয ও বিদ্যার্জনের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য লাভের আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে অবগত করালেন।

তারা বালক সাহাবী যায়েদকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন :

> 'হে আল্লাহর নবী! আমাদের সন্তান যায়েদ ইবনে ছাবেত। সে অদ্যাবধি আল কুরআনের ১৭টি সূরা হিফয করেছে। যেভাবে কুরআন আপনার অন্তরে অবতীর্ণ হয়েছে, ঠিক তাঁর তিলাওয়াতও এমনি প্রাঞ্জল ও নির্ভুল। তদুপরি লেখাপড়াতেও তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন। আপনার সাহচর্যের আকাঙ্ক্ষী। সে সার্বক্ষণিকভাবে আপনার খিদমতে থাকার অনুমতি চায়। আপনি এ ব্যাপারে আমাদের কথাগুলো পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।'

বালক সাহাবী যায়েদ যা কিছু হিফয করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা থেকে কিছু আয়াত তিলাওয়াত করতে বললে, যায়েদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিলাওয়াত করে শোনালেন। সে তিলাওয়াত কতই না চমৎকার, নির্ভুল, স্পষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী! আল কুরআনের প্রতিটি শব্দ এমন স্পষ্টভাবে তাঁর ঠোঁট দুটো থেকে নির্গত হতে থাকে, সে যেন আসমানের নক্ষত্ররাজির মতো স্পষ্ট ও স্বচ্ছ। শুধু বিশুদ্ধ তিলাওয়াতই নয়, কণ্ঠস্বরও এমন শ্রুতিমধুর, যা শ্রোতার অন্তরকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। অর্থের সাথে সামঞ্জস্য রেখে যেখানে থামা দরকার, সেখানে থামলেন। যেখানে থামার দরকার নেই, সেখানে তিলাওয়াত অব্যাহত রাখলেন। তাতে প্রমাণিত হচ্ছিল যে, তিনি শুধু বিশুদ্ধ তিলাওয়াতেই পারদর্শী নন, বরং আল কুরআনের অর্থ সম্পর্কেও সম্পূর্ণ জ্ঞাত। তিনি প্রমাণ করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর সম্পর্কে যতটুকু বলা হয়েছিল, প্রকৃত অর্থে তার চাইতে তিনি অনেক অনেক বেশি গুণে গুণান্বিত। বিশেষ করে আল কুরআনের অর্থ বুঝে পড়ার কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতীব আনন্দিত ও খুশি হলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রতি দৃষ্টি দিয়ে বললেন :

'যায়েদ! আমাকে সাহায্য করার জন্য ইহুদীদের ইবরানী ভাষা শেখ। কেননা, সে ভাষায় পত্রাদি বিনিময়কালে আমি যা কিছু বলি হুবহু তারা সে ভাষায় অনুবাদ করে কি না, সে ব্যাপারে আমার সন্দেহ হয়।'

বালক সাহাবী যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উত্তর দিলেন :

'আপনার নির্দেশ শিরোধার্য। আমি অবশ্যই ইবরানী ভাষা শিখে নেব, ইনশাআল্লাহ।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ পেয়ে তিনি দ্রুত ইবরানী ভাষা শেখা আরম্ভ করলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই ইবরানী ভাষায় পারদর্শী হয়ে উঠেন। ইহুদীদের উদ্দেশ্যে কিছু লিখতে চাইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে যায়েদ ইবনে ছাবেত তা লিখতেন এবং তাদের দেওয়া পত্রাদিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পড়ে শোনাতেন। ইবরানী ভাষার পর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে খুব দ্রুত সুরিয়ানী ভাষাসহ আরবের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক গোত্রের ব্যবহৃত আঞ্চলিক ভাষাও শিখে ফেললেন।

কিছুদিন যেতে না যেতে এই বালক সাহাবী যায়েদ ইবনে ছাবেত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখপাত্র হিসেবে পরিগণিত হলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর মধ্যে গাম্ভীর্য, আমানতদারী, প্রজ্ঞা ও তীক্ষ্ণ মেধার পরিচয় পেলেন, তখন তাঁকে আসমান থেকে যমীনের জন্য প্রেরিত রিসালাহ বা ওহী লেখার দায়িত্বে নিয়োজিত করলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর যখনই কোনো আয়াত বা সূরা অবতীর্ণ হতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ডেকে এনে বলতেন :

'যায়েদ! এটা লেখ। তখন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তা লিপিবদ্ধ করতেন।'

অতএব, যায়েদ ইবনে ছাবেত সর্বদাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অবতীর্ণ ওহী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

থেকেই মুখস্থ করতেন, লিপিবদ্ধ করতেন এবং কুরআনের আয়াতের পরিধি বিস্তারের সাথে সাথেই তিনিও বেড়ে উঠতে থাকেন। সর্বোপরি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র যবান মুবারক থেকেই আল কুরআনের শিক্ষা লাভ করেন ও অবতীর্ণ সূরা বা আয়াতের শানে নুযূল জেনে নেন এবং প্রতিটি আয়াতের নির্দেশিত হেদায়াতের আলোকে শরীআতের নিগূঢ় তত্ত্ব ও জটিল বিষয় সম্পর্কে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এভাবেই তিনি আল কুরআনের একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকালের পর তিনি উম্মতে মুহাম্মাদীর সর্বশ্রেষ্ঠ কুরআন বিশেষজ্ঞ হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।

আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খিলাফতের সময় বিভিন্ন সাহাবীর নিকট সংরক্ষিত কুরআনের বিক্ষিপ্ত অংশ ও সূরাসমূহ গ্রন্থাকারে একত্রিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সে উদ্দেশ্যে তাঁকেই প্রধান করে 'জামিউল কুরআন' বা কুরআন একত্রীকরণ কমিটি গঠন করা হয়।

এমনিভাবে তৃতীয় খলীফা উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সময় ইসলামের বিজয় সম্প্রসারণের এক পর্যায়ে অনারব বিজিত দেশগুলোতে আঞ্চলিক ভাষায় কুরআনের তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে উচ্চারণ ও লেখার পার্থক্য জটিল আকার ধারণ করে। উম্মতে মুহাম্মাদীকে মাসহাফুল ইমাম বা মদীনায় সংরক্ষিত কুরআনের মূল কপির সাথে সমস্ত কুরআনকে মিলিয়ে নেওয়ার এবং উক্ত কুরআনের হুবহু কপি করে সারা মুসলিম বিশ্বে সরবরাহ করার লক্ষ্যে তাঁকেই জামিউল কুরআনের এই দ্বিতীয় কমিটিরও প্রধান করা হয়। এত বড় উচ্চ সম্মানের পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তাঁর জন্য এর চেয়ে সম্মানের দায়িত্ব আর কী হতে পারে?

অকল্পনীয় জটিল পরিস্থিতিতে অনেক বিজ্ঞ পণ্ডিত ও গুণীজন যখন সমস্যার কোনো সুরাহা করতে পারতেন না, তখন আল কুরআনের তীক্ষ্ণ জ্ঞান, ফযীলত ও বরকত যায়েদ ইবনে ছাবেত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে সঠিক ও সত্য পথের দিক-নির্দেশনা দিত। যেমন হয়েছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকালের পরে বনূ সাকীফ গোত্রের সম্মেলন কক্ষে। খলীফা নিযুক্ত করার

ব্যাপারে সবাই একত্রিত হলে নিযুক্তি নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে চরম মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়। সাকীফার সেই সম্মেলনে মুহাজিরগণ বললেন,

'খিলাফতের জন্য মুহাজিরগণই উত্তম। অতএব, খলীফা আমাদের মধ্য থেকেই হওয়া উচিত।'

আনসারগণ বললেন :

'খিলাফত আনসারদের মধ্যেই হতে হবে। কারণ, প্রকৃতপক্ষে আমরাই সর্বাধিক যোগ্য।'

তৃতীয় পক্ষ বললেন,

'খলীফা আনসারদের মধ্য থেকে একজন এবং মুহাজিরদের মধ্য থেকে অন্য একজন হবেন।'

তৃতীয় পক্ষ যুক্তি প্রদর্শন করলেন এই বলে :

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত অবস্থায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজে যদি মুহাজির কোনো ভাইকে নিয়োগ করতেন, তখন কোনো আনসার ভাইকে তাঁর সহযোগী করতেন।'

খলীফা নিয়োগ নিয়ে ত্রিমুখী মত-পার্থক্যের এক পর্যায়ে ফিতনা সৃষ্টির উপক্রম হলো। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কফিন তাদের সামনে বিদ্যমান, তখন পর্যন্ত দাফনের অপেক্ষায়।

সাহাবীদের মধ্যে খিলাফত নিয়ে সৃষ্ট ঘোরতর মতবিরোধের গোঁজামিলকালে পক্ষপাতিত্বহীন এবং সবার কাছে গ্রহণযোগ্য সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনার একান্ত প্রয়োজন চরমভাবে দেখা দিল। মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্ট এই ফিতনা অংকুরেই বিনাশ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ল। সেই চরম সংকটপূর্ণ মুহূর্তে যায়েদ ইবনে ছাবেত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আল আনসারীর কণ্ঠ থেকে ঠিক সেই ধরনের আওয়ায বেরিয়ে এল। তিনি সমবেত জনগণের উদ্দেশ্যে বললেন :

'হে আনসার ভাইয়েরা! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু মুহাজির ছিলেন, তাঁর খলীফাও তাঁর মতো একজন মুহাজিরকে হতে হবে। আর আমরা যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনসার বা

সাহায্যকারী ছিলাম তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকালের পর এখন আমরা তাঁর খলীফার আনসার বা সাহায্যকারী হব। সত্য ও হকের জন্য তাঁকে সার্বিক সহযোগিতা করব।'

এ ঘোষণা দিয়েই তিনি আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর দিকে তাঁর হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন :

'ইনিই আপনাদের খলীফা, অতএব আপনারা তাঁর হাতে বায়'আত করুন।'

যায়েদ ইবনে ছাবেত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে ছায়ার মতো অনুসরণ করার ফলে কুরআন চর্চা, তার অর্থ অনুধাবন এবং নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্ঘাটনের গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জনের সৌভাগ্য লাভ করেন। যে কারণে মুসলমানদের নিকট তিনি অত্যন্ত সম্মানিত ও শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। খুলাফায়ে রাশেদীন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সংকটকালীন মুহূর্তে তাঁর কাছ থেকে পরামর্শ নিতেন এবং সাধারণ মুসলমানগণও ফাতওয়া-ফারায়েয সম্পর্কে জানতে তাঁরই শরণাপন্ন হতেন। মীরাস বণ্টন পদ্ধতি এবং ফারায়েয সংক্রান্ত যাবতীয় মাসআলা বর্ণনায় তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না।

একদা পশ্চিম দামেশকের 'জাবিয়াহ' নামক গ্রামে মুসলিম বাহিনীর বিজয় উপলক্ষে এক জন-সমাবেশে বিপুলসংখ্যক সাহাবীর উদ্দেশ্যে খালীফাতুল মুসলিমীন উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর বক্তৃতায় বলেন :

'আপনাদের কেউ যদি আল কুরআনের অর্থ, নিগূঢ় তত্ত্ব ও এর মর্ম সম্পর্কে জানতে চান, তাহলে যায়েদ ইবনে ছাবেত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিকট থেকে তা জেনে নিন।

ফিক্হ ও ফিক্হশাস্ত্রের জটিল বিষয় সম্পর্কে যদি জানতে চান, তাহলে তা মু'আয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিকট থেকে জেনে নিন।

আর যদি কেউ আর্থিক সাহায্য চান, তাহলে তা আমার কাছ থেকে চেয়ে নিন। কেননা, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুসলমানদের বাইতুল মালের সুষ্ঠু বণ্টনের ভার আমার উপর ন্যস্ত করেছেন।'

যায়েদ ইবনে ছাবেত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ইলমের সীমাহীন যোগ্যতা, গভীর পাণ্ডিত্য এবং খোদাভীরুতার কারণে সাহাবী ও তাবেঈদের জ্ঞানপিপাসুরা তাঁকে অসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তির দৃষ্টিতে দেখতেন। তদানীন্তন মুসলিম বিশ্বের 'বাহ্‌রুল উলূম' নামে খ্যাত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমাও যায়েদ ইবনে ছাবেত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে কেমন শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতেন, তার একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

একদা যায়েদ ইবনে ছাবেত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কোথাও রওয়ানা হওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করতে গেলে তৎক্ষণাৎ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা ঘোড়ার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে একহাতে ঘোড়ার লাগাম ও অন্য হাতে রিকাব বা পা রাখার কড়া বা পা দানী ধরে যায়েদ ইবনে ছাবেত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে ঘোড়ার পৃষ্ঠে আরোহণ করার সুযোগ করে দেন।

যায়েদ ইবনে ছাবেত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর এ ধরনের খিদমতের জন্য লজ্জাভরে আপত্তি করলে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা উত্তর দেন :

> 'রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের আলিমদেরকে এ ধরনের সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন।'

তৎক্ষণাৎ যায়েদ ইবনে ছাবেত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বললেন :

> 'আপনার হাতখানা একটু আমাকে দেখান তো!'

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে দেওয়ামাত্রই তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমার হাতে চুমু দিয়ে বললেন :

> 'আহলে বাইতের সদস্যদের প্রতি এভাবেই সম্মান করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন।'

যায়েদ ইবনে ছাবেত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ইনতিকালে তাঁর বুকে ধারণকৃত ইলমেরও পরিসমাপ্তি ঘটায় মুসলমানগণ আক্ষেপ ও কান্নায় ভেঙে পড়েন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন :

'আজ মুসলিম জাতির 'হিবরুল উম্মাহ' বা অবিসংবাদিত মহান জ্ঞান তাপসের ইনতিকাল হলো। আমরা আশা করছি যে, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর যোগ্যতা যেন তাঁর উত্তরসূরীর স্থান লাভ করে।'

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবি হাসসান ইবনে ছাবেত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যায়েদ ইবনে ছাবেত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মৃত্যুতে শোকগাথা রচনা করেন। তিনি তাঁর ও নিজের জ্ঞানের উপযুক্ত কোনো স্থলাভিষিক্ত না দেখে সেই শোকবাণীর সাথে নিজেকেও বলেন :

فَمَنْ لِلقَوافِى بَعْدَ حَسَّانَ وابنِهِ

ومَن لِلمعانى بَعدَ زيد بن ثابِتٍ؟

'কবি হাসসান ও তাঁর ছেলের পরে যেমন ইলমে কাফিয়ার উল্লেখযোগ্য দ্বিতীয় কেউ নেই, তেমনি যায়েদ ইবনে ছাবেত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পরেও ইলমে মাআনীর বা কুরআনের অর্থ ও তার নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনের দ্বিতীয় কোনো ইমাম নেই।

---

যায়েদ ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সহায়ক গ্রন্থাবলি :


১. আল ইসাবাহ : আত তারজামা, ২৮৮০ পৃ.।
২. আল ইসতিয়াব : বিহামিসে ইসাবাহ : ১ম খণ্ড, ৫৫১ পৃ.।
৩. গায়াতুন নিহায়াহ : ১ম খণ্ড, ২৯৬ পৃ.।
৪. সিফাতুস সাফওয়া : ১ম খণ্ড, ২৪৯ পৃঃ হিন্দুস্তান সংস্করণ।
৫. উসদুল গাবাহ : আত তারজামা, ১৮২৪ পৃ.।
৬. তাহযীবুত তাহযীব : ৩য় খণ্ড, ৩৯৯ পৃ.।
৭. তাকরীবুত তাহযীব : ১ম খণ্ড, ২৭২ পৃ.।
৮. আত তাবাকাত লিইবনি সা'দ : সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।

৯. আল মা'আরিফ : ২৬০ পৃ.।
১০. হায়াতুস সাহাবা : সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।
১১. আসসীরাতু লি-ইবনি হিশাম : সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।
১২. তারীখুত তাবারী : সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।
১৩. আখবারুল কুদাতু লিওয়াকিঈ : ১ম খণ্ড, ১০৮-১১০ পৃ.।

# রাবীআ ইবনে কা'ব (রা)

*আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট আছেন।*

রাবীআ ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর নিজের সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন :

'আমি যৌবনে পদার্পণ করেছি মাত্র, ঠিক এমন সময় ঈমানী চেতনায় আমার অন্তর উদ্ভাসিত ও ইসলামের মহত্ত্বে আমার মন ভরে গেল।'

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রথম দর্শনেই আমি প্রাণখুলে ভালোবাসতে শুরু করি। সে ভালোবাসা শুধু আমার মন-মস্তিষ্কেরই নয়, দেখতে দেখতে তা সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বিদ্যুৎ প্রবাহের ন্যায় ছড়িয়ে পড়ল। আমি সবকিছু ত্যাগ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভালোবাসায় লীন হয়ে গেলাম।'

একদিন নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করলাম :

'আল্লাহ তোমার ওপর করুণা বর্ষণ করুন। কারণ, তুমি ধ্বংসের পথে চলেছ। শুধু মনে মনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসার পরিবর্তে তাঁর খিদমতে কেন নিজেকে নিয়োজিত করছ না? তুমি নিজেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদেম হিসেবে নিয়োগের অনুরোধ কেন জানাও না? যদি তিনি তোমার এ অনুরোধে রাজি

হয়ে যান, তাহলে এর অধিক তুমি কী চাও? তাহলে তাঁর সাহচর্যে তুমি যেমন নিজেকে ধন্য করবে, তেমনি তাঁর ভালোবাসার দাবিতে উত্তীর্ণ হবে এবং দীন-দুনিয়ার সর্বোৎকৃষ্ট কল্যাণে নিজেকে ধন্য করতে পারবে।'

অনতিবিলম্বে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে নিজেকে তাঁর খিদমতে পেশ করে আমার আবেদন মঞ্জুরির জন্য অনুরোধ জানালাম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নিরাশ করলেন না। তাঁর খাদেম হিসেবে আমাকে গ্রহণ করলেন। সেদিন থেকেই আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছায়ার মতো অনুসরণ করতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে যেতেন আমিও তাঁর সাথে সেখানে যেতাম। যখন যে নির্দেশ দিতেন, সে নির্দেশ পালনে সর্বক্ষণ সচেষ্ট থাকতাম। আমার দিকে তাঁর দৃষ্টি নিক্ষেপ মাত্রই তৎক্ষণাৎ বিনীত মস্তকে তাঁর নিকট গিয়ে উপস্থিত হতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কোনো প্রয়োজনে আমাকে সবসময় উপস্থিত পেতেন। সারা দিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত থাকতাম। সারাদিনের কর্মব্যস্ততা শেষে ইশার নামাযান্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর হুজরা মুবারকে ফিরতেন, তখন আমিও বাড়ি ফেরার চিন্তা করতাম। কিন্তু হঠাৎ করে আমার মন ভেতর থেকে আবার আমাকে প্রশ্ন করে বসল :

'হে রাবীআ, কোথায় চলেছ? রাতে যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে?'

অতএব, আমি তাঁর হুজরার দরজায় বসে থাকতাম। কোনোক্রমেই দরজার নিকট থেকে কোথাও যেতাম না। দেখতাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বিরাট এক অংশ ইবাদাত-বন্দেগীতে নিমগ্ন থাকতেন। কখনো কখনো আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করতে শুনতাম। তিনি অনেক সময় পর্যন্ত বারবার তা তিলাওয়াত করতেন। কোনো কোনো সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পড়তে শুনতাম 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' (আল্লাহ তাঁর প্রশংসাকারীর দু'আ কবুল করেন) কখনো দীর্ঘ সময় পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার

পুনরাবৃত্তি করতে শুনতাম। এমনকি এভাবে কখনো তন্দ্রায় ঢলে পড়তাম আবার কখনো বা ঘুমিয়ে পড়তাম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল, যদি কোনো উপকারী তাঁর জন্য কিছু করত, তাহলে তিনি প্রতিদান হিসেবে তার চেয়ে উত্তম কিছু দিতেন। তার জন্য আমার এ খিদমতের বদলাস্বরূপ আমাকেও উত্তম কিছু দেবার ইচ্ছা পোষণ করলেন। একদিন আমার কাছে এসে সম্বোধন করলেন :

'হে রাবীআ ইবনে কা'ব !'

আমি জবাব দিলাম :

'আমি উপস্থিত, আল্লাহ আপনাকে ধন্য করুন, আপনার কল্যাণ করুন।'

তিনি বললেন :

'আমার কাছে কিছু চাও, আমি তোমাকে তা-ই দিতে প্রস্তুত, যা তুমি চাও।'

আমি একটু চিন্তা করেই বললাম :

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে একটু সময় দিন, আপনার নিকট কী চাইব তা একটু চিন্তা করে বলব।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

'ঠিক আছে। আমি সে সময় দিলাম।'

আমি চিন্তা করতে লাগলাম :

'আমি একজন যুবক, আমার অর্থ-সম্পদ, আত্মীয়-স্বজন এবং বাড়িঘর কিছুই নেই। অন্যান্য দরিদ্র ও অভাবী সাহাবীদের সাথে আমিও মসজিদে সুফফায় থাকছি। লোকজন আমাদেরকে 'ইসলামের মেহমান' বলে সম্বোধন করছে। যদি কোনো মুসলমান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সদকার অর্থ নিয়ে আসে, তিনি পুরোটাই আমাদের জন্য পাঠিয়ে দেন। আর যদি কোনো হাদিয়া নিয়ে আসেন, সেখান থেকে সামান্য কিছু রেখে বাকিটাও আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেন। আমি এই অভাব-অনটন থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে দুনিয়ার কিছু কল্যাণের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছু পাওয়ার ইচ্ছা করলাম, যেন স্বাবলম্বী হয়ে আমিও সম্পদশালীদের মতো হতে পারি।'

কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তা করে মনে মনে বললাম :

'হে রাবীআ ইবনে কা'ব! তুমি ধ্বংসের পথে পা বাড়িয়েছ। তোমার ধ্বংস অবধারিত। তোমার ধনসম্পত্তি ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসশীল। এখানে তোমার জন্য আল্লাহ যা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তা তুমি অবশ্যই পাবে।'

নিঃসন্দেহে আল্লাহর কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ মর্যাদা ও সম্মান রয়েছে, যে কারণে মহান আল্লাহর দরবারে তাঁর কোনো দোআ প্রত্যাখ্যাত হয় না। অতএব, তাঁর কাছ থেকে পরকালের মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য যা পারো চেয়ে নাও। পরকালীন মঙ্গল ও কল্যাণের দু'আ নেওয়ার ব্যাপারে মনের অন্তস্তল থেকেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন :

'রাবীআ কী বলতে চাও?'

আমি আরয করলাম :

'হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কাছে আমার একমাত্র আরয, আপনি আমার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করুন, তিনি যেন জান্নাতে আপনার বন্ধু হিসেবে আমাকে ধন্য করেন।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে স্নেহভরে জিজ্ঞাসা করলেন :

'তোমাকে কে এই পরামর্শ দিয়েছে?'

উত্তরে আরয করলাম :

'আল্লাহর শপথ করে বলছি, এ ব্যাপারে কেউ আমাকে কোনো পরামর্শ দেয়নি। প্রকৃতপক্ষে আপনি যখন আমাকে বলেছিলেন যে, কিছু চাও, যা চাইবে তা-ই তোমাকে দেব। তখন মনে মনে দুনিয়ার ধন-সম্পদের ব্যাপারে চাওয়ার চিন্তা করলাম। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই আল্লাহ তাআলা আমাকে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ধনসম্পদের মোহ ত্যাগ করে পরকালের চিরস্থায়ী মঙ্গল ও কল্যাণ চাওয়ার জন্য অন্তরকে প্রশস্ত করে দিলেন। তাই আপনার কাছে আরয করলাম যে, আল্লাহর কাছে দু'আ করুন, যেন জান্নাতে আমি আপনার বন্ধু হতে পারি।'

আমার উত্তর শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘক্ষণ নীরব রইলেন।

অতঃপর তিনি বললেন :

'রাবীআ! এ ছাড়া অন্য কিছু?'

উত্তরে আরয করলাম :

'এ ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি যা চেয়েছি, দুনিয়ার অন্য কিছুকে তার সমকক্ষ মনে করব না।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

'তাহলে অধিক সিজদায় আমাকে সাহায্য কর।'

এরপর থেকেই দুনিয়াতে তাঁর খিদমতে ও সাহচর্যে যেমন নিজেকে ধন্য করেছি, জান্নাতেও তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সাহচর্যের আশায় কঠোর ইবাদাত-বন্দেগীতে নিমগ্ন হয়ে পড়লাম। কিছুদিন যেতে না যেতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন :

'হে রাবীআ বিয়ে করবে না?'

আমি বললাম :

'হে আল্লাহর রাসূল! আপনার খিদমতের পথে বাধা হয় এমন কোনো কাজ আমি করব না। তা ছাড়া স্ত্রীর মহরানা দেওয়ার মতো ও পারিবারিক জীবনের দায়ভার বহনের আর্থিক সঙ্গতিও আমার নেই।'

আমার এ উত্তর শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরবতা অবলম্বন করলেন। এমনিভাবে অন্য একদিন আবার  আমাকে প্রশ্ন করলেন :

'হে রাবীআ! বিয়ে করবে না?'

আমি পূর্বের কথার পুনরাবৃত্তি করলাম। কিন্তু সেখান থেকে চলে আসার পর কেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পূর্বের ন্যায় উত্তর দিলাম, ভেবে লজ্জিত হতে থাকলাম এবং মনে মনে ভাবলাম :

'রাবীআ! তোমার দুর্ভাগ্য, নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার চেয়ে ভালো জানেন। তোমার দীন ও দুনিয়ার কল্যাণ কিসে নিহিত রয়েছে তা এবং তোমার সামর্থ্য সম্পর্কেও তিনি সম্পূর্ণ জ্ঞাত।'

মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম। এরপর যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় বিয়ের প্রস্তাব দেন, তাহলে সম্মতি প্রদান করব। কিছুদিন যেতে না যেতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আবার বললেন :

'রাবীআ তুমি বিয়ে করবে না?'

এবার উত্তরে আরয করলাম :

'হে আল্লাহর রাসূল! জী হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ করব; কিন্তু আমার কাছে কে মেয়ে বিয়ে দেবে? আমার অবস্থা তো আপনি ভালোভাবেই অবগত।'

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার এক গোত্রের নাম উল্লেখ করে বললেন :

'সেই গোত্রের সেই ব্যক্তির নিকট চলে যাও। সেখানে গিয়ে তাকে বলো, আপনার অমুক মেয়েকে আমার সাথে বিয়ে দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন।'

আমি লজ্জাজড়িত অবস্থায় উক্ত গোত্রে গিয়ে পৌঁছে বললাম :

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আপনার কাছে এই জন্য প্রেরণ করেছেন, যেন আপনার অমুক মেয়েকে আমার কাছে বিয়ে দেন।'

তিনি প্রশ্ন করলেন, অমুক মেয়ে?

আমি বললাম :

'জী হ্যাঁ, অমুক মেয়ে।'

তিনি বললেন :

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মারহাবা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরিত ব্যক্তিকেও মারহাবা! আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরিত ব্যক্তির উদ্দেশ্য সফল না হয়ে সে ফেরত যাবে না।'

তারা সেই প্রস্তাবিত মেয়ের সাথে আমাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে ফিরে এসে আরয করলাম :

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! নিঃসন্দেহে উত্তম পরিবারের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক করে এলাম। তারা আমার কথাতেই পূর্ণ আস্থা স্থাপন করে আমাকে স্বাগত জানিয়ে তাদের মেয়ের সাথে আমাকে বিয়ে দিয়েছেন; কিন্তু তাদের মেয়ের মহরানা কোথা থেকে পরিশোধ করব?'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বনূ আসলাম গোত্রপতি 'বুরাইদা ইবনে আল খাসিব'কে ডেকে পাঠান এবং তাঁকে নির্দেশ দেন :

'তুমি রাবীআর জন্য খেজুরের আঁটি পরিমাণ সোনা সংগ্রহ কর।'

তিনি আমার পক্ষ থেকে মহরানা পরিশোধের জন্য তা সংগ্রহ করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন :

'এই সোনার টুকরোটি নিয়ে তাদের কাছে গিয়ে বলো যে, এ আপনাদের মেয়ের মহরানা।'

আমি তা নিয়ে সেখানে গেলাম এবং তা তাদের খিদমতে পেশ করলাম। তারা অত্যন্ত আনন্দের সাথে তা গ্রহণ করলেন এবং খুশিতে বলতে লাগলেন :

'অনেক উত্তম। অনেক উত্তম!'

সেখান থেকে ফিরে এসে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, তাদের চেয়ে সম্মানিত কোনো লোকদের আমি আজ পর্যন্ত দেখিনি। এই সামান্য কয়েক রতি সোনা যা তাদেরকে দিয়েছি, তাতেই তারা খুশিতে বলতে লাগল :

'অনেক উত্তম! অনেক উত্তম!'

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলাম :

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! ওয়ালীমা করার মতো আমার কিছুই নেই।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে নির্দেশ দিলেন :

'রাবীআর ওয়ালীমার উদ্দেশ্যে একটি বকরি ক্রয়ের জন্য কিছু অর্থ সংগ্রহ কর।'

তিনি আমার জন্য বিরাট মোটাতাজা একটি খাসি ক্রয় করে আনলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন :

'তুমি গিয়ে উম্মুল মুমিনীন আয়েশাকে বলো, বাসায় যে যৎসামান্য যব আছে তা যেন তোমার ওয়ালীমার জন্য দিয়ে দেন।'

আমি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার খিদমতে উপস্থিত হই এবং তাঁর ঘরে যে যব আছে তা আমার ওয়ালীমার জন্য দেওয়ার কথা জানাই। তিনি বলেন, যবের এই পাত্রখানা নাও। এখানে সাত সা' পরিমাণ যব রয়েছে। আল্লাহর শপথ করে বলছি, এই যব ছাড়া আমাদের ঘরে অন্য কোনো খাবার নেই।

আমি খাসি ও যব নিয়ে আমার শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হলাম। তারা বললেন :

'আমরা এই যব দ্বারা রুটি তৈরির দায়িত্ব নিচ্ছি। আর তুমি খাসিটি তোমার বন্ধু-বান্ধবদের কাছে নিয়ে যাও, তারা তা তৈরি করে দিক।'

খাসিটা নিয়ে আমার গোত্রের ভাইদের কাছে এলাম। আমি এবং তারা মিলে তা যবেহ করে রান্না করলাম। ওয়ালীমার জন্য আমাদের গোশত ও রুটি প্রস্তুত হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাওয়াত দিলাম। তিনি আমার দাওয়াত গ্রহণ করলেন। সুন্দর ও আনন্দঘন পরিবেশে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলো।

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জমির পাশেই আমার জন্য একখণ্ড জমি বরাদ্দ করলেন। দেখতে দেখতেই দুনিয়া আমাকে গ্রাস করে ফেলল। এমনকি একটি খেজুর গাছকে কেন্দ্র করে আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়লাম। আমি খেজুর গাছের দাবি করে বললাম, সেটা আমার সীমানায় :

'আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দাবি করলেন যে, সেটি তাঁর সীমানায়। এমনকি একে কেন্দ্র করে তাঁর সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হলাম।'

পরিণতিতে তিনি হঠাৎ আমার সম্পর্কে একটা আপত্তিকর কথা বলে ফেললেন এবং পরক্ষণেই লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে তিনি আমাকে বলতে থাকলেন :

'হে রাবীআ! তুমিও আমার ব্যাপারে একই রকম কথা বল, যেন তা কিসাস হয়ে যায়।'

আমি বললাম :

'আল্লাহর শপথ! আমি তা বলতে পারি না।'

তিনি তাঁর অনুরোধের এক পর্যায়ে বললেন :

'তুমি যদি আমার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ না কর, তবে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে তোমার বিরুদ্ধে এ দুনিয়াতে প্রতিশোধ গ্রহণ না করার অভিযোগ করব।'

এ বলে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে রওয়ানা হলেন। আমিও তাঁর পিছনে পিছনে চলতে থাকলাম এবং আমার পিছনে পিছনে আমার বনূ আসলাম গোত্রের লোকজন রওয়ানা হলো। তারা বলাবলি করতে লাগল :

'সে-ই আগে বিবাদে লিপ্ত হয়েছে। তোমার প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করেছে– তা সত্ত্বেও সে-ই আবার তোমার বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অভিযোগ করতে চলল!'

আমি তাদের উদ্দেশ্যে বললাম :

'তোমাদের প্রতি ধিক্কার! তোমরা কি জান, তিনি কে? তিনি হলেন সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু। মুসলমানদের বয়োবৃদ্ধ শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি। তিনি তোমাদের দেখার আগেই তোমরা ফিরে যাও। তিনি হয়তো এটা মনে করতে পারেন যে, তোমরা তাঁর বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করতে এসেছ। এভাবে তিনি ক্রুদ্ধ হতে পারেন এবং তাঁর ক্রুদ্ধ হওয়ার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তোমাদের প্রতি বিরক্ত হতে পারেন। আমরা সবাই তাদের দু'জনের রাগের কারণে আল্লাহর বিরাগভাজন হতে পারি। ফলে হয়তো রাবীআ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। কাজেই তোমরা আগেভাগেই চলে যাও।'

আমার অনুরোধে তারা সবাই চলে যায়।

এরপর আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে হুবহু উক্ত ঘটনার বিবরণ দেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা তুলে আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন :

'রাবীআ তোমার ও সিদ্দীকের মধ্যে কী হয়েছে ?'

আমি উত্তর দিলাম :

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি যে কটুবাক্য প্রয়োগ করেছেন তাঁর প্রতি অনুরূপ কটুবাক্য প্রয়োগ করার জন্য আমাকে চাপ দিচ্ছেন। অথচ আমি তা করতে চাচ্ছি না।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

'উত্তম, সে যা বলেছে, তুমি কখনও তার প্রতি অনুরূপ বাক্য প্রয়োগ করো না; বরং তুমি তাঁর উদ্দেশ্যে বলো, আল্লাহ আবূ বকরকে ক্ষমা করে দিন।'

আমি বললাম :

'হে ভাই আবূ বকর, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করে দিন।'

আমার এই দু'আ শুনে তিনি কাঁদতে কাঁদতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে বিদায় নিলেন এবং বলতে থাকলেন :

'হে রাবীআ ইবনে কা'ব! আমার পক্ষ থেকে আল্লাহ তোমাকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন। আমার পক্ষ থেকে আল্লাহ তোমাকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন।'

---

রাবীআ ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জীবনী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সহায়ক গ্রন্থাবলি :


১. উসদুল গাবা : ২য় খণ্ড, ১৭১ পৃ.।
২. আল ইসাবাহ : ১ম খণ্ড, ৫১১ পৃ.।
৩. আল ইসতিয়াব : ১ম খণ্ড, ৫০৬ পৃ.।
৪. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৩৩৫-৩৩৬ পৃ.।
৫. কানযুল উম্মাল : ৭ম খণ্ড, ৩৬ পৃ.।
৬. আত তাবাকাতুল কুবরা : ৪র্থ খণ্ড, ৩১৩ পৃ.।
৭. মুসনাদে আবু দাউদ : ১৬১-১৬২ পৃ.।
৮. তারীখুল খুলাফা : ৫৬ পৃ.।

# আবুল আস ইবনে আর রাবীঈ (রা)

*'আবুল আস আমাকে যে কথা দিয়েছিল তা সত্যে পরিণত করেছে এবং আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তাও যথাযথভাবে পালন করেছে। – মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)*

আবুল আস ইবনে রাবীঈ আল আবশামী আল কুরাইশী সবেমাত্র যৌবনে পদার্পণ করতে যাচ্ছেন। তাঁর সুস্বাস্থ্য, লাবণ্যময় ও দৃষ্টিনন্দিত চেহারা সবারই দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে। ভোগ-বিলাসের জীবনে প্রাচুর্যও যেন উপচে পড়ছে। আরব সভ্যতা ও কৃষ্টি-ঐতিহ্যের প্রতিফলন যেন ঘটছে এ চেহারায়। ভদ্রতা, নম্রতা, শিষ্টাচার, মধুর ব্যবহার ও নীতি-নৈতিকতার সে এক মূর্তপ্রতীক, এক বিরল দৃষ্টান্ত। সম্মান ও মর্যাদার গৌরব সবটাই তার পৈতৃকসূত্রে প্রাপ্ত। তার বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা যেন আরবের ভবিষ্যৎ নেতারই পূর্বাভাস।

উত্তরাধিকার সূত্রেই আবুল আস কুরাইশদের গ্রীষ্ম ও শীতকালীন বহির্বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ লাভ করে। নিয়মিতভাবে তাঁর বাণিজ্যিক উটবহরের বিরাট কাফেলা মক্কা ও সিরিয়ায় যাতায়াত করত। যে কাফেলায় ১০০টি উট ও ২০০ জন উট পরিচালক থাকত। তাঁর আমানতদারী, সত্যবাদিতা, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা ছিল পরীক্ষিত। এ জন্য তাঁর তত্ত্বাবধানে লোকজন ব্যবসার উদ্দেশ্যে নির্দ্বিধায় তাদের সম্পদ বিনিয়োগ করত।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনসঙ্গিনী উম্মুল মুমিনীন খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ ছিলেন তাঁর খালা। তিনি নিজ সন্তানের মতোই তাঁকে ভালোবাসতেন। খাদীজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার আদর-স্নেহ যেমন ছিল

আবুল আসের জন্য অন্তর-নিংড়ানো, তেমনি ঘরের দ্বারও ছিল সর্বদা তাঁর জন্য উন্মুক্ত। সেও খাদীজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে অতীব ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্নেহ-ভালোবাসাও তাঁর প্রতি কোনো অংশে কম ছিল না। এভাবে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর অতিবাহিত হচ্ছিল। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে এলো প্রথম কন্যা যয়নাব, সেও যেন ফুলের সৌরভের মতোই ঘরকে সুবাসিত করতে লাগল। দৃষ্টিনন্দিতা ধীরে ধীরে বেড়ে উঠতে থাকল। বিয়ের বয়স হলো। মক্কার সব পরিবারের যুবকের নজর পড়ল যয়নবের দিকে। সে ছিল দেখতে যেমন অতুলনীয় সুন্দরী, চাল-চলন, চরিত্র ও পারিবারিক মর্যাদায়ও ছিল যুগশ্রেষ্ঠ। যয়নবের দিকে কুরাইশ যুবকদের লোভনীয় দৃষ্টি পড়লে কী হবে? যয়নবের খালাত ভাই আবুল আস ইবনে রাবীঈর সাথেই যে তাঁর বিবাহ নিশ্চিত। তাই এ ব্যাপারে কেউই মুখ খুলতে পারছিল না।

যয়নব বিনতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আবুল আস ইবনে রাবীঈর বিবাহের মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই মক্কার সর্বত্র ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়ল। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দীনে হকসহ তাঁর প্রেরিত রাসূল হিসেবে ঘোষণা করেন। তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়, তিনি যেন তাঁর নিকটাত্মীয় ও আপনজনকে ভ্রান্ত পথ থেকে ফিরিয়ে আনেন। দীনে হকের দাওয়াতে মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম যিনি ঈমান গ্রহণ করেন, তিনি হলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনসঙ্গিনী খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এবং তাঁর কন্যা যয়নব, রুকাইয়া, উম্মু কুলসুম এবং ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুন্না। যদিও তাদের মধ্যে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা একবারেই ছোট্ট ছিলেন।

আবুল আস মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামাতা। এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁর বাপ-দাদাদের পৌত্তলিক জীবনধারা থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করাকে মোটেও পছন্দ করল না। যয়নব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার সাথে মধুর দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করতে থাকলেও আবুল আস কিন্তু তখনো ইসলাম গ্রহণ করেনি। অপরদিকে যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা তাওহীদের আলোকে পরিপূর্ণভাবে ইসলামী জীবনযাপন করছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কুরাইশদের সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটলে তারা আবুল আসের পরিবারকে এই বলে চাপ প্রয়োগ করতে মনস্থ করল যে :

'ধিক্কার তোমাদের প্রতি! তোমরা নিজ ছেলেকে মুহাম্মদের মেয়ের সাথে বিয়ে করিয়ে নিজ ঘরে এনে বহাল তবিয়তে ঘর-সংসার করাচ্ছ। যদি যয়নবকে তাঁর বাপের ঘরে ফেরত পাঠানো হয়, তাহলেই সামাজিক চাপে মুহাম্মদ কুরাইশদের প্রতি অবশ্যই নতি স্বীকার করবে।'

কোনো কোনো উৎসাহী বলল : 'বাহ্! কতই না চমৎকার প্রস্তাব!'

তারা আবুল আসের কাছে গিয়ে এ প্রস্তাব পেশ করল যে :

'হে আবুল আস! তোমার জীবনসঙ্গিনীকে তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দাও এবং তাকে তার পিতার কাছে ফেরত পাঠাও। আমরা কুরাইশ বংশের সর্বোত্তম, সবচেয়ে রূপবতী ও গুণবতী মেয়ের সঙ্গে তোমার বিবাহের ব্যবস্থা করে দেব।'

আবুল আস তাদেরকে উত্তরে বলে :

'আল্লাহর শপথ, আমি কখনো আমার স্ত্রীকে আমার থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারি না। তাঁর বিনিময়ে কুরাইশদের কেন? যদি সারাবিশ্বের সবচেয়ে রূপবতী ও গুণবতী বিশ্ব সুন্দরী মেয়েকেও দেওয়া হয়, তবুও না।'

পরিকল্পনা মোতাবেক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপর দুই কন্যা রুকাইয়া ও উম্মু কুলসুম রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে তালাক দিয়ে তাদের পিত্রালয়ে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে তাদের শিরকের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ায় খুবই আনন্দিত হলেন। অপর দু'জনের মতো আবুল আসও যদি তাঁর মেয়ে যয়নবকে ফেরত দিত, তবে কতই না ভালো হতো! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ইচ্ছা পোষণ করতে থাকলেও যয়নবকে ফেরত আনতে বাস্তবে কোনো তৎপরতা দেখাননি বলে যয়নব স্বামীর গৃহেই থেকে গেলেন। তখন পর্যন্ত মুশরিকদের সাথে ঈমানদার মহিলাদের বিবাহ বিচ্ছেদের কোনো আসমানী নির্দেশ নাযিল হয়নি বলে এ ব্যাপারে তিনি নির্দেশের অপেক্ষা করতে লাগলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরত করে চলে আসার পর পরিস্থিতি দ্রুত খারাপ হতে থাকে। কুরাইশরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে বদরের যুদ্ধে বের হলে তাদের সাথে আবুল আসকে অংশগ্রহণের জন্য বাধ্য করা হয়। সে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের সাথে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বা মুশরিকদের বিজয়ী হিসেবে দেখা, এর কোনো একটির প্রতিও তার আগ্রহ ছিল না। তবুও তাকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হয়। এর মানে পরিস্থিতি তাকে বাধ্য করে। বদরের ময়দানে সংঘটিত যুদ্ধে কুরাইশরা চরমভাবে পরাজিত হয়। তাদের গর্ব-অংহঙ্কার ভূলুণ্ঠিত হয়। বিজয়ের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা পরাজয় ও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এ যুদ্ধে মূলত কুরাইশদের মেরুদণ্ডই ভেঙে যায়। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী তাদের একাংশ নিহত হয়। অপর একটি অংশ যুদ্ধবন্দী হয়। অবশিষ্টরা পালিয়ে যায়।

যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে যয়নব বিনতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বামী আবুল আস ছিল অন্যতম। যুদ্ধবন্দীদের মুক্তির জন্য বন্দীদের আর্থিক যোগ্যতা, সামাজিক মর্যাদা ও স্ব-স্ব গোত্রে তাদের নেতৃত্ব-কর্তৃতের দিকে লক্ষ্য রেখে এক হাজার দিরহাম থেকে চার হাজার দিরহাম পর্যন্ত মুক্তিপণ নির্ধারণ করা হয়। কুরাইশ যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দেওয়ার এ সুযোগে যুদ্ধবন্দীদের আত্মীয়-স্বজনদের পক্ষ থেকে খবরা-খবর আদান-প্রদান, দেখা-সাক্ষাৎ ও নির্ধারিত মুক্তিপণ প্রদানের উদ্দেশ্যে যাতায়াত শুরু হয়ে যায়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথম কন্যা যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহার স্বামী আবুল আস-এর জন্যেও দূতের মাধ্যমে নির্ধারিত মুক্তিপণ পাঠানো হলো। আর তা ছিল যয়নব রাদিয়াল্লাহু তাআলার আনহার বিবাহ অনুষ্ঠানে তাঁর মা খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ যে হারটি তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন, মুক্তিপণ হিসেবে যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা সেটিকেই দূতের হাতে তুলে দিলেন।

যথারীতি আবুল আস-এর জন্য মুক্তিপণ হিসেবে যয়নবের দূত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে সেই হারখানি পেশ করামাত্রই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়তমা জীবনসঙ্গিনী খাদীজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার কথা মনে পড়ে গেলে তিনি আপ্লুত হয়ে পড়লেন। তাঁর নূরানী চেহারায় শোকের ছায়া পড়ে গেল। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে দায়িত্ব পালনরত সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বললেন :

> 'আমার বড় মেয়ে যয়নব তার স্বামী আবুল আসকে মুক্তির লক্ষ্যে মুক্তিপণ পাঠিয়েছে। যদি তোমরা ভালো মনে কর, তাহলে বন্দীকে মুক্তি দাও এবং

মুক্তিপণ হিসাবে প্রেরিত 'হারখানিও' ফেরত পাঠাও। এতে আমি বড়ই আনন্দিত হব।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কণ্ঠে এ কথা শোনামাত্রই সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম বলে উঠলেন :

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার অন্তরকে আমরা ব্যথায় ভারাক্রান্ত না রেখে মুহূর্তে আনন্দিত করতে চাই। এখনি আমরা আবুল আসকে মুক্ত করে দিচ্ছি ও যয়নব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার কাছে হারটি ফেরত পাঠাচ্ছি।'

আবুল আসকে মুক্ত করার পূর্বে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রতি শর্তারোপ করলেন :

'অনতিবিলম্বে যয়নবকে যেন তাঁর নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হয়।'

আবুল আস মুক্ত হয়ে মক্কায় পৌঁছামাত্রই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কৃত তার প্রতিশ্রুতি কোনোরূপ কালবিলম্ব না করে বাস্তবায়ন করে। সে বাড়িতে পৌঁছেই স্ত্রী যয়নবকে সফরের প্রস্তুতির নির্দেশ দেয়। তাঁকে এ কথা বলেও আশ্বস্ত করে যে :

'তাঁকে মদীনায় নিয়ে যাওয়ার জন্য মক্কার সন্নিকটে তাঁর পিতার প্রেরিত লোকজন অপেক্ষা করছে।'

আবুল আস স্ত্রীর জন্য সফরের সাজ-সরঞ্জামাদি ও তাঁর আরোহণের জন্য উট প্রস্তুত করল। যয়নবের সফরসঙ্গী হিসেবে তাঁর ছোট ভাই আমর ইবনে রাবীঈকে সাথে দিল। তাঁর পক্ষ থেকে যয়নব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরিত লোকদের হাতে সোপর্দ করার জন্য দায়িত্ব দিল।

আমর ইবনে রাবীঈ বড় ভাই আবুল আসের নির্দেশ পাওয়ামাত্রই তীর-ধনুকে সজ্জিত হলো। অতিরিক্ত তীরের একটা বস্তাও কাঁধে ঝুলিয়ে নিল। যয়নব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে উটের পিঠে আরোহীদের বসার হাওদায় বসানোর পর সে দিনে-দুপুরে প্রকাশ্যভাবে কুরাইশদের সামনেই মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো। যয়নবকে নিয়ে মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার এ চিত্র দেখে মক্কাবাসী হতভম্ব হয়ে গেল। হিংসা-বিদ্বেষের আগুন যেন তাদের জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছিল। তারা দু'জনকে ধাওয়া করার উদ্দেশ্যে ছুটে গেল।

তারা মক্কার অদূরেই তাদের গতিরোধ করে। তারা যয়নব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে আতঙ্কিত করে তুলল। তাঁর জীবননাশের একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সৃষ্টি করল।

এ পরিস্থিতিতে যয়নবের সফরসঙ্গী আমর কোনো রকম দুর্বলতার শিকার না হয়ে তাদের দিকে তীর-ধনুক তাক করে দাঁড়িয়ে গেল এবং বস্তার তীরগুলো মাপ মতো সামনে ছড়িয়ে হুংকার দিয়ে বলল :

> 'আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, খবরদার! তোমাদের কেউই যয়নবের দিকে অগ্রসর হতে চেষ্টা কর না। যদি কেউ চেষ্টা কর, তাহলে সে অবশ্যই আমার তীর দ্বারা বিদ্ধ হবে।'

আমাকে একজন দক্ষ তীরন্দায হিসেবে তোমরা মক্কার ছোট-বড় সবাই জান। পরিস্থিতি চরম মারমুখী রূপ নিলে কুরাইশ নেতা আবূ সুফিয়ান আমরের কাছে এসে তাকে অনুরোধ করে :

> 'ভাতিজা! তোমার তীর-ধনুক কিছুক্ষণের জন্য নিষ্ক্রিয় রাখ। আমরা তোমার সাথে একটু কথা বলতে চাই।'
>
> এ অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে কিছুক্ষণের জন্য সে তার তীর-ধনুক নিষ্ক্রিয় রাখল।

আবূ সুফিয়ান তাঁকে বলল :

> 'আমর! তুমি যা করছ, তা ঠিক হচ্ছে না। তুমি যয়নবকে নিয়ে গৌরবের সাথে দিন-দুপুরে আমাদের সম্মুখ দিয়ে এমনভাবে রওয়ানা হয়েছ, যেন তার চলে যাওয়াকে আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি। অথচ গোটা আরব এটা খুব ভালো করেই দেখেছে যে, বদরের যুদ্ধে আমাদের কী বিপর্যয়েরই না সম্মুখীন হতে হয়েছে। তুমি তো জান যে, তার পিতা মুহাম্মদের হাতে আমরা কী সাজাই না পেয়েছি। অতএব, তুমি তার মেয়েকে নিয়ে দিন-দুপুরে আমাদের সামনে দিয়ে যেভাবে বীরদর্পে বের হয়েছ, সেটা মোটেও ঠিক হয়নি। এভাবে তাকে যেতে দেওয়ার অর্থই হলো আরবের গোত্ররা আমাদের ভীতু হিসেবে চিহ্নিত করবে। আরব আমাদেরকে কাপুরুষ ছাড়া আর কী মনে করবে? কাজেই তুমি তাকে নিয়ে বাড়িতে ফিরে যাও এবং তাকে তার স্বামীর বাড়িতে কয়েক দিন কাটাতে দাও। তাকে ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে কমপক্ষে লোকজনকে বলাবলি করতে দাও যে, কুরাইশরা তাকে মক্কা থেকে চলে যেতে বাধা দিয়েছে এবং তাকে ফিরিয়ে এনেছে। তারপর কোনো এক রাতে আমাদের অগোচরে সম্মানের সাথে তাকে তার

পিতার কাছে পৌঁছে দাও। তাকে আমাদের কাছে বন্দী করে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই।'

আবূ সুফিয়ানের এ পরামর্শে আমর সম্মত হলো এবং যয়নব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে নিয়ে মক্কায় ফিরে এল। মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই ফের সে আবূ সুফিয়ানের কথামতো যয়নব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে মক্কা থেকে রওয়ানা হলো ও তার ভাইয়ের নির্দেশ মতো তাঁকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরিত ব্যক্তিদের নিকট নিজ হাতে সোপর্দ করল।

যয়নব বিনতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হলে দীর্ঘ দিন যাবৎ আবুল আস মক্কায় নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে থাকে। মক্কা বিজয়ের মাত্র কিছু দিন পূর্বে সে তার তেজারতী কাফেলা নিয়ে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। তার বিরাট এ তেজারতী কাফেলার মালবাহী উটের সংখ্যাই ছিল একশত। এই উট বহরের পরিচালনায় নিযুক্ত কর্মচারীর সংখ্যাও ছিল একশত সত্তর জন।

আবুল আসের এই কাফেলা মক্কায় ফেরার পথে মদীনার কাছে পৌঁছা মাত্র মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নিযুক্ত মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের টহলদার বাহিনীর সামনে পড়ে যায়। এরা কুরাইশদের এ তেজারতী কাফেলায় আক্রমণ চালায় এবং এ উটবহর কব্জা করে সমস্ত জনশক্তিকে বন্দী করে ফেলে। এ কাফেলায় আবুল আসই একমাত্র ব্যক্তি, যে টহলদার বাহিনীর হাত থেকে পালাতে সক্ষম হয়। যাকে অনেক খোঁজাখুজি করেও টহলরত বাহিনী গ্রেফতার করতে পারেনি।

রাত পুরোপুরি অন্ধকারে আচ্ছাদিত হয়ে পড়লে আবুল আস অন্ধকারের এ সুযোগে মক্কায় ফেরত না গিয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত মনে মদীনায় প্রবেশ করে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর সে যয়নব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর কাছে প্রাণ ভিক্ষা ও আশ্রয় কামনা করে। ফলে তিনি আবুল আসকে আশ্রয় ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেন।

ভোর হতে না হতেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে মসজিদে গেলেন। মেহরাবে দাঁড়িয়ে জামা'আত সোজা করানোর পর আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে তাকবীর তাহরীমা বাঁধলেন। সাথে সাথে উপস্থিত মুসল্লীদের আল্লাহু আকবার বলে তাকবীর তাহরীমার হাত বেঁধে

ফেলামাত্রই যয়নব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা মহিলাদের চত্বর থেকে উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলেন :

'হে নামাযরত মুসলিম ভাইয়েরা! আমি যয়নব বিনতে মুহাম্মদ বলছি। আমি আবুল আসকে আশ্রয় দিয়েছি। অতএব, আপনারাও তাকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ও আশ্রয় দিন।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযান্তে সালাম ফিরিয়ে মুসল্লীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসলেন এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন :

'নামাযের শুরুতে আমি যা শুনেছি তোমরাও কি তা শুনেছ?'

সবাই বলে উঠলেন : 'জী হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

যে মহান সত্তার হাতে আমার জীবন-মরণের ফায়সালা, সেই আল্লাহর শপথ, আমি এ ব্যাপারে পূর্বাহ্নে কিছুই জানি না, তোমাদের সাথে আমিও তার সম্পর্কে শুনতে পেলাম মাত্র।

মুসলমানদের দুর্বলতম ব্যক্তিও চাইলে কাউকে নিরাপত্তা দান করতে পারে, সে ক্ষেত্রে সবার পক্ষ থেকেই আশ্রিত হয়।

অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোজা তাঁর বাড়িতে গিয়ে যয়নব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে বললেন :

'আবুল আসকে মেহমানদারীতে কোনো ত্রুটি করো না। কিন্তু এ কথা জেনে রেখো যে, তুমি এখন তার জন্য হালাল নও। কারণ, কোনো কাফিরের সাথে ঈমানদার মহিলার বিবাহ জায়েয নয়।'

তারপর তিনি টহলরত সেই বাহিনীকে ডেকে পাঠান, যে বাহিনী আবুল আসের উটবহরকে কব্জা ও তার লোকজনকে বন্দী করে নিয়ে আসে। তারা এলে তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বললেন :

'এই ব্যক্তি আমাদের যে একান্তই আপনজন তা তোমরা ভালো করেই জান। টহলরত অবস্থায় তোমরা তার উটবহর ও লোকজনকে কব্জা করেছ। আমি চাই যে, তোমরা যদি তার প্রতি ইহসান করতে চাও, তাহলে তাঁর সব কিছুই তাকে ফেরত দাও। আর যদি তোমরা তা না করতে চাও, তাহলে এসব

তোমাদের জন্য 'ফাই' বা আল্লাহর পক্ষ থেকে যুদ্ধ ছাড়াই প্রাপ্ত সম্পদ এবং তা তোমাদের জন্য নিঃসন্দেহে হালাল ও তোমাদের মধ্যেই বণ্টনযোগ্য।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য শুনে টহলরত বাহিনীর সব সাহাবী সমস্বরে বলে উঠলেন :

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা অবশ্যই তাকে তার সব কিছুই ফেরত দিয়ে দেব।'

আবুল আস তার উটবহর ফেরত নিতে এলে উক্ত টহলরত বাহিনীর সাহাবীরা তাঁকে বললেন :

'হে আবুল আস! তুমি কুরাইশদের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, শুধু তাই নয়, তুমি সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাত ভাই এবং বড় জামাতা। তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করা পছন্দ করবে? সে ক্ষেত্রে আমাদের কব্জা করা সমস্ত সম্পদ থেকে আমাদের অধিকার ছেড়ে দেব। তুমিই মক্কাবাসীর এই বিশাল সম্পদের একচ্ছত্র মালিক হয়ে আমাদের সাথে মদীনাতেই বসবাস করতে থাকবে। তাতে কি তুমি সম্মত আছো?'

উত্তরে আবুল আস বলল :

'ছি! আপনারা আমার প্রতি একটি সর্বনিকৃষ্ট ও ঘৃণ্যতম শর্ত আরোপ করছেন। আপনারা কি চান যে, আমি বিশ্বাসঘাতকতার মধ্য দিয়ে ইসলামী যিন্দেগীর সূচনা করি?'

প্রতিশ্রুতি মোতাবেক আবুল আসকে তার সমস্ত সম্পদ ফেরত দেওয়া হলো। সে নিরাপদে মক্কায় ফিরে গিয়েই প্রত্যেককে তাদের সমস্ত প্রাপ্য বুঝিয়ে দিয়ে মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা দেয় যে :

'তোমাদের এমন কি কেউ আছ যে, আমার কাছে তার প্রাপ্য রয়েছে অথচ এখনো তা বুঝে নাওনি?"

তারা উত্তর দেয় :

'না। আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে, তোমার কাছে একটি কপর্দকও পায়।'

আমাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ তোমাকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন। নিঃসন্দেহে আমরা তোমাকে একজন একান্ত নিষ্ঠাবান ও ন্যায়পরায়ণ দয়ালু ব্যক্তি হিসেবেই পেয়েছি।

তাদের এ উত্তর শুনে আবুল আস বলে :

'হ্যাঁ, আমিও ঘোষণা দিচ্ছি যে, আমি তোমাদের সকলেরই যা যা প্রাপ্য তা বুঝিয়ে দিয়েছি এবং এই সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আমার আর কোনো প্রভু নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি যে, তোমাদের সম্পদ মদীনায় আমার ইসলাম গ্রহণে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমার ভয় হচ্ছিল, তোমরা আমাকে এই বলে তিরস্কার করবে যে, টহলদার বাহিনীর হাতে ধৃত হওয়ার বাহানা করে মূলত সে আমাদের সম্পদ আত্মসাৎ করতে চেয়েছে।'

'আল্লাহ তোমাদের সম্পদকে তোমাদের কাছে ফেরত দেওয়ার তাওফীক দিয়েছেন এবং আমিও তা থেকে দায়মুক্ত হতে পেরে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলাম।'

অতঃপর আবুল আস মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আগমনকে গভীর আন্তরিকতা সহকারে স্বাগত জানান এবং তাঁর স্ত্রী যয়নবকে তাঁকে ফেরত দিয়ে তাঁর সম্পর্কে বললেন :

'সে আমাকে যে কথা দিয়েছিল তা সত্যে পরিণত করেছে আর আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তাও যথাযথভাবে পালন করেছে।'

---

আবুল আস ইবনে আর রবীঈ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জীবনী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সহায়ক গ্রন্থাবলি :

১. সিয়ারুল আলাম আন নুবালা লিয যাহাবী : ১ম খণ্ড, ২৩৯ পৃ.।
২. উসদুল গাবাহ : ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৮৫ পৃ: অথবা আত-তারজামা অংশ, ৬০৩৫ পৃ.।
৩. আনসাবুল আশরাফ : ৩৯৭ পৃঃ এবং এর পরে।
৪. আল ইসাবাহ : ৪র্থ খণ্ড, ১২১ পৃ.।
৫. আস সীবাতুন নুবুবিয়াহ লিইবনে হিশাম : ২য় খণ্ড, ৩০৬-৩১৪ পৃ.।
৬. আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ : ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩৫৪ পৃ.।
৭. হায়াতুস সাহাবা : ৪র্থ খণ্ডের সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।
৮. আল ইসতিয়াব বিহামিশিল ইসাবাহ : ৪র্থ খণ্ড, ১২৫ পৃ.।

# আসেম ইবনে ছাবেত (রা)

*'যে কেউ উত্তমভাবে যুদ্ধ করতে চায়, সে যেন আসেম ইবনে ছাবেত-এর মত যুদ্ধ করে।' –মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)*

মক্কার কুরাইশ নেতৃবৃন্দ থেকে ক্রীতদাস পর্যন্ত সর্বস্তরের যুদ্ধবাজরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য বের হয়ে আসে। তাদের অন্তরে ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি চরম ঘৃণা আর বিদ্বেষ। বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ-স্পৃহা এবং সে যুদ্ধে নিকটাত্মীয়দের হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জিঘাংসায় তারা অন্ধ হয়ে উঠেছিল। প্রতিশোধের নেশা তাদের রক্তের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবাহিত ছিল।

এখানেই শেষ নয়, এ যুদ্ধে তাদের যোদ্ধাদের অধিকতর উত্তেজিত করা ও বীরত্বব্যঞ্জক গান গেয়ে সৈন্যদের মধ্যে রণোন্মাদনা সৃষ্টির জাহেলী যুগের এক বিশেষ কৌশল অবলম্বন করা হলো। এ লক্ষ্যে তারা কুরাইশ মহিলাদের একটি গায়িকা দল গঠন করে। এ দলের শীর্ষে ছিল আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনতে উতবা, উমর ইবনে আস-এর স্ত্রী রাইতা বিনতে মুনাব্বেহ, সুলাফা বিনতে সা'দ এবং আরো অনেক নামকরা গায়িকা। সুলাফার সাথে ছিল তার স্বামী তালহা এবং তার তিন ছেলে মূসাফে, জুলাস ও কিলাব। কুরাইশ ও মুসলিম বাহিনী উহুদ প্রান্তরে পরস্পর মুখোমুখি হলে আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দার নেতৃত্বে মহিলারা তাদের হাতে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে কুরাইশ সৈন্যদের পেছনে অবস্থান নেয়। বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে তারা জ্বালাময়ী ও উত্তেজনাকর কবিতা আবৃত্তি করতে থাকে। তারা নেচে নেচে যে উত্তেজনাকর গান গাইতে থাকে, তার একটি আরবী

অংশ হলো :

إِنْ تُقْبِلُوْا نُعَانِقْ

وَنَفْرُشِ النَّمَارِقْ

أَوْ تُدْبِرُوْا نُفَارِقْ

فِرَاقَ غَيْرِ وَامِقْ

'যদি তোমরা সামনে অগ্রসর হয়ে মুসলিম বাহিনীকে আক্রমণ করো, তবে আমরা তোমাদের আলিঙ্গন করব, বিলাসবহুল ফুলশয্যায় সম্মতি দেব, আরাম কেদারায় বসতে দেব, উষ্ণ স্বাগত জানাব। আর যদি তাদের আক্রমণের মুখে পিছু হটে যাও, তবে ধিক্কারের সাথে তোমাদের প্রত্যাখ্যান করব এবং ঘৃণাভরে সারা জীবনের জন্য ছুড়ে মারব।'

তাদের এসব কথা অশ্বারোহী যোদ্ধাদের দারুণভাবে উত্তেজিত করে। গায়িকাদের স্বামীদের হৃদয়েও তা জাদুকরী প্রভাব ফেলে।

মুসলিম বাহিনীর ওপর কুরাইশদের বিজয়ের মাধ্যমে এ যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটলে কুরাইশ মহিলারা উন্মাদ হয়ে এমন সব জঘন্য অপকর্ম ঘটায়, যা ইতিহাসে বিরল। তারা শহীদ মুসলমানদের খুঁজে খুঁজে শনাক্ত করে তাদের লাশকে অপবিত্র করতে থাকে। তাদের বুক ও পেট চিরে কলিজা বের করে, চক্ষু উৎপাটন করে, কান ও নাক কেটে ফেলে, এতে তারা ক্ষান্ত না হয়ে শহীদদের কর্তিত নাক, কান কেটে গলার মালা, কানের বালি ও পায়ের নুপুর বানিয়ে তা পরিধান করে ক্ষোভের সমাপ্তি ঘটায়। কিন্তু সুলাফা বিনতে সা'দ-এর অবস্থা অন্যান্য কুরাইশ মহিলাদের চেয়ে ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার শেষ ছিল না। দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনার তেমনি কোনো সীমাও ছিল না। তার শুধু একটাই আশা যে, এ বিজয় মুহূর্তে তার স্বামী ও ছেলেরা তাকে এক নজর দেখে আনন্দ করুক এবং সেও তাদের এক নজর দেখেই বিজয়ানন্দে যোগ দিক। কিন্তু দীর্ঘ অপেক্ষার পরও তার মনের এ আশা পূরণ হতে না দেখে সে নিজেই তাদের খুঁজতে যুদ্ধের ময়দানের অনেক ভিতরে ঢুকে পড়ে। সুলাফা একের পর এক নিহতদের চেহারা উলট-পালট করে দেখতে থাকে। কোথাও তাদের না পেয়ে সে অস্থির হয়ে পড়ে। হঠাৎ স্বামীর রক্তাক্ত দেহ মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে

চিৎকার করে উন্মাদের মতো তার লাশ জাপটে ধরে। চারদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তার তিন ছেলে মূসাফ, কিলাব ও জুলাস-এর সন্ধান করতে থাকে। উহুদের পাদদেশে তার ছেলে মূসাফ ও কিলাবকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে চিৎকার করতে করতে তাদের দিকে ছুটে যায়। সুলাফা তাদের কাছেই ছেলে জুলাসকে জীবিত অবস্থায় দেখে দৌড়ে গিয়ে তার রক্তাক্ত দেহকে বুকে জড়িয়ে ধরে। উন্মাদনায় চিৎকার করতে করতে সোহাগভরা হৃদয়ে ছেলের মুখমণ্ডলের রক্ত মুছতে থাকে। দীর্ঘক্ষণ রক্তাক্ত অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে থাকার কারণে শুকিয়ে যাওয়া রক্তে তার চোখ দুটি বন্ধ হয়ে যায়। এসব রক্ত পরিষ্কারের ব্যর্থ চেষ্টা করে জুলাসকে বারবার জিজ্ঞাসা করতে থাকে :

'কে তোমার পিতাকে ও ভাইদের হত্যা করেছে? বলো সে কে? কে তোমাকে আঘাতের পর আঘাত করে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে?'

জুলাস অন্তিম অবস্থায় মায়ের কাছে তাদের ওপর আক্রমণকারীর নাম বলতে গিয়ে মৃত্যু-যন্ত্রণায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে পড়ে। পরিশেষে, অত্যন্ত নিস্তেজ কণ্ঠে এতটুকু বলতে সক্ষম হয় :

'আসেম ইবনে ছাবেত আমাকে আঘাত করেছে এবং আমার ভাই জুলাস ও কিলাবকেও...। এই বলে এক হেঁচকিতেই সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।'

স্বামীর ও সন্তানদের এ দুরবস্থা দেখে সুলাফা বিনতে সা'দ উন্মাদে বিলাপ করতে থাকে এবং লাত-মানাত দেবতার শপথ করে বলতে থাকে :

'যতক্ষণ কুরাইশরা আসেম ইবনে ছাবেত থেকে তার স্বামী ও সন্তানদের হত্যার প্রতিশোধ না নেবে এবং আসেমের মাথার খুলিতে তাকে শরাব পানের সুযোগ করে না দিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে মাতম করা থেকে ক্ষান্ত হবে না এবং ক্রন্দনও বন্ধ করবে না।'

অতঃপর সে ঘোষণা করে :

'জীবিত বা মৃত অবস্থায় যে আসেম ইবনে ছাবেতকে হাজির করতে পারবে, অথবা তার মাথা এনে দিতে পারবে, তাকে তার চাহিদামতো অঢেল অর্থ পুরস্কার দেওয়া হবে।'

তার পুরস্কারের ঘোষণা দ্রুত কুরাইশদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। মক্কার প্রতিটি ভাগ্য পরীক্ষার্থী যুবকই আসেম ইবনে ছাবেত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে জীবিত বা মৃত অবস্থায় সুলাফা বিনতে সা'দ-এর সামনে পেশ করে ঘোষিত পুরস্কার লাভের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

উহুদ যুদ্ধ শেষে মুসলিম যোদ্ধারা মদীনায় ফিরে আসেন। মদীনায় পৌঁছে শহীদদের মাগফিরাত কামনা, তাদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ ও বীর গাযীদের নৈপুণ্যপূর্ণ ভূমিকা এবং উহুদ যুদ্ধের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করেন। একই পরিবারের তিন ভাইকে হত্যা করার গৌরব অর্জনকারী আসেম ইবনে ছাবেত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কথা এলে তারা সবাই আশ্চর্যান্বিত হয়ে তাকে ধন্যবাদ জানাতে থাকেন।

তাদেরই একজন বলে উঠে :

> 'এতে অবাক হওয়ার কী আছে? তোমরা সে কথা কেন স্মরণ করছো না, বদরের যুদ্ধের পূর্ব মুহূর্তে যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের প্রশ্ন করেছিলেন যে, তোমরা কোন্ পদ্ধতিতে জিহাদ করবে?'

তখন আসেম ইবনে ছাবেত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ধনুক হাতে দাঁড়িয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছিলেন :

> 'শত্রু যদি আমার একশত গজের আওতায় থাকে, তাহলে তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে তাঁকে নিপাত করব। আর যদি তার চেয়ে নিকটে বর্শার আওতায় পৌঁছে যায়, তাহলে বর্শা নিক্ষেপের মাধ্যমে শত্রুকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করব, যাতে বর্শা শত্রুদেহ ভেদ করে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেয়। আমি ততক্ষণ পর্যন্ত শত্রুর বিরুদ্ধে মরিয়া হয়ে বর্শা ব্যবহার করতে থাকব যতক্ষণ পর্যন্ত তা ভেঙে না যায়। যদি বর্শা ভেঙে যায়, তাহলে তা দূরে নিক্ষেপ করে তরবারি উন্মুক্ত করে নেব এবং তলোয়ার দিয়েই যুদ্ধ করতে থাকব?'

তার এ উত্তরের প্রেক্ষিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন :

> 'এ পদ্ধতিতেই যুদ্ধ করতে হবে। যে উত্তমভাবে যুদ্ধ করতে চায়, সে যেন আসেম ইবনে সাবেতের পদ্ধতিতে যুদ্ধ করে।'

উহুদ যুদ্ধের পরপরই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শীর্ষস্থানীয় ছয় জন সাহাবীর এক বিশেষ দলকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে মদীনার বাইরে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। আসেম ইবনে ছাবেতকে এই দলের আমীর মনোনীত করা হলো। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যথাসময়ে রওয়ানা হয়ে গেলেন। মক্কার সীমানা ধরে পথ চলার এক পর্যায়ে হুযাইল গোত্রের দস্যুরা মুষ্টিমেয় কয়েকজন পথিককে দেখতে পেয়ে তাদের উপর আকস্মিক হামলা চালায়। তারা হুযাইল গোত্রের অন্যান্য লোকদের সহায়তায় চতুর্দিক থেকে সাহাবীদের ঘিরে ফেলে।

আসেম ইবনে ছাবেত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ও তার সঙ্গীরা তাদের প্রতিহত করার জন্য তলোয়ার উন্মুক্ত করলেন। তাদের এই প্রস্তুতি দেখে আক্রমণকারীরা বলল :

> 'মোকাবেলা করার মতো শক্তি নিঃসন্দেহে তোমাদের এই ছয় জনের নেই। আমরা আল্লাহর শপথ করে বলছি, তোমরা যদি আত্মসমর্পণ কর, তাহলে তোমাদের কোনো ক্ষতি করব না। সে ক্ষেত্রে তোমাদেরকে নিরাপত্তা দান করা হবে।'

তাদের এ প্রস্তাবে কী পদক্ষেপ নেওয়া যায়, সে উদ্দেশ্যে তারা নিজেদের মধ্যে পরস্পর পরামর্শ-দৃষ্টি বিনিময় করলেন।

আসেম ইবনে ছাবেত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাদের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললেন :

> 'আমি কখনো মুশরিকদের প্রতিশ্রুতিতে নিজেকে তাদের হাতে সোপর্দ করব না।'

তিনি উহুদ যুদ্ধে সুলাফা বিনতে সা'দ-এর পুরস্কারের ঘোষণার কথাও মনে মনে স্মরণ করলেন এবং নিজের তলোয়ার উঁচু করে বলতে থাকলেন :

اللهم إنى أحمى لدينك وأدفع عنه ... فاحم لحمى وعظمى ولا تظفر بهما أحدا من أعداء الله۔

'হে আল্লাহ! আমি তোমার দীনের রক্ষায় এবং তার হেফাযতে অস্ত্র তুলে ধরলাম। তুমি আমাকে সাহায্য কর। আর আমার দেহ ও হাড় হাড্ডিকে এমনভাবে হেফাযত কর যেন এই মুশরিক দুশমনরা কোনোভাবেই তার উপর বিজয়ী হতে না পারে।'

এই বলেই আক্রমণকারী হুযাইলীদের ওপর তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন। সাথে সাথে তাঁর অপর দুই সাথীও তাঁকে অনুসরণ করে দুশমনদের বিরুদ্ধে লড়াই-এ অংশ নেন। লড়াইয়ের এক পর্যায়ে একের পর এক এ তিনজনই শাহাদাত বরণ করেন। অপর তিনজন তাদের আমীরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আত্মসমর্পণ করলে তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

প্রথম পর্যায়ে হুযাইল গোত্রের লোকেরা ভাবতেই পারেনি যে, এই তিনজনের মধ্যে আসেম ইবনে ছাবেতও রয়েছেন। পরে তারা তার পরিচয় পায়। পরিচয় পাওয়ার পর তারা যেন আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে। তাদের এই আনন্দের কারণ হলো, সুলাফা বিনতে সা'দ-এর পুরস্কার ঘোষণা। জীবিত বা মৃত আসেমকে এনে দিলে দাতা তার ইচ্ছানুরূপ পুরস্কার লাভ করবে। কেননা, সুলাফা তার মাথার খুলি দিয়ে শরাব পান করে স্বামী ও পুত্রশোক প্রশমিত করবে।

আসেম ইবনে ছাবেত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর শাহাদাতের কয়েক ঘন্টার মধ্যেই হুযাইলদের অদূরেই কুরাইশদের কাছে তার এই সংবাদ পৌঁছে গেল।

তৎক্ষণাৎ কুরাইশ নেতারা হুযাইল গোত্রের নিকটে তাদের এক প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে আসেম ইবনে ছাবেত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মাথা চাইল। তারা এই মাথা সুলাফার হাতে তুলে দিয়ে তার স্বামী ও তিন ছেলে হারানোর শোক কিছুটা হলেও লাঘব করতে চাইল। কুরাইশ প্রতিনিধিরা এ উদ্দেশ্যে প্রচুর অর্থ ও সোনা-দানা সঙ্গে নিয়ে রওয়ানাকালে এই বলে নির্দেশ দেওয়া হলো :

'তারা যেন আসেমের মাথার বিনিময়ে হুযাইলীদের সাথে কোনো প্রকার দর-কষাকষি করে সংকীর্ণ মনের পরিচয় না দেয়।'

কুরাইশ প্রতিনিধির হাতে আসেম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর শির তুলে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তা বিচ্ছিন্ন করার জন্য মৃতদেহের নিকটে গিয়ে দেখে যে, মৌমাছি ও ভীমরুলের ঝাঁক তাঁর মৃতদেহকে ঘিরে আছে। তাঁর লাশের নিকট যেতে চেষ্টা করতেই মৌমাছি ও ভীমরুল তাদের চোখ, কান, মাথা, মুখমণ্ডলসহ শরীরের সব জায়গায় হুল ফোটাতে থাকে। এমতাবস্থায় তারা বারবার চেষ্টা করার পরও আসেম রাদিয়াল্লাহু আনহুর লাশের নিকট যেতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়। আর এভাবে লাশের প্রতিরক্ষা হতে থাকে। তারা মৃতদেহের কাছে পৌঁছতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়ে পরস্পরে পরামর্শ করে যে, রাত পর্যন্ত আসেমের লাশকে এভাবেই থাকতে দাও। রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে এলে ভীমরুল ও মৌমাছিরা লাশ ছেড়ে চলে যাওয়ার সুযোগে তার শিরশ্ছেদ করা কোনো ব্যাপারই নয়। এ পরামর্শ মোতাবেক দিনের অবশিষ্ট সময়ে আসেম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর শিরশ্ছেদ করার চেষ্টা না করে লাশের অদূরে বসে তারা পাহারা দিতে থাকে।

কিন্তু দিনের শেষে রাত ঘনিয়ে আসার পূর্বেই আকাশ কালো মেঘে ঢেকে গেল। মেঘের গর্জন একদিকে জনপদকে আতঙ্কিত ও অপরদিকে গাঢ় ধোঁয়ার মত মেঘরাশি চারদিক ছেয়ে ফেলল। সন্ধ্যা না হতেই মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হলো। রাতভর মুষলধারে এমন ঝড়-বৃষ্টি হলো, যা প্রবীণতম ব্যক্তিরা পর্যন্ত এ অঞ্চলে কখনো হতে দেখেনি। মুহূর্তের মধ্যেই পানিতে মাঠ-ঘাট ডুবে গেল এবং গোটা অঞ্চল বাঁধভাঙা প্লাবনে ভেসে গেল। সারা রাত বৃষ্টি শেষে সকাল বেলা হুযাইল গোত্রের লোকেরা আসেম ইবনে ছাবেত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর শিরশ্ছেদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ল; কিন্তু বহু খোঁজাখুঁজির পরেও শির তো শির তার লাশেরই কোনো সন্ধান পেল না। আসেম রাদিয়াল্লাহু আনহুর মৃতদেহকে প্রবল খর-স্রোতের তোড় দূরে বহুদূরে কোনো এক অজানা স্থানে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, যা এক আল্লাহ ছাড়া আর কেউই জানে না। আল্লাহ আসেম ইবনে ছাবেত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর যুদ্ধকালীন কৃত দু'আ কবুল করেন এবং তাঁর পবিত্র দেহকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর পবিত্র মাথার খুলি দিয়ে সুলাফা বিনতে সা'দ-এর শরাব পান করার ঘৃণ্য অভিলাষ চিরতরে ব্যর্থ করে দেন।

আল্লাহ এভাবে তাঁর প্রিয় বান্দার ওপর মুশরিকদের সমস্ত ইচ্ছা পূরণের সর্ব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করেন।

আসেম ইবনে ছাবেত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জীবনী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সহায়ক গ্রন্থাবলি :

১. আল ইসাবা : আত-তারজামা, ৪৩৪০ পৃ.।
২. আল ইসতিয়াব : বি হাশেমে ইসাবা : ৩য় খণ্ড, ১৩২ পৃ.।
৩. উসদুল গাবাহ : আত-তারজামা, ২৬৬৩ পৃ.।
৪. আত তাবাকাতুল কুবরা : ২য় খন্ড, ৪১, ৪৩, ৫৫,৭৯ পৃ: এবং ৩য় খণ্ড, ৯০ পৃ.।
৫. হুলিয়াতুল আওলিয়া : ১ম খণ্ড, ১১০ পৃ.।
৬. সিফাতুস সাফওয়া : সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।
৭. তারীখুত তাবারীহ : ১০ম খন্ডের সূচি দ্রষ্টব্য।
৮. আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ : ৩য় খণ্ড, ৬২-৬৯ পৃ.।
৯. তারীখু খালীফাতু ইবনে খিয়াত : ২৭ ও ৩৬ পৃ.।
১০. আস সীরাতুন নুবুবিয়াহ লিইবনে হিশাম : সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।
১১. আল মুহাব্বারু ফিততারীখ : ১১৮ পৃ.।
১২. দেওয়ানে হাস্‌সান বিন ছাবেত ওয়া শুরুহিহী : আসেম ইবনে সাবেতের জীবনী।
১৩. হায়াতুস সাহাবা : ৪র্থ খণ্ডের সূচি দ্রষ্টব্য।

# সাফিয়্যা বিনতে আবদুল মুত্তালিব (রা)

*সাফিয়্যা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা প্রথম মুসলিম নারী, যিনি আল্লাহর দীনের প্রতিরক্ষায় এক মুশরিক গুপ্তচরকে হত্যা করেছিলেন।*

প্রিয় পাঠক!

আপনারা কি জানেন? অসাধারণ প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতাসম্পন্ন এই মহিলা সাহাবী কে? যার সম্পর্কে হাজার পুরুষ হাজারো রকমের হিসাব করে সুরাহা পেত না। হ্যাঁ, সেই দুরন্ত সাহসী মহিলা তিনি, যিনি ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম একজন মুশরিক হত্যার গৌরব লাভ করেন। যিনি সর্বপ্রথম মুসলমানদের জন্য অশ্বারোহী যোদ্ধাকে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। যিনি সর্বপ্রথম তাঁর তরবারিকে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর জন্য হাতে তুলে নিয়েছিলেন। তিনিই হলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফুফু সাফিয়্যা বিনতে আবদুল মুত্তালিব আল হাশেমিয়্যা আল কুরাইশিয়্যা। যিনি শুধু বংশ-পরিচয়েই যুগশ্রেষ্ঠ ছিলেন না; বরং সামাজিক মর্যাদায়ও সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাদা কুরাইশ গোত্র প্রধান আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম তাঁর পিতা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মা আমেনা বিনতে ওয়াহাব-এর সহোদরা হা'লা বিনতে ওয়াহাব হলেন তাঁর মাতা। তাঁর প্রথম স্বামী ছিল আবূ সুফিয়ান ইবনে হারবের ভাই উমাইয়া গোত্রের

নেতা আল হারেস ইবনে হারব। যিনি তাঁকে বিধবা হিসেবে রেখে ইহজগৎ ত্যাগ করেন। তাঁর দ্বিতীয় স্বামী হলেন তদানীন্তন আরব রমণীদের নয়নমণি এবং প্রথম উম্মুল মুমিনীন খাদীজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার ভাই আওয়াম ইবনে খুওয়াইলিদ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাওয়ারী বা সাহায্যকারী যুবায়ের ইবনে আল আওয়াম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন তাঁর ছেলে। তিনি এতই নিরহংকার ও বিনয়ী ছিলেন যে, একমাত্র ঈমানের গৌরব ছাড়া আর কোনো গৌরব তাঁর ছিল না, যার প্রতি অন্যের দৃষ্টি আকৃষ্ট হতে পারে। তাঁর দ্বিতীয় স্বামী আল আওয়াম তাঁর কোলে একমাত্র শিশু যুবায়েরকে রেখে ইনতিকাল করেন। তিনি তাঁর শিশু সন্তানকে দুঃখ-কষ্টে লালন-পালন করেন। তাঁকে যুদ্ধবিদ্যা ও অশ্ব-পরিচালনার মতো সামরিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বড় করে তোলেন। তীর-ধনুক তৈরির জ্ঞানও তাঁকে দেন। ঝুঁকিপূর্ণ ও ভীতিকর পরিস্থিতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার এবং যে কোনো ভয়-ভীতির মোকাবেলা করার মতো কঠিনতম কাজের জন্যও তাঁকে দুঃসাহসী করে গড়ে তোলেন। এসব অনুশীলনে যদি যুবায়েরকে তিনি বিন্দুমাত্র ইতস্তত বা ভয় করতে দেখতেন, তাহলে প্রকাশ্যে বেত্রাঘাতের মতো কঠিন সাজাও দিতেন। এ জন্য তার এক চাচা তাঁকে তিরস্কার করলেন :

> 'ছেলেকে কি এমনভাবে প্রহার করতে হয়? তুমি ওকে শত্রুর মতো প্রহার করছ। মায়ের সোহাগভরা শাসন এটা নয়।'

তিনি এর উত্তরে তাকে বলেন :

مَنْ قَالَ قَدْ أَبْغَضْتُهُ فَقَدْ كَذَبْ
وَإِنَّمَا أَضْرِبُهُ لِكَيْ يَلِبْ
وَيَهْزِمَ الْجَيْشَ وَيَأْتِيْ بِالسَّلَبْ

> 'কে বলে যে, আমি যুবায়েরের সাথে শত্রুতাসুলভ আচরণ করছি, নিঃসন্দেহে সে মিথ্যা বলছে। প্রকৃতপক্ষে আমি তাকে এজন্য প্রহার করছি যে, সে যেন রণ-কৌশলে নৈপুণ্য অর্জন করতে, শত্রুবাহিনীর ওপর সিংহের মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে, শত্রুবাহিনীর ব্যূহকে ভেদ ও তছনছ করতে এবং মালে গনীমতের সম্পদ নিয়ে ফিরতে সমর্থ হয়।'

আল্লাহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সমস্ত মানবকুলের জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী করে প্রেরণ করে তাঁর নিকটাত্মীয়দের থেকেই দাওয়াত শুরু করার নির্দেশ দেন। আল্লাহর এই আদেশ পেয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল মুত্তালিব গোত্রের ছোট-বড়, শিশু-যুবক, নারী-পুরুষ সবাইকে একত্র করে তাদের উদ্দেশ্যে বলেন :

'হে আমার কন্যা ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ, হে সাফিয়্যা বিনতে আবদুল মুত্তালিব, হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর! আমি তোমাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারব না।'

অতঃপর তিনি তাদেরকে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনার জন্য আহ্বান জানান। তাদেরকে তিনি তাঁর রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। তাদের মধ্যে যাদের তাওফীক হলো, তারা ঈমান এনে আল্লাহ্‌র নূরে নূরান্বিত হলেন এবং যারা তা প্রত্যাখ্যান করল তারা অন্ধকারেই নিমজ্জিত রইল। এ আহ্বানে সাফিয়্যা বিনতে আবদুল মুত্তালিব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের অন্যতম ছিলেন। সেদিন থেকেই সাফিয়্যা বিনতে আবদুল মুত্তালিব ঈমান গ্রহণের মাধ্যমে ইসলামী জীবন যাপন করতে আরম্ভ করেন।

সাফিয়্যা বিনতে আবদুল মুত্তালিব তাঁর ছেলে যুবায়ের ইবনে আওয়ামসহ প্রথম সারির মুসলমানদের মতো কুরাইশদের অবর্ণনীয় যুলুম-নির্যাতন ও অন্যায়-অত্যাচারের শিকারে পরিণত হলেন। আল্লাহর রাসূল তাঁর সাথী-সঙ্গীদের মদীনায় হিজরতের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে চলে যাওয়ার অনুমতি দিলে এই হাশেমী রমণীও তাঁর সমস্ত ধন-দৌলত, মূল্যবান আসবাবপত্র, সহায়-সম্পদ মক্কায় ফেলে রেখে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি ও দীনের হেফাযতকল্পে মদীনায় হিজরত করেন। ষাট বছর বয়সের এই মহিলাকে তার বার্ধক্য যেমন হিজরত থেকে বিরত রাখতে পারেনি, তেমনি জিহাদের ময়দানেও তাঁর বীরোচিত ভূমিকা রাখা থেকে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। অদ্যাবধি শ্রদ্ধা ও গর্বের সাথে মুসলমানগণ তা স্মরণ করে আসছেন। আমরা এখানে তাঁর জীবনের দুটি ঘটনার আলোচনা করছি। প্রথম ঘটনাটি হলো উহুদ যুদ্ধের ও দ্বিতীয়টি খন্দক যুদ্ধের। উহুদ যুদ্ধের ঘটনাটি হলো :

তিনি জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর উদ্দেশ্যে মহিলা ইউনিটের অন্তর্ভুক্ত হয়ে মুসলিম সৈন্যদের সাথে উহুদ যুদ্ধে অশংগ্রহণ করেন। তিনি এ যুদ্ধে যোদ্ধাদের জন্য পানি বহন করে আনা, তৃষ্ণার্তদের পানি পান করানো, তীর শাণিত করা ও ধনুক ঠিক করার দায়িত্ব পালন করেন। এসব দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে তাঁর মনে যে উদ্দেশ্য লুক্কায়িত ছিল তা হলো, যুদ্ধের পুরো অবস্থার উপরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা। কারণ, তাতে অবাক হবার মতো কিছু ছিল না। যুদ্ধের ময়দানে তাঁরই ভাইপো মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর নেতৃত্বে আল্লাহর সিংহ উপাধিতে ভূষিত তাঁর ভাই হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব এবং রাসূলুল্লাহর সাহায্যকারী তাঁর ছেলে যুবায়ের ইবনে আওয়াম উপস্থিত। সব কিছুর উর্ধ্বে ছিল ইসলাম। যা তিনি মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছেন এবং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের জন্যই হিজরত করেছেন। তিনি যে জান্নাতের পথ ধরেছেন। এসব কারণই তঁাকে সশরীরে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হতে বাধ্য করেছে।

যুদ্ধের এক চরম সন্ধিক্ষণে কিছুসংখ্যক সাহাবী ছাড়া মুসলিম বাহিনীর অধিকাংশ সদস্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শত্রুদের অস্ত্রের সামনে রেখে প্রাণভয়ে এদিক-সেদিক ছোটাছুটি করতে থাকে। অবস্থার এতই অবনতি ঘটে যে, মুশরিক কুরাইশরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘিরে ফেলে এবং তাঁকে হত্যার প্রচেষ্টা চালায়। দুঃখজনক এ অবস্থা দেখে সাফিয়্যা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তাঁর পানি বহনকারী সুরাহী মাটিতে নিক্ষেপ করে পলায়নকারী এক মুসলিম সৈন্যের হাত থেকে তার বর্শা কেড়ে নেন এবং শত্রুবাহিনীর যাকেই পান তাকেই বর্শার আঘাতে আহত করতে করতে সামনে অগ্রসর হতে থাকেন। তিনি পলায়নকারী মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে উচ্চৈঃস্বরে বলতে থাকেন :

> 'তোমাদের প্রতি ধিক্কার! তোমরা আল্লাহর রাসূলকে ময়দানে ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছ?'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সম্মুখে অগ্রসর হতে দেখে আশঙ্কা করলেন যে, তিনি তাঁর ভাই হামযার বিকৃত লাশ দেখে না ফেলেন। এ জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফিয়্যা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার ছেলে যুবায়েরকে ইশারা করে বলেন :

> 'তোমার মাকে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া থেকে বিরত রাখ।'

যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে তাঁর মায়ের দিকে দ্রুত অগ্রসর হয়ে বলতে থাকেন :

'আম্মা! আম্মা! আর অগ্রসর হবেন না, যে পর্যন্ত হয়েছেন তাই যথেষ্ট।'

সাফিয়্যা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ছেলে যুবায়েরকে ধমক দিয়ে বললেন :

'সরে যাও, এখন মা মা বলে ডাকার সময় নয়।'

যুবায়ের তখন বললেন :

'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে বিশেষভাবে মহিলাদের নির্দিষ্ট স্থানে চলে যেতে বলেছেন।'

তিনি প্রশ্ন করলেন :

'কেন? আমার শাহাদাতপ্রাপ্ত ভাই হামযার নাক-কান কেটে তার লাশকে বিকৃত করে ফেলেছে বলে? তাতো আমি জেনেই ফেলেছি। এতে কী হয়েছে এবং সে তো আল্লাহর পথেই শহীদ হয়েছে।'

সাফিয়্যা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার এই দৃঢ় মনোবল দেখে যুবায়েরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

'হে যুবায়ের, তাঁকে তাঁর কাজ করতে দাও। যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটলে সাফিয়্যা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তাঁর ভাই হামযা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর লাশের কাছে উপস্থিত হয়ে দেখতে পান যে, তাঁর পেট ফেড়ে ফেলা হয়েছে, কলিজা টেনে বের করা হয়েছে, নাক-কান কেটে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে এবং চেহারাকে বিকৃত করা হয়েছে।'

তিনি তাঁর জন্য আল্লাহর কাছে মাগফিরাত কামনা করে বলতে থাকলেন :

'এ সব কিছুই আল্লাহর উদ্দেশ্যে, আল্লাহর সিদ্ধান্তেই আমি সন্তুষ্ট। আল্লাহর শপথ, আমি ধৈর্য অবলম্বন করব এবং আল্লাহর দরবারে এসবের প্রতিদান ইনশাআল্লাহ অবশ্যই পাব।'

এটাই ছিল উহুদ যুদ্ধে সাফিয়্যা বিনতে আবদুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার গৌরবময় ভূমিকা।

খন্দক যুদ্ধে তিনি যে অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন তা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। আসুন! ইতিহাসের পাতা থেকে আমরা তা জেনে নেই।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নীতি ছিল, তিনি কোনো যুদ্ধাভিযানে বের হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে শত্রুদের বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কায় নারী ও শিশুদের দুর্গের মধ্যে হেফাযতে রাখতেন। যেন অরক্ষিত অবস্থায় শত্রুরা তাদের ক্ষতি সাধন করতে না পারে। তাই খন্দকের যুদ্ধেও তিনি উম্মাহাতুল মুমিনীনসহ ফুফু সাফিয়্যা বিনতে আবদুল মুত্তালিব এবং অন্যান্য মুসলিম রমণীকে হাসসান ইবনে সাবেত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পৈতৃকসূত্রে প্রাপ্ত নিরাপদ দুর্গে রাখলেন। এটি ছিল মদীনার দুর্গসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুরক্ষিত ও নিরাপদ এবং শত্রুর নাগালের বাইরে।

মুসলমানরা যখন খন্দকের পাড়ে অবস্থান গ্রহণ করে কুরাইশ ও তাদের মিত্রদের মোকাবিলায় ব্যস্ত, ঠিক সেই মুহূর্তে তাদের নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার মতো উদ্বেগজনক এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

সাফিয়্যা বিনতে আবদুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ফজরের পূর্ব মুহূর্তে অন্ধকারে ছায়ার মতো কী যেন একটা নড়াচড়া করতে দেখলেন। পান সেদিকে মনোযোগের দিয়েয় দেখলেন যে :

> 'এক অপরিচিত ব্যক্তি দুর্গের চতুষ্পার্শ্বে ঘুরাফেরা করে ভিতরের অবস্থা জানার চেষ্টা করছে। তিনি নিশ্চিত হলেন যে, সে নিশ্চয়ই ইহুদীদের গুপ্তচর হবে। সে হয়তো জানতে চাচ্ছে, দুর্গে কোনো পুরুষ পাহারাদার আছে, নাকি পাহারাবিহীন শুধু শিশু ও মহিলাদের অরক্ষিত রাখা হয়েছে!'

তিনি মনে মনে ভাবলেন :

> 'নিঃসন্দেহে এ বনূ কুরাইযা গোত্রের ইহুদী গুপ্তচর। যে বনূ কুরাইযা তাদের ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যকার চুক্তি ভঙ্গ করে কুরাইশ ও তাদের মিত্রদের পক্ষ অবলম্বন করে তাদেরকে সাহায্য করছে। এ মুহূর্তে এই ইহুদীর হাত থেকে রক্ষা করার মতো কোনো মুসলমানই এখানে নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সমস্ত মুসলিম জনশক্তি

সংঘবদ্ধভাবে দুশমনের মোকাবেলায় খন্দকে ব্যস্ত। আল্লাহর এই দুশমন আমাদের দুর্গের অবস্থা ও প্রকৃত সংবাদ ইহুদীদের কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হলে ইহুদীরা দুর্গে আক্রমণ করে শিশুদের ও মহিলাদের ক্রীতদাস-দাসীতে পরিণত করবে। এটা হবে মুসলমানদের জন্য চরম বিপর্যয়। এ ক্ষেত্রে মুসলমানদের ইজ্জত রক্ষার অবশিষ্ট আর কিছু থাকবে না।'

এসব চিন্তা করে তিনি ওড়না মাথায় মুড়িয়ে এবং কোমর বেঁধে তাঁবুর একটি শক্ত খুঁটি লাঠি হিসেবে কাঁধে নিয়ে অতি গোপনে নিচে এসে আস্তে আস্তে দুর্গের দরজা খোলেন এবং অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আল্লাহর এই দুশমনকে অনুসরণ করতে থাকেন। কাঁধে আঘাত করার মতো সুবিধাজনক স্থানে পৌঁছামাত্রই তাকে সজোরে আঘাত হানেন। এক আঘাতেই সে মাটিতে পড়ে যায়। পরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় আঘাত হানেন। সে নিস্তেজ হয়ে পড়লে এবং শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে তিনি সাথে আনা ছুরি দ্বারা এই ইহুদীর শিরশ্ছেদ করে ফেলেন এবং তার খণ্ডিত শির নিয়ে দুর্গের ছাদে চলে আসেন। দুর্গের উপর থেকে নিচে অপেক্ষমাণ তার অন্যান্য সাথীদের প্রতি লক্ষ্য করে তা ছুঁড়ে মারলে গড়িয়ে এসে তাদের সামনে পড়ে। এ দেখে সেখানে অবস্থানরত তার অন্য সাথীদের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার হয়। তারা এ ইহুদীর কর্তিত শির দেখে পরস্পরে বলাবলি করতে থাকে :

'আমরা এখন বুঝতে পারলাম যে, মুহাম্মদ মহিলা ও শিশুদেরকে অরক্ষিত অবস্থায় রেখে যেতে পারে না, নিশ্চয়ই দুর্গে যোদ্ধাদের উল্লেখ্যযোগ্যসংখ্যক প্রহরী রয়েছে।

আল্লাহ্ সাফিয়্যা বিনতে আবদুল মুত্তালিবের ওপর সন্তুষ্ট হোন। তিনি মুসলিম রমণীদের জন্য এক উজ্জ্বল উদাহরণ। তিনি নিজে তাঁর ছেলেকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন এবং তা ছিল সার্থক প্রশিক্ষণ। নিজের ভাই শহীদ হয়েছেন, তাতে তিনি উত্তম সবর করেছেন। বিপদ-আপদ ও কষ্টে আল্লাহ্ তাঁকে বারবার পরীক্ষা করেছেন। তিনি নিজেকে একজন দৃঢ় মনোবলের অধিকারিণী সাহসী মহিলা হিসেবে প্রমাণ করেছেন। ইতিহাসের পাতায় তাঁর বীরোচিত ভূমিকা স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

সাফিয়্যা বিনতে আবদুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাই সর্বপ্রথম মুসলিম রমণী, যিনি ইসলামের খাতিরে এক মুশরিককে হত্যা করেন।

সাফিয়্যা বিনতে আবদুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার জীবনী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সহায়ক গ্রন্থাবলি :


১. উসদুল গাবাহ : ৭ম খণ্ড, ১৭৪ পৃ.।
২. আত তাবাকাতুল কুবরা : ৮ম খণ্ড, ৪১ পৃ.।
৩. সিয়ারু আলাম আন নুবালা : ২য় খণ্ড, ১৯৩ পৃ: ।
৪. আল ইসাবা : ৮ম খণ্ড, ৩৪৮ পৃ.।
৫. আল ইসতিয়াব : ৪র্থ খণ্ড, ৩৪৫ পৃ.।
৬. সামতুল আ-লাই : ১ম খণ্ড, ১৮ পৃ.।
৭. হায়াতুস সাহাবা : ১ম খণ্ড, ১৫৪ পৃ. ও সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।
৮. আসসীরাতুন নুবুবিয়াহ লি-ইবনি হিশাম : সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।
৯. জাইলু তারীখুত তাবারী : সূচিপত্র দ্রষ্টব্য ।
১০. আল কামিল ফিতা তারীখ : সূচিপত্র দ্রষ্টব্য ।
১১. আলামুন নিসা লিকিহালাহ : ২য় খণ্ড, ৩৪১-৩৪৬ পৃ.।
১২. ফুতুহুল বুলদান লিল বালাযুরী ।
১৩. আল আগানী লিআবিল ফারাজ : সূচিপত্র দ্রষ্টব্য ।
১৪. আল মুসতাতরিফ লিল আবশিহী : সূচিপত্র দ্রষ্টব্য ।
১৫. আল মাআরিফ লি ইবনে কুতায়বা : সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।

# উত্‌বা ইবনে গাযওয়ান (রা)

*'ইসলামে উত্‌বা ইবনে গাযওয়ান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর একটি বিশেষ স্থান রয়েছে।'*

*-উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু*

আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইশার নামাযান্তে তাঁর বিছানায় একটু বিশ্রাম করতে এসেছেন। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর রাতের আঁধারে জনগণের অবস্থা সরেজমিনে দেখার জন্য প্রতি রাতের ন্যায় আজও তিনি টহলে বের হয়ে পড়বেন।

কিন্তু আমীরুল মুমিনীনের চোখে নিদ্রা নেই। তা যেন আজ তাঁর থেকে হাজার মাইল দূরে। আজই তাঁর কাছে পারস্য বাহিনীর সাথে যুদ্ধরত মুসলিম সেনাপতির দূত এমন এক বার্তা নিয়ে এসেছে, যা তাঁকে উৎকণ্ঠিত করে তুলেছে।

'মুসলিম বাহিনীর হাতে পরাজিত পারস্য বাহিনী পশ্চাৎপসরণ করে কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে ওৎ পেতে বসেছে। যখনই তাদের ওপর মুসলিম বাহিনী চূড়ান্ত আক্রমণের চেষ্টা চালায়, তখনই বিভিন্ন দিক থেকে তাদের জন্য সাহায্য এসে পৌঁছায়। ফলে মুসলিম বাহিনীর সামনে তারা দুর্ভেদ্য প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়। তাদের এই প্রতিরোধের মোকাবেলায় মুসলিম বাহিনী না নতুন সৈন্য সংগ্রহ করতে পারছে, না চূড়ান্তভাবে আক্রমণ করতে পারছে।'

তাঁকে আরো জানানো হয়েছে যে, 'পরাজিত এই সৈন্যদের সবচেয়ে বড় ঘাঁটি হলো 'উবুল্লাহ শহর', সেখান থেকে পারস্য সৈন্যদের বিপুল পরিমাণ রসদ ও জনশক্তি যোগান দেওয়া হচ্ছে।'

উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু চিন্তা করলেন :

'পারস্য সৈন্যদের রসদ সরবরাহ কেন্দ্র 'উবুল্লাহ' শহরকে দখল করে নেওয়া প্রয়োজন। যেন তাদের রসদ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়।'

কিন্তু মুসলিম সৈন্যের স্বল্পতাই এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে একমাত্র বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

মদীনা থেকে সৈন্য প্রেরণ করে মুসলিম বাহিনীকে শক্তিশালী করাও নানা কারণে অসুবিধাজনক। কেননা, মদীনার যুদ্ধক্ষম যুবক, বৃদ্ধ এবং নেতৃত্ব দেওয়ার মতো সিপাহসালাররা জিহাদের উদ্দেশ্যে আগেই চলে গেছেন। মদীনায় যারা রয়ে গেছেন, তাদের সংখ্যা এ কাজের জন্য মোটেও যথেষ্ট নয়।

উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সিদ্ধান্ত নিলেন :

'এই মুষ্টিমেয় সামরিক শক্তি ব্যবহারের জন্য অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন, বিচক্ষণ সেনাপতির রণকৌশলকে কাজে লাগিয়ে বিজয় সুনিশ্চিত করতে হবে।'

তীরের বোঝা সামনে ছড়িয়ে দিয়ে এক এক করে পছন্দসই তীর বেছে নেওয়ার মতো তিনি সকলের চেহারাই মনশ্চক্ষু দিয়ে দেখে নিলেন। কিন্তু কাউকে তাঁর কাছে আশানুরূপ মনে হলো না। তিনি বারবার এ বিষয়ে চিন্তা করতে থাকলেন। কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তে পৌছতে পারলেন না। এক পর্যায়ে হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন :

'হ্যাঁ, এমন একজনকে পেয়েছি, যিনি এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য সবচেয়ে উপযোগী।'

এবার খালীফাতুল মুসলিমীন নিদ্রার মনস্থ করলেন এবং মনে মনে বলতে থাকলেন :

'তিনি এমন এক মুজাহিদ, যিনি বদর, উহুদ, খন্দক এবং অন্যান্য যুদ্ধের ময়দানে তাঁর বীরত্বের প্রমাণ রেখেছেন। এমনকি ইয়ামামার যুদ্ধ-ময়দানও যার কৃতিত্বের সাক্ষ্য দেয়। সে যুদ্ধে তাঁর দৃঢ় ভূমিকার কথাও স্মরণীয়। যার তলোয়ার চালনায় কোনো আঘাত ফসকে যায় না, যার নিক্ষিপ্ত তীরও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। দু'বার যিনি হিজরত করার সৌভাগ্যও অর্জন করেছেন এবং দুনিয়ার বুকে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে সপ্তম ব্যক্তিও তিনি।'

সকাল হয়ে গেলে তিনি উত্‌বা ইবনে গাযওয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তাঁর কাছে ডেকে পাঠালেন। তারপর মাত্র তিন শত সাত বা নয় জন যোদ্ধার সমন্বয়ে গঠিত এ বাহিনীর সেনাপতি হিসেবে তাঁকে মনোনীত করলেন। তাঁর হাতে জিহাদের পতাকা তুলে দিয়ে তাঁকে অতি শীঘ্রই সামরিক সাহায্য পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিলেন।

এই স্বল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে উত্‌বা ইবনে গাযওয়ান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে খালীফাতুল মুসলিমীন উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর সেনাপতিকে নসীহত করেন :

'হে উত্‌বা! আমি তোমাকে 'উবুল্লাহ' অভিযানে পাঠাচ্ছি। 'উবুল্লাহ' শত্রুদের সুরক্ষিত গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি। আল্লাহর কাছে দু'আ করছি, যেন তিনি এ ঘাঁটি বিজয়ে তোমাকে সাহায্য করেন। সেখানে পৌঁছে দুর্গে অবস্থানকারী শত্রুদের আল্লাহর পথে আহ্বান জানাও। তারা যদি তোমার আহ্বানে সাড়া দেয়, তাহলে তাদেরকে খোশ আমদেদ জানাবে। যারা ইসলাম গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করবে, তারা যেন অপমানিত ও লাঞ্ছিত মনোভাব নিয়ে জিযিয়া কর প্রদান করে। যদি তারা এ দুটি শর্ত প্রত্যাখ্যান করে, তাহলেই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে। বিজয় না হওয়া পর্যন্ত দুর্বলতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। তোমাকে যে পদে সমাসীন করা হয়েছে, দায়িত্বশীল হিসেবে তোমার অধীনস্থ সৈন্যদের সাথে ব্যবহারের ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করবে।'

'সাবধান! তোমার নাফসকে এতটুকু প্রশ্রয় দেবে না, যেন সে তোমাকে অহঙ্কারের দিকে ধাবিত করে। যদি তুমি সীমা লঙ্ঘন কর, তাহলে তুমি তোমার আখিরাতকে ধ্বংস করবে। তুমি ভালো করে জান যে, তুমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়েছ এবং মানবেতর জীবন থেকে মহৎ জীবন পেয়েছ। তুমি আজ এমন এক বাহিনীর সেনাপতি, যারা তোমার নির্দেশ পালনে সর্বদা প্রস্তুত। তুমি যা নির্দেশ দেবে সাথে সাথেই তারা তা পালন করবে। তোমার অঙ্গুলি সংকেত মাত্রই এর বাস্তবায়ন হবে। এর থেকে উত্তম কোনো নিয়ামত কী হতে পারে? যদি

ক্ষমতার অপব্যবহার করা হয়, তাহলে সবই বরবাদ হবে। যদি প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ কর, তাহলে নিজেকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। আমরা উভয়েই এ থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাচ্ছি।'

উত্‌বা ইবনে গাযওয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর এই ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে ইরানের 'উবুল্লাহ' শহরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। সাথে ছিলেন তাঁর স্ত্রীসহ অন্য পাঁচজন সৈন্যের স্ত্রী ও বোন। এদের নিয়ে পথ অতিক্রম করতে করতে যখন উবুল্লাহর সন্নিকটে নারিকেলের বাগানবিশিষ্ট জনবসতির নিকট যাত্রা বিরতি করলেন, তখন তাদের সাথে বহন করে আনা খাদ্যভাণ্ডার একেবারেই শেষ। পুরো বাহিনীই ক্ষুধার সম্মুখীন। ক্ষুধা অসহ্য হয়ে উঠলে সেনাপতি উত্‌বা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কয়েকজন যোদ্ধাকে আশপাশ এলাকা থেকে খাদ্য সংগ্রহের দায়িত্ব দিলেন। তারা খাবার সংগ্রহের জন্য বের হলেন। খাদ্য সংগ্রহের এক চমৎকার কাহিনী তাদেরই এক সাথী এভাবে বর্ণনা করেছেন যে :

'খাদ্যের সন্ধান করতে করতে আমরা এক জঙ্গলে ঢুকে পড়লাম। সেখানে আমরা দুটি বস্তায় দু ধরনের খাবারযোগ্য জিনিস দেখতে পেলাম। যার একটা হলো খেজুর আর অন্যটা হলো হলুদ শক্ত খোসা আবৃত ছোট ছোট শস্য দানা। আমরা এ দুই প্রকারের খাদ্যই সৈন্যদের জন্য নিয়ে এলাম।'

আমাদের একজন এই ছোট ছোট দানা দেখে বললেন :

'এটা বিষ। শত্রুরা আমাদের জন্য তৈরি করে রেখেছে। তাই এর ধারে-কাছে যাওয়াও ঠিক হবে না। তাই আমরা খেজুরের দিকে মনোনিবেশ করলাম এবং খেজুরই খেতে থাকলাম। আমরা ছোট দানাবিশিষ্ট খাদ্যকে পরিহার করলাম। এ সময় আমাদের একটি ঘোড়া রশি ছিঁড়ে সেখানে এসে তা খেতে থাকে। আল্লাহর শপথ! আমরা আশঙ্কা করছিলাম যে, ঘোড়াটি মারা যাবে। তাই মৃত্যুর আগেই সেটিকে যবাহ করে এর গোশত কাজে লাগাব এমন চিন্তা করতে লাগলাম।'[১]

---

১. আমাদের দেশে ঘোড়ার গোশ্‌ত খাওয়ার প্রচলন নেই। অথচ শরীআতের দৃষ্টিতে এর গোশ্‌ত হালাল।

কিন্তু ঘোড়ার মালিক এসে বলল :

> 'ঘোড়াটিকে এ অবস্থায়ই থাকতে দাও, আমি আজ রাতে এটিকে পাহারা দিয়ে রাখব। যদি এর মৃত্যুর আশঙ্কা দেখি, তাহলে যবেহ করে ফেলব।'

সকালে আমরা দেখলাম :

> 'ঘোড়াটি সুস্থই আছে। কোনোরূপ বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া এর দেহে নেই।'

আমার বোন আমাকে বলল :

> 'আমি আব্বার কাছে শুনেছি. বিষাক্ত খাদ্য রান্না করলে বা আগুনে তাপ দিলে এর বিষক্রিয়া নষ্ট হয়ে যায়।'

অতঃপর কিছু দানা নিয়ে হাড়িতে জাল দেওয়া হলো। কিছুক্ষণ পরেই সে বলতে থাকে :

> 'তোমরা এসে দেখ, এই দানাগুলো লাল হয়ে যাচ্ছে। অতঃপর সে এর খোসা ফেলে দিলে সাদা সাদা দানা বের হয়ে এল এবং তা খাবার জন্য প্রস্তুত করল।'

তারপর আমরা সেগুলো খাওয়ার জন্য বড় বড় প্লেটে রাখলাম। সেনাপতি উত্‌বা আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন :

> 'খাদ্য গ্রহণের পূর্বে বিসমিল্লাহ পড়ে নাও, তারপর খেতে থাক।' আমরা দেখতে পেলাম তা এক সুস্বাদু খাদ্য। তারপর আমরা এই ছোট ছোট দানাবিশিষ্ট খাদ্য সম্পর্কে জানতে পারি যে, এর নাম হলো ধান।'

উত্‌বা ইবনে গাযওয়ান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এ ছোট বাহিনীকে যে উবুল্লাহ শহরের দিকে পাঠানো হয়েছিল, তা ছিল দাজলা নদীর তীরবর্তী সুরক্ষিত একটি শহর। এ শহর ছিল পারস্য সাম্রাজ্যের অস্ত্রগুদাম। প্রাচীরবেষ্টিত এই শহরের প্রবেশদ্বারগুলোর শৃঙ্গে ছিল শত্রুবাহিনীর গতিবিধির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখার চৌকিসমূহ। এতসব সত্ত্বেও উত্‌বা ইবনে গাযওয়ানের আক্রমণ থেকে তারা উবুল্লাহ শহরকে রক্ষা করতে পারল না। যদিও তাঁর সমরশক্তি ছিল একেবারেই নগণ্য ও অস্ত্রের ছিল খুবই অপ্রতুলতা। অপরদিকে উমর ফারূক

রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁকে বহু কষ্টে মাত্র ছয় শত যোদ্ধা দিয়ে সহযোগিতা করতে পেরেছিলেন। যাদের সাথে ছিল স্বল্পসংখ্যক মহিলা। যুদ্ধাস্ত্র বলতে তাদের হাতে ছিল মাত্র তরবারি ও বর্শা। পারস্যের অত্যাধুনিক অস্ত্রের মোকাবেলায় বুদ্ধিমত্তার সাথে সেনাপতির দ্বারা সেগুলোর ব্যবহারই ছিল মুসলিম বাহিনীর একমাত্র সম্বল।

উত্‌বা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মহিলাদের বর্শার মাথায় উড়ানোর জন্য ঝাণ্ডা তৈরি করালেন। যেন তারা মুসলিম বাহিনীর বেশ পিছনে অবস্থান নিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকে। তাদেরকে এ নির্দেশও দেওয়া হলো যে, মুসলিম বাহিনীর অগ্রগামী অংশ উবুল্লাহ শহরের কাছে পৌঁছলে তার পেছনের অংশ এমনভাবে ধুলা উড়াতে থাকবে, যেন আকাশ ধুলায় ধূসরিত হয়ে যায়। এতে যেন তারা কোনো দুর্বলতা না দেখায় এবং মহিলারা যেন সাহসিকতার সাথে ধুলা উড়াতে উড়াতে মুসলিম বাহিনীর অনুসরণ করতে থাকে। মুসলিম বাহিনী উবুল্লাহ শহরের সন্নিকটে পৌঁছতেই তাদের প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে পারস্য সৈন্যরা বেরিয়ে আসে। মুসলিম বাহিনীকে হঠাৎ তাদের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত দেখে সবাই হতভম্ব হয়ে যায়। তারা আরও দেখে যে, এ বাহিনীর পিছনে আকাশ ধুলায় ধূসরিত হয়ে পড়েছে এবং তার ফাঁকে ফাঁকে ঝাণ্ডা উড়ছে। এসব আলামত থেকে পারস্য বাহিনী মনে করল যে, পিছনে আরো অগণিত সৈন্য অগ্রগামী বাহিনীর সাহায্যার্থে অগ্রসর হচ্ছে। এ দেখে তারা তৎক্ষণাৎ নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতে থাকে যে :

> 'দ্বারপ্রান্তে মুসলিম অগ্রগামী দল, নিশ্চয়ই পিছনে রয়েছে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুসংগঠিত নিয়মিত বাহিনী। তাদের সংখ্যা অনেক হওয়ার কারণে তাদেরই ঘোড়ার খুরের আঘাতে আকাশ ধূলি ধূসরিত হচ্ছে। আমরা সংখ্যায় মুসলিম বাহিনীর তুলনায় একান্তই নগণ্য।'

এসব চিন্তা-ভাবনায় তাদের মনোবল ভেঙে পড়ে। তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। মুসলিম বাহিনীকে প্রতিরোধের পরিবর্তে তারা দিশেহারা হয়ে দ্রুত পালাতে থাকে। তাদের হাতের কাছে হালকা ও মূল্যবান সামগ্রী যে যা পারল তা নিয়ে দ্রুতগতিতে দাজলা নদীতে নোঙ্গর করে রাখা নৌকাগুলোতে গিয়ে উঠে উবুল্লাহ শহর থেকে পালাতে থাকল।

বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে রণ-চতুরতা প্রয়োগ করে উত্‌বা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রক্তপাতহীন বিজয় লাভের মাধ্যমে উবুল্লাহ শহরে প্রবেশ করলেন। অতঃপর এ অভিযানকে অব্যাহত রেখে উবুল্লাহর পার্শ্ববর্তী শহর-গ্রামগুলো অধিকার করতে থাকলেন। এসব অভিযানে মুসলিম বাহিনী অগণিত মালে গনীমত অর্জন করলেন। প্রতিজনের অংশে সেগুলো এত পরিমাণ দেওয়া হলো যে, তা কল্পনা করাও কঠিন। এমনকি তাদের একজন মদীনায় ফেরত এলে উবুল্লাহ বিজয়ীদের অবস্থা জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তরে বললেন :

> 'তাদের অবস্থা আর কী জিজ্ঞাসা করছেন, রৌপ্য ও স্বর্ণমুদ্রাকে খাঁচি হিসেবে মেপে মেপে বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে।'

এ সংবাদ শুনে মদীনার জনগণ এতই খুশি হলো যে, বসবাসের উদ্দেশ্যে উবুল্লাহর দিকে যেতে লাগল।

সীমাহীন প্রাচুর্যের এই শহরে সৈন্যদের বেশি দিন রাখলে তারা স্থানীয় অধিবাসীদের ন্যায় ভোগ-বিলাসে অভ্যস্ত হয়ে পড়তে পারে ভেবে উত্‌বা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ধন-দৌলতের এত প্রাচুর্যের মাঝে থাকলে শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষায় ভাঁটা পড়বে ও যুদ্ধ-জিহাদে অনীহা দেখা দেবে। এসব আশঙ্কা করে খালীফাতুল মুসলিমীন উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে উবুল্লাহ শহর থেকে দূরে সেনানিবাস হিসেবে বসরা শহর তৈরির অনুমতি চেয়ে পাঠালেন। উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর দূরদর্শিতায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বসরায় সেনানিবাস গড়ার অনুমতি প্রদান করেন। খালীফাতুল মুসলিমীনের অনুমতি পেয়ে উত্‌বা ইবনে গাযওয়ান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নতুন শহরের ডিজাইন ও ম্যাপ তৈরি করলেন। সর্বপ্রথম তিনি বসরায় বিশাল জামে মসজিদ তৈরি করলেন। তাকে আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামরিক প্রশিক্ষণ, সামাজিক ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করলেন। যার বদৌলতে তিনি ও তার বাহিনী শত্রুদের ওপর বিজয় অর্জন করতে এবং ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হলেন। অতঃপর মুসলিম বাহিনী একের পর এক শহর, নগর, গ্রাম-গঞ্জ জয় করে চলল। এমনকি এক পর্যায়ে তাদের মধ্যে বিজিত শহরে তাদের নামে জায়গা বরাদ্দ ও নিজেদের জন্য বাড়ি-ঘর নির্মাণের

প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে গেল; কিন্তু উত্‌বা ইবনে গাযওয়ান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজের নামে কোনো জায়গাও বরাদ্দ নিলেন না এবং কোনো ঘর-বাড়িও নির্মাণ করলেন না। সৈনিকদের জন্য নির্ধারিত একটি সাধারণ তাঁবুতে বসবাস করাকেই তিনি অগ্রাধিকার দিলেন। কেননা, তিনি তাঁর পবিত্র অন্তরে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ঘর-বাড়ির চেয়ে পরকালের চিরস্থায়ী জান্নাতের বিরাট আশাকেই প্রাধান্য দিয়ে আসছিলেন।

উত্‌বা ইবনে গাযওয়ান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু গভীরভাবে লক্ষ্য করলেন যে,

> বসরায় অবস্থানরত সৈন্যরা দুনিয়ার প্রতি ভীষণভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। ভোগ-বিলাসে এতই নিমগ্ন হয়ে পড়েছে যে, তারা নিজের সত্তাকেই ভুলে যাচ্ছে। কিছুদিন পূর্বেও যে বাহিনীর সদস্যরা ধান থেকে চাল বের করে তা দ্বারা সুস্বাদু খাদ্য হতে পারে বলে জানত না। মাত্র কিছুদিনের ব্যবধানে পারসিকদের বিখ্যাত মিষ্টি সামগ্রী 'ফালুযাজ' এবং ঘি, মধু, মাখন এবং পেস্তাদানা ইত্যাদির সমন্বয়ে তৈরি 'লাওযিনাজ' নামক খাদ্য সামগ্রী আজ তাদের নিত্যদিনের খাদ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত।'

তাদের এ অবস্থা দেখে তিনি দুনিয়ার পার্থিব মোহ ও প্রয়োজনের চেয়ে অধিক পাওয়ার চেষ্টা না করে পরকালের প্রতি আরও অধিক আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন।

অতঃপর তিনি কুফার জামে মসজিদে সবাইকে সমবেত করে তাদের উদ্দেশ্যে বললেন :

> 'সমবেত ভাইয়েরা! এ দুনিয়া ধ্বংসশীল ও ক্ষণস্থায়ী, যে তার অন্তিম লগ্ন অতিবাহিত করছে এবং আপনারা এ দুনিয়া থেকে সত্বর চিরস্থায়ী বাসস্থানে ফিরে যেতে বাধ্য। অতএব, আপনারা উত্তম পাথেয়সহ সেখানে গমন করার চিন্তা করুন। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সপ্তম সাহাবী। গাছের পাতা ছাড়া উত্তম খাদ্য বলতে আমাদের ভাগ্যে আর কিছুই জোটেনি, যা খেয়ে আমাদের মুখে ঘা হয়ে যেত। পরিত্যক্ত এক টুকরা চাদর পেয়ে একদিন আমি ও সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস ভাগাভাগি করে নিয়েছিলাম। যার একাংশ দিয়ে আমি জামা তৈরি করেছিলাম এবং অন্য অংশ দিয়ে সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস পরিধানের লুঙ্গি হিসেবে ব্যবহার করেছিল। আজ

আমরা উভয়ই এক এক প্রদেশের গভর্নর। নিজের নাফসের কাছে বিরাট ব্যক্তিত্ব ও সম্মানিত এবং আল্লাহর নিকট নিকৃষ্ট ও লজ্জিত হওয়া থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।'

অতঃপর একজনকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে তাদেরকে পেছনে রেখে মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে পড়েন। মদীনায় খালীফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খিদমতে পৌঁছে তাঁকে মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি, কুফা ও বসরার গভর্নরের পদ থেকে অব্যাহতি দানের আবেদন জানান। হযরত উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুও তাঁকে দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে কুফায় প্রত্যাগমনের জন্য চাপ দিতে থাকেন। পরস্পরের অনুরোধ ও পাল্টা অনুরোধের এক পর্যায়ে তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও হযরত উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নির্দেশ মেনে নিতে বাধ্য হন। মনঃক্ষুণ্ন অবস্থায় কুফার উদ্দেশ্যে উটে চড়ে এই দু'আ করতে থাকেন :

'হে আল্লাহ! আমাকে কুফায় আর ফিরিয়ে নিও না, হে আল্লাহ! আমাকে কুফায় আর ফিরিয়ে নিও না।'

আল্লাহ সাথে সাথে তাঁর দু'আ কবুল করলেন। মদীনা থেকে কিছু দূরে যেতে না যেতেই তাঁকে বহনকারী উটটি হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলে তিনিও ছিটকে মাটিতে পড়ে গিয়ে সাথে সাথে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

---

উত্‌বা ইবনে গাযওয়ান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জীবনী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সহায়ক গ্রন্থাবলি :

১. আল ইসাবা : জীবনী নং ৫৪১১।
২. আল ইসতিয়াব : বিহামিশিল ইসতিয়াব : ৩য় খণ্ড, ১১৩ পৃ.।
৩. তারীখুল ইসলাম লিযযাহাবী : ২য় খণ্ড, ৭ পৃ.।
৪. উসদুল গাবাহ : ৩য় খণ্ড, ৩৬৩ পৃ.।
৫. তারীখু খলীফাতু ইবনে খিয়াত : ১ম খণ্ড, ৯৫-৯৮ পৃ.।
৬. আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ : ৭ম খণ্ড, ৪৮ পৃ.।
৭. মু'জামুল বুলদান : বসরা বিষয়ক আলোচনা : ১০ খণ্ড, ৪৩০ পৃ.।

৮. আত তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সা'দ : ৭ম খণ্ড, ১ পৃ.।
৯. তারীখুত তাবারী : ১০ খণ্ডের সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।
১০. সিয়ারু ই'লামুন নুবালা : ১ম খণ্ড, ২২১-২২২ পৃ.।
১১. হায়াতুস সাহাবা : ৪র্থ খণ্ড, সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।

# নু'আঈম ইবনে মাসঊদ (রা)

*'নু'আঈম ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জানতেন, শত্রুপক্ষকে ধোঁকা দেওয়াও যুদ্ধেরই একটি কৌশল।'*

তীক্ষ্ণ মেধার জাগ্রতপ্রাণ, দৃঢ় মনোবল, কর্মচঞ্চল ও ঝটপট কঠিন পরিস্থিতি বুদ্ধিমত্তার সাথে মোকাবেলা করতে পারঙ্গম মরুসন্তান যুবক নু'আঈম ইবনে মাসঊদ। মুহূর্তেই বাড়িতে, পর মুহূর্তেই সফরে, তার রুটিন কী তা একমাত্র সে-ই জানে। বহুমুখী গুণাবলির অধিকারী, নাচ, গান ও নর্তকীপ্রিয় নজদের সৌখিন এ যুবকের আমোদ-প্রমোদ ও বিলাসিতার যেমন জুড়ি ছিল না, তেমনি নাচ গানের প্রতিও তার ছিল প্রবল ঝোঁক। এসব নানা কারণেই সে ইয়াসরিবের ইহুদীঘেঁষা হয়ে ওঠে।

আমোদ-প্রমোদ, গান ও বাজনার ইচ্ছা করলেই সে ইয়াসরিবের পথে রওনা হতো। তার ভোগ-বিলাসের খায়েশ পূরণের জন্য ইয়াসরিবের ইহুদীদের অঢেল অর্থ দান করত। এসব কারণে সর্বদাই তার ইয়াসরিবে যাতায়াত অব্যাহত থাকত। ইহুদীদের বিশেষ করে বনূ কুরাইযা গোত্রের সাথে তার সম্পর্কও ছিল নিবিড় ও মধুর। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানবজাতির কল্যাণ এবং মঙ্গলের জন্য মক্কায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দীনে হক ও হেদায়াতসহ প্রেরণ করলেন। প্রথমে মক্কায় ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়লে নু'আঈম ইবনে মাসঊদ ইসলাম থেকে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। কারণ মাত্র একটিই, ইসলাম গ্রহণ তার ভোগ-বিলাস ও আমোদ-প্রমোদে বাধা না হয়ে দাঁড়ায়। তাহলে তো এ দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সবই পরিহার করতে হবে তাকে। এসব

ভেবে সে ইসলামকে শুধু এড়িয়েই চলল না; বরং যারা ইসলামের চরম শত্রু তাদের সহযোগী হয়ে উঠল।

নু'আঈম ইবনে মাসঊদ ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে খন্দক বা আহযাবের যুদ্ধে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা করে। তার এই পরিবর্তিত ঘটনা সে নিজ হাতেই পরবর্তীতে লিপিবদ্ধ করে। ইতিহাসের পাতা তার সেই ভূমিকার কথা অদ্যাবধি স্বর্ণাক্ষরে ধারণ করে আছে। নু'আঈম ইবনে মাসঊদের জীবনী আলোচনার পূর্বে পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা দরকার।

খন্দক বা আহযাব যুদ্ধের মাত্র কিছুদিন পূর্বে ইয়াসরিবের বনূ নযীর গোত্রের ইহুদীরা এবং তাদের নেতৃবৃন্দ ইসলামকে চিরতরে নির্মূল করার চক্রান্ত করে। এ জন্য তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। তারা মক্কার কুরাইশ নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করে। তাদের সাথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় যে, কুরাইশ বাহিনী মদীনায় পৌঁছলে তারা তাদের সাথে যোগ দেবে। সে লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য দিন-তারিখও ধার্য করা হয়। সাথে সাথে নির্ধারিত তারিখের ব্যতিক্রম যাতে না হয়, সে দিকটির প্রতিও গুরুত্বারোপ করে। কুরাইশদের সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার পর তারা নজদের 'গাতফান' গোত্রের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য রওয়ানা হয়। ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে তাদেরকেও প্ররোচিত করে এবং এই নতুন দীন ইসলামের মূলোৎপাটনের জন্য তাদের আহ্বান জানায়। কুরাইশদের সাথে তাদের গোপন সম্পর্কের ব্যাপারেও তাদের অবহিত করে। তারা গাতফান গোত্রের সাথেও একই ধরনের প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হয়, যেমনটি হয়েছিল কুরাইশদের সাথে। কুরাইশদের মতো তাদের সাথেও সময় ও দিন-তারিখ নির্ধারণ করে। প্রতিশ্রুতি মোতাবেক মক্কার কুরাইশদের সর্বস্তরের মানুষ তাদের নেতা আবূ সুফিয়ানের নেতৃত্বে মদীনার উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ে। গাতফান গোত্রের লোকজনও উওয়াইনা ইবনে হিস্‌ন আল গাতফানীর নেতৃত্বে বের হয়ে আসে। গাতফান বাহিনীর অগ্রভাগে ছিল আমাদের এ কাহিনীর নায়ক নু'আঈম ইবনে মাসঊদ।

কুরাইশ ও গাতফান গোত্রের সম্মিলিত বাহিনী যে মদীনা আক্রমণ করতে আসছে, এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যথাসময়েই পৌঁছে। তিনি পরামর্শের জন্য সাহাবীদের সাধারণ সভার আহবান করেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেন যে, মদীনার চারপাশে খন্দক খনন করা হবে। আক্রমণকারী বাহিনী অকস্মাৎ এই খন্দকে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে সম্মুখে অগ্রসর হতে ব্যর্থ হবে। তখন এ খন্দককে সামনে রেখে মুসলিম বাহিনী তার সুদৃঢ় অবস্থান নিয়ে তাদের মোকাবেলা করবে। পরিকল্পনা মোতাবেক মক্কা ও নজদ থেকে বিরাট দুই বাহিনী মদীনার প্রবেশদ্বারের সন্নিকটে এসে খন্দক দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। এদিকে বনী নাযীর গোত্রের ইহুদী নেতৃবর্গ মদীনায় বসবাসরত বনু কুরাইযা ইহুদী গোত্রের নেতৃবৃন্দের সাথে মিলিত হয়। তাদেরকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কৃত সন্ধি ভঙ্গ করে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রস্তাব দেয়। নজদ থেকে আগত এই বিশাল বাহিনীর প্রতি সহযোগিতার হাত সম্প্রসারণের জন্যও প্ররোচিত করতে থাকে। বনী কুরাইযা গোত্রের নেতৃবর্গ তাদেরকে বলে :

> 'সত্যিকারার্থে আমরা যা চাই ও পছন্দ করি, আপনারা আমাদেরকে সেদিকেই আহবান করছেন। কিন্তু সমস্যা হলো, আপনারা ভাল করেই জানেন যে, আমাদের ও মুহাম্মদ-এর মধ্যে শান্তি চুক্তি হয়েছে এ শর্তে যে, শত্রুর আক্রমণে আমরা তাঁকে সাহায্য করব। অন্যদিকে সেও আমাদেরকে মদীনায় শান্তিতে বসবাসের নিশ্চয়তা প্রদান করবে। আপনারা এও ভালো করে জানেন যে, অদ্যাবধি তার সাথে আমাদের কৃত চুক্তির ব্যাপারে কোন অভিযোগ করার মতো কারণ ঘটেনি। আমরা আশঙ্কা করছি, মুহাম্মদ যদি এ যুদ্ধে বিজয়ী হয়, তাহলে সে কঠোর ও নির্দয় হস্তে আমাদের এ বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নেবে এবং চিরতরে আমাদেরকে মদীনা থেকে উচ্ছেদ করে ছাড়বে।'

কিন্তু বনূ নযীর নেতৃবর্গ চুক্তিভঙ্গের জন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতেই থাকে। তারা শান্তিচুক্তি প্রত্যাখ্যানের সুফল ও ভবিষ্যৎ কল্যাণের আশ্বাসও প্রদান করে। তারা নিশ্চয়তা দান করে যে :

'নিঃসন্দেহে এ যুদ্ধে মুহাম্মদ পরাজিত হবেই। তাদের বিশাল দুটি বাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণে মুসলমানগণ পরাজিত হবে বলে তারা তাদেরকে আশান্বিত করে তোলে।'

পরিশেষে বনূ কুরাইযার ইহুদীরা তাদের প্ররোচনায় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কৃত চুক্তিভঙ্গ করে আক্রমণকারী বাহিনীর সাথে যুদ্ধে যোগদানের ঘোষণা দেয়। মদীনার অভ্যন্তরে বসবাসরত ইহুদীদের চুক্তিভঙ্গ করে আক্রমণকারীদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণের এই সংবাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানদের উপর বজ্রপাতের মতো আপতিত হয়।

আক্রমণকারী বাহিনী মদীনা অবরোধ করে খাদ্য ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব ভালো করেই বুঝতে পারলেন যে, তিনি দুই দিক দিয়েই শত্রুবেষ্টিত হয়ে পড়েছেন। কুরাইশ ও গাতফান বাহিনী মদীনার বাইরে মুসলমানদের মুখোমুখি ছাউনি গেড়ে এবং বনূ কুরাইযার ইহুদীরা মদীনার অভ্যন্তরে বসে মুসলমানদেরকে পেছনের দিক থেকে আক্রমণের জন্য ওৎ পেতে থেকে। অপরদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথীদের মধ্যে 'মুনাফিকরা' বলতে থাকে :

'মুহাম্মদ আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, আমরা রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যের ধনভাণ্ডারের মালিক হয়ে যাবো। অথচ এখন আমাদের এক একজনের অবস্থা হলো নিরাপদে প্রাকৃতিক প্রয়োজনে পর্যন্ত যেতে পারছি না।'

এরপর মুনাফিকরা দলে দলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে এ বলে চলে যেতে লাগল :

'বনূ কুরাইযা গোত্র চুক্তিভঙ্গ করায় মদীনায় আমাদের স্ত্রী-পরিবার- পরিজন, সন্তান-সন্ততি ও বাড়ি-ঘর হুমকির সম্মুখীন।'

তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ কথাও ব্যক্ত করল যে :

'যুদ্ধ মারাত্মক আকার ধারণ করলে বনূ কুরায়যা গোত্রের আক্রমণ থেকে তারাও নিরাপদ নয়।'

এভাবে দেখা গেল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে শেষ পর্যন্ত কয়েক শ' সত্যিকার ঈমানদার সাহাবী যুদ্ধ-ময়দানে অবশিষ্ট থাকলেন।

ক্রমাগত বিশ দিনের অবরোধের মধ্যে কোনো এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যাকুলভাবে বারবার এই বলে আল্লাহর দরবারে দু'আ করতে থাকেন :

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ، اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ ـ

'হে আল্লাহ! তোমার কাছে সাহায্য চাচ্ছি, যে সাহায্যের তুমি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ।'

এদিকে রুটিন মোতাবেক সে রাতেও নু'আঈম ইবনে মাসউদ তার শয্যা গ্রহণে যায়। কিন্তু আজ তার চোখে ঘুম নেই, তার দু'চোখের পলকে যেন কাঁটা ফুটছে। সর্বশক্তি নিয়োগ করেও সে ঘুমের ধারে-কাছেও পৌঁছতে সমর্থ হলো না। তার থেকে ঘুম যেন হাজার মাইল দূরে। বিনিদ্র রজনীতে আকাশের অসংখ্য তারকারাজির দিকে তাকিয়ে রইল সে। আজ সে খুব বেশি দুশ্চিন্তার শিকার। চিন্তার সাগরে সে যেন হাবুডুবু খাচ্ছে। চিন্তার শেষ নেই। হঠাৎ যেন এক সময় সে সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেল। তার বিবেক তাকে ভিতর থেকে বলে উঠল :

'ধিক্কার তোমাকে হে নু'আঈম। সুদূর নজদ থেকে এই দূর-দূরান্তে কেন এসেছ? কিসে তোমাকে এই মহান ব্যক্তি ও তাঁর সাথীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে নিয়ে এসেছে। কিসের স্বার্থে? এ যুদ্ধ কি তোমার ছিনিয়ে নেওয়া অধিকার প্রতিষ্ঠার? নাকি তোমার লুণ্ঠিত সম্ভ্রমের প্রতিশোধের?'

'অকারণে তুমি এখানে এসেছ নু'আঈম! ধিক্কার তোমাকে...।'

তার অনুতপ্ত মন তাকে ধিক্কার দিয়ে বলতে থাকল :

'তোমার মতো একজন বিজ্ঞ লোকের পক্ষে কি অকারণে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হওয়া শোভা পায়? সৎ ও নির্দোষ এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে কে তোমাকে উৎসাহিত করেছে? যিনি তাঁর অনুসারীদের ন্যায়বিচার ও পরোপকারের আদেশ এবং নিকটাত্মীয়দের অধিকার প্রদানে সর্বদা নির্দেশ দিয়ে থাকেন, তাঁর বিরুদ্ধে তুমি যুদ্ধ করতে এসেছ? কে তোমাকে তাঁর

সাথীদের রক্তপাত ঘটানোর উদ্দেশ্যে চমকানো বর্শা বহনে অনুপ্রাণিত করেছে? যারা একমাত্র সত্য ও হেদায়াতের উদ্দেশ্যেই নিবেদিত, তুমি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এসেছ?'

নু'আঈম ও তার বিবেকের এই বিতর্ক বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। বিতর্কের পরিসমাপ্তি ঘটল। সে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হলো। রাতের অন্ধকারে নু'আঈম গাতফান গোত্রের সৈন্য ছাউনি থেকে সবার নজর এড়িয়ে দ্রুতগতিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সামনে উপস্থিত দেখে বললেন :

'তুমি কি নু'আঈম ইবনে মাসউদ?'

সে উত্তরে বলল :

'হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল!'

'গভীর রাতে এ মুহূর্তে কী উদ্দেশ্যে এসেছ?'

নু'আঈম উত্তর দিলো :

'একমাত্র কালেমা শাহাদাতের সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আপনার খিদমতে উপস্থিত হয়েছি।'

এই বলেই সে কালেমা শাহাদাত পাঠ করল। অতঃপর আরয করল :

'হে আল্লাহর রাসূল। আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। এ কথা গাতফান গোত্রের কেউ জানে না। এ মুহূর্তে আমাকে যে কোনো খিদমতের জন্য নির্দেশ দিন।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন :

إِنَّمَا أَنْتَ فِينَا رَجُلٌ وَاحِدٌ ... فَاذْهَبْ إِلٰى قَوْمِكَ وخَذِّلْ عَنَّا إِنْ اسْتَطَعْتَ فَإِنَّ الْحَرْبَ خُدْعَةٌ ۔

'তুমিই আমাদের একমাত্র ব্যক্তি, যে এ মুহূর্তে কূটনৈতিক চাল চালতে পার। তুমি যদি পারো গাতফান গোত্রকে যুদ্ধ-ময়দান থেকে ভাগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা কর। কেননা, শত্রুপক্ষকে ধোঁকায় ফেলা সমর-কৌশলেরই অংশ।'

নু'আঈম বললেন :

'হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার দ্বারা আপনি এমন কিছু দেখতে পাবেন, যা আপনাকে সন্তুষ্ট করবে, ইনশাআল্লাহ।'

এই বলে নু'আঈম ইবনে মাসউদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমত থেকে সে মুহূর্তেই বনূ কুরাইযা গোত্রের আস্তানায় তার আগের সঙ্গী-সাথীদের কাছে গেলেন। তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা ও কথাবার্তার এক পর্যায়ে তাদের বললেন :

'হে বনূ কুরাইযার ভাইয়েরা! আমি যে তোমাদের একজন বিশ্বস্ত ও অন্তরঙ্গ বন্ধু তা তো তোমরা ভালো করেই জান। সর্বদা তোমাদের প্রতি আমার সৎপরামর্শ ও আন্তরিকতার ব্যাপারেও অবগত।'

তারা বলল :

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ নু'আঈম! তুমি আমাদের নিকট নিঃসন্দেহে আস্থাভাজন ব্যক্তি।'

তাদের পক্ষ থেকে নিশ্চিত হয়ে অতঃপর বললেন :

'এ যুদ্ধে কুরাইশ ও গাতফান গোত্রের অবস্থান তোমাদের অবস্থান থেকে নিঃসন্দেহে ভিন্নতর।'

তারা বলল, কিভাবে?

নু'আঈম বললেন :

'মদীনা তোমাদের নিজেদের শহর। এ শহরেই তোমাদের ধন-সম্পত্তি, সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী-পুত্র সবই অবস্থান করছে। কোনোক্রমেই তোমরা এসব অন্যের হাতে ছেড়ে দিতে পার না। অপরদিকে কুরাইশ ও গাতফানদের ধন-সম্পত্তি, অর্থ-কড়ি, সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রী-পুত্র সবই মদীনার বাইরে তাদের নিজেদের শহরে। তারা সেখান থেকে মুহাম্মদের সাথে যুদ্ধ করতে এসেছে। তারা তোমাদের শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করে তার বিরুদ্ধে সহযোগিতা করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। যদি তারা বিজয়ী হয়, তাহলে মুহাম্মদের ধন-সম্পত্তিকে মালে গনীমত হিসেবে তারাই নেবে। আর যদি কুরাইশ ও

গাতফানদের বাহিনী পরাজিত হয়, তাহলে মুহাম্মদের তাড়া খেয়ে তারা তোমাদেরকে মুহাম্মদের হাতে ফেলে রেখে নিরাপদেই স্ব-স্ব গোত্রে ফিরে যাবে। সে ক্ষেত্রে মুহাম্মদ তোমাদের থেকে চরম প্রতিশোধ গ্রহণ করবে, যা কল্পনাও করতে পারছ না। তোমরা ভালো করেই জান যে, এককভাবে মুহাম্মদের মোকাবেলা করার শক্তি তোমাদের নেই।'

তারা বলল :

'ঠিকই বলছ। এখন তোমার পরামর্শ কী?'

তিনি বললেন :

'আমার কাছে এর একমাত্র সমাধান হলো, যতক্ষণ না তোমরা তাদের নেতৃস্থানীয় কিছু লোককে জামানত হিসেবে তোমাদের কাছে না রেখেছ, ততক্ষণ তোমরা তাদের সাথে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করো না। তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের জামানত হিসেবে রাখতে পারলেই তারা সর্বশক্তি দিয়ে মুহাম্মদের বিরুদ্ধে প্রাণপণে যুদ্ধে নেমে পড়বে। হয় বিজয়, নয় তোমাদের ও তাদের শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত নিঃশেষ।'

তারা বলে উঠল :

'হ্যাঁ, তুমি উত্তম পরামর্শ দিয়েছ।'

অতঃপর তাদের থেকে বিদায় নিয়ে নু'আঈম ইবনে মাসউদ কুরাইশ সেনাপতি আবূ সুফিয়ান ইবনে হারবের কাছে এসে তাকে ও তার সঙ্গী নেতৃস্থানীয়দের বললেন :

'কুরাইশ ভাইয়েরা! মুহাম্মদের সাথে আমার শত্রুতা ও তোমাদের সাথে আমার আন্তরিকতা ও সহৃদয়তার কথা তোমরা ভালো করেই জান। আমার কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পৌঁছেছে, যা তোমাদের জানান আমি আমার গুরুদায়িত্ব বলে মনে করি। তোমাদের প্রতি আমার অনুরোধ হলো, বিষয়টি তোমাদের মধ্যেই সীমিত রাখবে এবং আমার বরাত বা হাওয়ালা দিয়ে তা কখনো প্রচার করবে না। তারা কথা দেয় যে, এ ব্যাপারে আমরা অবশ্যই তোমার অনুরোধের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করব।'

অতঃপর নু'আঈম বলেন :

'বনূ কুরাইযা গোত্র মুহাম্মদের বিরুদ্ধাচরণে অনুতপ্ত। তারা মুহাম্মদের কাছে দূত পাঠিয়ে আবেদন করেছে যে, আমরা আমাদের কৃতকর্মের জন্য ভীষণভাবে অনুতপ্ত। আমরা শান্তিচুক্তি পুনর্জীবিত করে সন্ধিভুক্ত হতে চাই। আপনার সদয় সম্মতি পেলে আমরা কুরাইশ ও গাতফান গোত্রের বেশ কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের এনে আপনার কাছে সোপর্দ করতে চাই, যেন আপনি তাদের শিরশ্ছেদ করতে পারেন। আপনাকে এই শিকার সংগ্রহ করে দেওয়ার মাধ্যমে আমরা তাদের বিরুদ্ধে আপনার সাথে মিলিত হতে চাই।' মুহাম্মদ তাদের এ প্রস্তাবে রাজি হয়েছে। ইহুদীরা যদি তোমাদের কাছে জামানত চায়, আমার অনুরোধ, তাহলে কাউকেও জামানত হিসেবে দেবে না।'

আবূ সুফিয়ান বলল :

'এ গোপন সংবাদ প্রদানের মাধ্যমে নিঃসন্দেহে তুমি আমাদের প্রকৃত বন্ধুদের দাবিই পূরণ করলে।'

অতঃপর নু'আঈম ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু আবূ সুফিয়ানের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে গাতফান গোত্রের অন্যান্য নেতাদের সাথে মিলিত হন। আবূ সুফিয়ানের সাথে তিনি যেভাবে কথা বলেছেন, তাদের কাছেও অনুরূপভাবে কথা বলেন। আবূ সুফিয়ানকে যেভাবে সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছিলেন তাদেরও অনুরূপ পরামর্শ দেন।

প্রাপ্ত সংবাদের ভিত্তিতে আবূ সুফিয়ান বনূ কুরাইযার মনোভাবকে যাচাই করার জন্য তাদের কাছে পরের দিন ভোর হতে না হতেই তার নিজ ছেলেকে দূত হিসেবে পাঠাল। তার ছেলে বনূ কুরাইযার নেতৃবর্গের কাছে গিয়ে বলল :

'আমার পিতা আবূ সুফিয়ান আপনাদের খিদমতে সালাম আরয করেছেন এবং বলে পাঠিয়েছেন যে, যেহেতু আমরা মুহাম্মদ এবং তার সঙ্গী-সাথীদেরকে দীর্ঘদিন যাবৎ অবরোধ করে রেখেছি, যার ফলে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমরা চাচ্ছি, কালবিলম্ব না করে মুহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

আরম্ভ করি এবং এই অবরোধের সমাপ্তি ঘটাই। আপনাদের খিদমতে আমার পিতা আমাকে এ জন্যই পাঠিয়েছেন, যেন আগামীকালই আমাদের ও আপনাদের এ যৌথ আক্রমণের সূচনা হয়।

ইহুদীরা তাকে বলে :

'আগামীকাল শনিবার। আমাদের ধর্মমতে পবিত্র দিন। আমরা কাল কোনো মতেই যুদ্ধে জড়িত হতে পারব না। এ ছাড়াও আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সাহায্যার্থে যুদ্ধে জড়িত হতে পারব না, যতক্ষণ না আপনাদের কুরাইশ গোত্র ও গাতফান গোত্রের সত্তরজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে আমাদের কাছে জামানত হিসেবে না রাখবেন। কারণ, আমরা আশঙ্কা করছি, প্রচণ্ড যুদ্ধের ভয়াবহতা সহ্য করতে না পেরে আপনারা আমাদেরকে একা মুহাম্মদের হাতে বলির পাঁঠা হিসেবে ছেড়ে দিয়ে স্ব-স্ব আবাসভূমিতে পালিয়ে যেতে পারেন। আপনারা ভালো করেই জানেন যে, সে পরিস্থিতিতে মুহাম্মদের মোকাবেলা করার সাধ্য আমাদের নেই।'

আবূ সুফিয়ানের পুত্র কুরাইশ সৈন্য ছাউনিতে ফিরে এসে তাদেরকে বনূ কুরাইযা গোত্রের নেতৃবৃন্দের ভূমিকা সম্পর্কে অবগত করলে তারা ক্ষোভ ও ধিক্কারের সাথে সমস্বরে বলে উঠল :

'শূকর ও বানরের সন্তানেরা বড়ই জঘন্য শর্তারোপ করেছে...। আমরা আল্লাহর শপথ করে বলছি, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ তো দূরের কথা, তারা যদি আমাদের কাছে একটা ছাগলছানাও জামানত হিসেবে দাবি করে সেটাও তাদের দেওয়া হবে না।'

অবরোধকারী ও মিত্র এ জোটে ফাটল ধরাতে এবং তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে নু'আঈম ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর চালে পুরোপুরিই সাফল্য লাভ করলেন। অপরদিকে আল্লাহ কুরাইশ ও তাঁর মিত্র বাহিনীর ওপর পাঠালেন প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টিসহ প্রলয়ঙ্করী ঝড়ো হাওয়া ও তুফান। যে তুফান তাদের তাঁবুর রশি ছিঁড়ে লণ্ডভণ্ড করে ফেলল। ডেক-ডেকচিগুলো এদিক-সেদিক উড়িয়ে নিয়ে গেল ও আগুন নিভিয়ে ফেলল। তাদের চোখে-মুখে ধুলাবালি নিক্ষিপ্ত করে প্রায়

অন্ধ করে দিল। শুধু লোকজনই নয় উট, গাধা, ঘোড়া ও যানবাহন বলতে যা কিছু ছিল সেসবও ছিঁড়ে-ছুটে এদিক-সেদিক ছুটে গেল। রাতের অন্ধকারে প্রাণভয়ে কুরাইশ বাহিনীও মদীনা থেকে পালিয়ে গেল। সকালে যখন মুসলিম বাহিনী দেখতে পেল যে, আল্লাহর দুশমনেরা পলায়ন করেছে, তখন তারা আনন্দে বলতে থাকল :

'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন। তাঁর বাহিনীকে বিজয়ী করেছেন এবং তিনি নিজেই আক্রমণকারী মিত্র বাহিনীকে পরাজিত করেছেন।'

নু'আঈম ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সেদিন থেকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একান্ত আস্থাভাজন ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হলেন। তাঁকে অতি সম্মানে ভূষিত করে তাঁর হাতে গাতফান গোত্রের পতাকা প্রদান করা হলো। তাঁকে সামরিক বাহিনীর ডিভিশনাল কমান্ডার থেকে শুরু করে প্রাদেশিক গভর্নরের মতো বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োগ করা হয়। মক্কা বিজয়ের দিনে আবূ সুফিয়ান দাঁড়িয়ে যখন অগ্রসরমান মুসলিম বাহিনী প্রত্যক্ষ করছিল, তখন এক পর্যায়ে দেখল যে :

'এক ব্যক্তি গাতফান গোত্রের পতাকা বহন করে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছে। সে তার পাশে উপস্থিত লোকদের জিজ্ঞাসা করে, এ ব্যক্তি কে?'

তারা বলল :

'গাতফান নেতা নু'আঈম ইবনে মাসঊদ।'

তার নাম শোনামাত্রই আবূ সুফিয়ান বলে উঠে :

'সে খন্দকের যুদ্ধে আমাদের কতই না বিপর্যয় এনে দিয়েছে! আল্লাহর শপথ! মুহাম্মদের বিরুদ্ধাচরণে তার চেয়ে অধিক তৎপর আর কেউ ছিল না। আর আজ সে তারই অনুসারী হয়ে নিজ গোত্রের পতাকা বহন করছে। সে আজ মুহাম্মদের পতাকাতলে সমবেত হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছে।'

নু'আঈম ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জীবনী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সহায়ক গ্রন্থাবলি :

১. আল ইসাবাহ : জীবনী নং ৮৭৭৯।

২. আল ইসতিয়াব : ইসাবাহ-এর টীকা অংশ, ৫ খণ্ড, ৫৮৪ পৃ.।

৩. উসদুল গাবাহ : ৫ম খণ্ড, ৩৪৮ পৃ. অথবা ৫২৭৪ নং জীবনী।

৪. সীরাতুন নুবুবিয়াহ লিইবনে হিশাম : সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।

৫. হায়াতুস সাহাবাহ : ৪র্থ খণ্ডের সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।

# খাব্বাব ইবনে আরত (রা)

*আল্লাহ খাব্বাব ইবনে আরতের ওপর রহমত বর্ষণ করুন। তিনি স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, নিষ্ঠা সহকারে হিজরত করেছিলেন এবং মুজাহিদের জীবন যাপন করেছেন।*

*–আলী ইবনে আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু*

একদা উম্মু আনমার আল খুযাইয়া তার খিদমতের জন্য এবং আয়-রোজগারেও সহায়ক হতে পারে, এমন এক বালককে ক্রয়ের উদ্দেশ্যে মক্কার দাস মার্কেটে গেল। বিক্রির জন্য আনা শিশু দাসদের চেহারা ও মুখমণ্ডলের দিকে সে খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নজর ফেরাতে থাকল। পরিশেষে এমন এক বালকের প্রতি তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো, যে ছিল যেমন সুন্দর চেহারাসম্পন্ন, তেমনি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। যার চেহারায় ছিল বুদ্ধিমত্তার ছাপ। তখনো সে ছিল একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক মাত্র। মনে মনে ঐ বালকটিকে ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। দর-কষাকষি করে, মূল্য পরিশোধ করে তাকে নিয়ে বাড়ির দিকে রওয়ানা হলো। কিছুদূর যাওয়ার পর উম্মু আনমার ছেলেটির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল :

'ছেলে! তোমার নাম কী?'

উত্তর দিল : 'খাব্বাব।'

আবার জিজ্ঞাসা করল : 'তোমার বাবার নাম কী?'

সে বলল : 'আরত'

পুনরায় জিজ্ঞাসা করল : 'তুমি কোথাকার বাসিন্দা?'

সে বলল : 'নজদের'

উম্মু আনমার বলল : 'তাহলে তুমি আরব?'

সে উত্তর দিল : 'জী! আমি বনূ তামীম গোত্রের সন্তান।'

উম্মে আনমার বলল :

'কিভাবে তুমি ক্রীতদাস হলে এবং মক্কার দাস ব্যবসায়ীদের হাতে পড়লে?'

সে বলল :

'আরবের একটি গোত্রের সশস্ত্র লোকজন আমাদের গোত্রের উপর হামলা চালিয়ে উট, ঘোড়া, গাধা ইত্যাদি লুট করে এবং মহিলাদের বন্দী করে এবং শিশুদের ধরে নিয়ে যায়। আমি সেই বন্দী শিশুদের একজন। ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে হাত ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে আপনার হাতে এসে পড়েছি।'

বাড়ি ফিরে উম্মু আনমার তলোয়ার তৈরির প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে খাব্বাবকে মক্কার কর্মকারদের একজনের হাতে তুলে দিল। কিছুদিনের মধ্যেই খাব্বাব তলোয়ার তৈরিতে বেশ দক্ষতা অর্জন করল।

খাব্বাব আরো একটু বয়ঃপ্রাপ্ত ও তার মধ্যে ধীরস্থিরতা পরিলক্ষিত হলে উম্মু আনমার তার জন্য একটি দোকান ভাড়া করে তাকে যন্ত্রপাতি ক্রয় করে দেয় এবং তলোয়ার তৈরির জন্য তার মেধা ও যোগ্যতাকে কাজে লাগানোর পরামর্শ দেয়। কিছুদিনের মধ্যেই খাব্বাবের তৈরি তলোয়ারের মান ও গুণগত প্রশংসা মক্কার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তার তলোয়ার জনপ্রিয় হয়ে উঠল এবং সবাই তার তৈরি তলোয়ার কিনতে আসতে লাগল। খাব্বাব একজন যুবক ও স্বল্পবয়সী হওয়া সত্ত্বেও চিন্তা, বিবেক-বুদ্ধিতে ছিলেন পরিপক্ব এবং জ্ঞান-গরিমায় ও অভিজ্ঞতায় ছিলেন বৃদ্ধদের মতো সমৃদ্ধ, সত্যবাদী, সৎ ও আমানতদার।

দিনের কাজ শেষে অবসর সময়ে জাহেলী সমাজে বিদ্যমান অশান্তি ও বিপর্যয় থেকে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যায়, সে সম্প র্ক গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতেন। নীতি-নৈতিকতা বিবর্জিত যে জীবনধারা চলছে, যার শিকার তিনি নিজেও তা থেকে পরিত্রাণের চিন্তা করতেন। এই অন্ধকার কবে দূর হবে, কবে সমাজ পরিশুদ্ধ হবে? প্রত্যাশিত সুপ্রভাত কবে উদ্ভাসিত হবে? এবং তিনি সেই সুপ্রভাত দেখে যেতে পারবেন কি না? এসব চিন্তা ছিল তাঁর অবসরের একমাত্র খোরাক। সে উদ্দেশ্যে তিনি দীর্ঘ জীবনের আকাঙ্ক্ষা করতেন।

খাব্বাবকে খুব বেশি দিন অপেক্ষা করতে হলো না। তাঁর নিকট পৌঁছল প্রত্যাশিত সেই সুপ্রভাতের আহ্বান। যে আহ্বান জানাচ্ছেন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ নামক হাশেমী গোত্রেরই এক ব্যক্তি।

কালবিলম্ব না করে খাব্বাব মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর খিদমতে উপস্থিত হলেন। মনোযোগ সহকারে তাঁর কথা শুনলেন। আলোচনা যতই গভীরে যাচ্ছিল খাব্বাবের অন্তর ততই আলোকিত হয়ে উঠছিল। এমনকি দেখতে দেখতে নূরে রব্বানী তাঁর অন্তরকে পূর্ণ আলোকিত করে তুলল। ক্রীতদাস খাব্বাব এখন ঈমানী চেতনায় উজ্জীবিত। বিলম্ব আর সহ্য হলো না। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে নিজের হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং কালেমা শাহাদাত পাঠ করে নবজীবন লাভ করলেন।

তিনি ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে ষষ্ঠ ব্যক্তি। তিনিই ইসলামের ছয় ভাগের এক ভাগ নামে পরিচিত ছিলেন।

খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর ইসলাম গ্রহণ করার সুসংবাদ মক্কার জনগণ থেকে লুকিয়ে রাখলেন না। তাঁর ইসলাম গ্রহণের সংবাদ তার মালিকা উম্মু আনমারের নিকট পৌছে গেল। খাব্বাবের ইসলাম গ্রহণের সংবাদে সে ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ হলো। ক্রোধে সে এতই উন্মত্ত হয়ে উঠল যে, সে খাব্বাবকে কঠোর শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। সে তার ভাই সিবাআ ইবনে আবদুল উযযাকে সঙ্গে নিয়ে খাব্বাবের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো। খুযাআ গোত্রের একদল যুবকও তাদের সঙ্গী হলো। সবাই খাব্বাবের কাছে গিয়ে পৌছে দেখল তিনি তার কাজের মধ্যে ডুবে আছেন। সিবাআ তার দিকে অগ্রসর হয়ে রাগতঃস্বরে বলল :

'তোমার সম্পর্কে আমাদের কাছে একটি সংবাদ পৌছেছে, যা আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে না।'

খাব্বাব জিজ্ঞাসা করলেন : 'কী খবর?'

সিবাআ বলল :

'তুমি নাকি ধর্মচ্যুত হয়ে হাশেমী গোত্রের এক ব্যক্তির অনুসরণ করছ?'

খাব্বাব ধীরস্থিরভাবে উত্তর দিলেন :

'না আমি ধর্মচ্যুত হইনি, বরং লা-শরীক আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি মাত্র। আর আপনাদের দেব-দেবীদের প্রত্যাখ্যান করে এ সাক্ষ্য দিয়েছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দাহ ও তাঁর রাসূল।'

খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর উত্তর সিবাআ ও তার সঙ্গী-সাথীরা শোনামাত্রই তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সম্মিলিতভাবে তাঁকে প্রহার করতে শুরু করল। নির্যাতনের জন্য তাদের হাত-পা সমানে চলল। তাতেও তাদের

প্রতিশোধস্পৃহা থামল না। হাতের কাছে হাতুড়ি ও লৌহখণ্ড প্রভৃতি যা পেল তাই দিয়ে নির্দয়ভাবে প্রহার করতে লাগল।

এক পর্যায়ে খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সংজ্ঞা হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। তাঁর শরীর থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোতে থাকল। খাব্বাবের ওপর তাঁর মনিবের এই নির্যাতনের সংবাদ মক্কার অলিতে-গলিতে খড়কুটোর আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ল। মক্কাবাসী খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাহসিকতায় হতভম্ব হয়ে গেল। কারণ, তারা এই প্রথম শুনতে পেল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারীদের একজন প্রকাশ্যভাবে ইসলামের ঘোষণা করে প্রহৃত হয়েছে। কুরাইশ নেতৃবর্গ খাব্বাবের এই সাহসিকতায় বিচলিত হয়ে পড়ল। কারণ, পেশায় কর্মকার, বিধবা উম্মু আনমারের এক নগণ্য ক্রীতদাস হয়ে তারই দেব-দেবীদের প্রকাশ্যে গালি দেবে? তার বাপ-দাদার ধর্মকে যুক্তিহীন বলবে? মক্কায় যার না আছে কোনো সাহায্যকারী, না আছে কোনো আশ্রয়দাতা। সেই ব্যক্তি দেব-দেবীকে প্রকাশ্যে ভর্ৎসনা করবে এবং পৌত্তলিকতাকে উপহাস করবে– এ কথা তারা কল্পনাও করতে পারেনি।

তারা ভাবতে লাগল :

> 'যদি এখনই তার ধৃষ্টতা এই হয়, আর তা বাড়তে দেওয়া যায়, তাহলে ভবিষ্যতে তো সীমা ছাড়িয়ে যাবে।'

তাদের দিক থেকে এ দুশ্চিন্তায় কোনো অতিরঞ্জন ছিল না। তারা দেখল ইসলাম গ্রহণকারীর সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে এবং ইসলাম গ্রহণকারী অন্যরাও খাব্বাবের সাহসিকতা দেখে ইসলামের ঘোষণা দেওয়া শুরু করেছে।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আবূ সুফিয়ান ইবনে হারব, ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা, আবূ জাহল ইবনে হিশামদের নেতৃত্বে কুরাইশ দলপতিরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রতিরোধকল্পে পরামর্শ বৈঠকে বসল। তারা এ বৈঠকে একমত হলো যে, ইসলামের প্রসার দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, তাকে আর অগ্রসর হতে দেওয়া যায় না। শিকড় শক্ত হওয়ার আগেই এর মূলোৎপাটন করতে হবে। স্ব-গোত্রীয় মুহাম্মদের অনুসারীদের অগ্রযাত্রা প্রতিরোধ করতে হবে বা নিজেদের ধর্মমতে ফিরিয়ে আনতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রত্যেক গোত্রপতিকে তারা নিজ নিজ গোত্রের বিশৃঙ্খলা দমনের দায়িত্ব দেয়। তাদেরকে এ নির্দেশও দেওয়া হয় যে :

'তাদের ওপর কঠিন নির্যাতন চালাতে হবে, যেন তারা নিজ নিজ ধর্মে ফিরে আসতে বাধ্য হয় অথবা নির্যাতনে তাদের মৃত্যু হয়।'

এ সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে নির্যাতন করার দায়িত্ব পড়ে সিবাআ ইবনে আবদুল উযযার ওপর। দুপুর বেলায় মক্কার ভূমি যখন খরতাপে উত্তপ্ত হয়ে উঠে, বালুময় মাঠ যখন অগ্নিতপ্ত হয়ে টগবগ করে, ঠিক এ সময়ে সে খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে মক্কার অগ্নিঝরা তপ্ত মাঠে নিয়ে বিবস্ত্র করে লোহার পোশাক পরিয়ে (যা যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়) বেঁধে রাখে। পিপাসায় ছটফট করতে থাকলে তাকে পানি দিতে নিষেধ করা হয়। খাব্বাব যখন ভীষণ কাতর ও ক্লান্ত হয়ে পড়তেন, তখন তাঁর কাছে গিয়ে প্রশ্ন করা হতো মুহাম্মদ সম্পর্কে তোর ধ্যান-ধারণা কী? তখন খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উত্তর দিতেন :

'তিনি আল্লাহর বান্দাহ ও তাঁর রাসূল, যিনি আমাদের জন্য দীনে হক ও হেদায়াতসহ প্রেরিত হয়েছেন। তিনিই একমাত্র আমাদেরকে জাহেলী যুগের অন্ধকার থেকে ইসলামের আলোর পথে আনতে সক্ষম।'

তাঁর এ উত্তর শুনে সে তাঁকে নির্দয়ভাবে প্রহার করত। লাথি ও কিল-ঘুষি মারত। তারপর আবার জিজ্ঞাসা করত :

'লাত ও উযযা সম্পর্কে তোর ধ্যান-ধারণা কী?'

তখন খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উত্তর দিতেন :

'বোবা ও বধির দুটি মাটির মূর্তি মাত্র, যা কারো উপকার বা ক্ষতি কিছুই করতে পারে না।'

এ উত্তরে সে আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উত্তপ্ত পাথর এনে তার পিঠে চাপা দিয়ে রাখত। এতে তাঁর দু'কাঁধ বেয়ে পিঠের চর্বি গলে গলে পড়ত।

খাব্বাব ইবনে আরত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রতি সিবাআর চেয়ে তাঁর মালিকা উম্মু আনমারের নির্যাতন কোনো অংশেই কম ছিল না। একদা উম্মু আনমার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খাব্বাবের দোকানের সামনে দিয়ে যাবার সময় তাঁর সাথে কথা বলতে দেখে তার মাথায় রক্ত চড়ে যায়। এরপর সে প্রতিদিন খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর দোকানে আসত এবং তাঁর হাপর থেকে উত্তপ্ত লাল টকটকে লৌহখণ্ড তাঁর মাথার ওপর চেপে ধরত। এতে খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মাথা পুড়ে বাষ্প উত্থিত হতো

এবং তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলতেন। এমতাবস্থায় খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর মালিকা উম্মু আনমার ও তার ভাই সিবাআর জন্য আল্লাহর দরবারে বদদু'আ করতে থাকতেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের মদীনায় হিজরত করে চলে যাওয়ার অনুমতি দিলে খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুও সেজন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং সুযোগমতো হিজরত করে মদীনায় চলে যান। মক্কা ত্যাগের পূর্বে আল্লাহ উম্মু আনমারের জন্য তাঁর কৃত বদদু'আ বাস্তবে পরিণত করে দেখান। তা এইভাবে যে, উম্মু আনমার কঠিন মাথা ব্যথায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এ ধরনের তীব্র ও কঠিন মাথা ব্যথার কথা ইতঃপূর্বে কেউ শোনেনি। প্রচণ্ড মাথা ব্যথার তাড়নায় সে কুকুরের মতো চিৎকার করত। চিকিৎসার জন্য তার ছেলেরা যথাসাধ্য চেষ্টা করে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। পরিশেষে চিকিৎসকেরা পরামর্শ দেয় :

> 'এ ধরনের মাথা ব্যথার একমাত্র চিকিৎসা হলো লৌহখণ্ড উত্তপ্ত করে লাল টগবগে হলে তা দ্বারা নিয়মিত মাথায় দাগ দেওয়া। এই মাথা ব্যথা থেকে বাঁচার জন্য উম্মু আনমার লৌহখণ্ড গরম করে মাথায় ইস্ত্রির মতো ঘষতো। তাতে তার যন্ত্রণার অনুভূতি কিছুটা লাঘব হওয়ার পরিবর্তে আরো বহুগুণ বেড়ে যেত, এমনকি তার যন্ত্রণায় পূর্বের মাথা ব্যথাই ভুলে যেত।

মদীনায় হিজরত করে আনসারদের আতিথেয়তায় খাব্বাব ইবনে আরত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে তাঁর চক্ষুদ্বয়কে শীতল করেন। খাব্বাব ইবনে আরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে তাঁরই ঝাণ্ডার নিচে সমবেত হয়ে বদর ও উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। উহুদের যুদ্ধে উম্মু আনমারের ভাই সিবাআ ইবনে আবদুল উযযাকে বীর কেশরী হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাতে নিহতাবস্থায় দেখার সৌভাগ্য তাঁর হয়। আল্লাহ তাঁকে দীর্ঘ জীবন দান করেন। তিনি চার খলীফার শাসনকাল প্রত্যক্ষ করেন। তাদের বিশেষ তত্ত্বাবধানে ও তাদের দ্বারা সর্বদাই সম্মানিত ও প্রশংসিত হয়ে জীবন অতিবাহিত করেন।

খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একদিন কোনো কাজে খালীফাতুল মুসলিমীন উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর দরবারে আসেন। উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁকে সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে উঁচু আসনে সমাসীন করেন।

তাঁকে বলেন :

'বেলাল ছাড়া এই মজলিসে আর কেউ নেই যে, তাকে আপনার চেয়ে অধিক সম্মানে ভূষিত করা যেতে পারে।'

অতঃপর আলোচনার এক পর্যায়ে খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে মক্কার মুশরিকরা যে চরম নির্যাতন চালিয়েছিল, সে সম্পর্কে কিছু জানতে চান।

খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর ওপর নির্যাতনের বর্ণনা গর্বের সাথে করা 'রিয়া' হতে পারে মনে করে লজ্জাবোধ করছিলেন। কিন্তু উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বারবার অনুরোধ করায় খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পিঠের কাপড় সরিয়ে দিলেন। উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর পিঠের ক্ষত-বিক্ষত অবস্থা দেখে ভয়ে পিছনে সরে গেলেন এবং বললেন :

'এসব কিভাবে হলো?'

খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন :

'মুশরিকরা আমাকে নির্যাতন করার জন্য কয়লার স্তূপ প্রজ্বলিত করত। যখন তা লাল হয়ে উঠত, তখন আমাকে বিবস্ত্র করে হাত-পা বেঁধে এর ওপর হেঁচড়াতে থাকত। এমনকি আমার পিঠের গোশ্‌ত হাড্ডি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত। ক্ষতস্থানের নির্গত রক্তমিশ্রিত পানি টপটপ করে পড়ে সেই কয়লার আগুন নিভে যেত।'

খাব্বাব ইবনে আরত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে অতিকষ্টে জীবন অতিবাহিত করার পর শেষ জীবনে অঢেল সম্পদের মালিক হন। এত স্বর্ণ-রৌপ্যের মালিক হন, যা তাঁর জন্য স্বপ্নেরও অতীত ছিল। সেই অঢেল সম্পদ থেকে তিনি আল্লাহর রাস্তায় এমনভাবে খরচ করতেন, যা অনেকের কাছে ছিল কল্পনাতীত। তিনি স্বর্ণ ও রৌপ্যের মুদ্রাগুলো তাঁর বাড়ির একটি নির্দিষ্ট স্থানে বাক্সের তালা না লাগিয়ে উন্মুক্ত অবস্থায় রেখে দিতেন। ফকীর, মিসকীন, গরীব ও অভাবী তাঁর বাড়িতে এসে অনুমতি বা চাওয়া ছাড়াই ইচ্ছামতো সেখান থেকে নিয়ে যেত। এসব সত্ত্বেও তিনি ভয় পেতেন যে, এ ধন-সম্পদের হিসাব কঠিন হবে এবং তাঁকে শাস্তি পেতে হবে। তার একদল বন্ধু-বান্ধব বর্ণনা করেছেন :

'খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মৃত্যুশয্যায় আমরা তাঁর কাছে গেলে তিনি আমাদেরকে একটি স্থান দেখিয়ে বললেন, এখানে ৮০,০০০ (আশি

হাজার) দিরহাম রয়েছে। আল্লাহর শপথ আমি থলির মুখ কখনো বন্ধ করিনি কিংবা কোনো অভাবীকে সেখান থেকে তার ইচ্ছামতো গ্রহণ করতেও বাধা দেইনি। এই বলে তিনি কাঁদতে থাকলেন।'

তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন : 'কেন কাদছেন?'

তিনি বললেন :

'আমি কাঁদছি, কারণ আমার সঙ্গী-সাথীরা এ দুনিয়ায় তাদের কর্মের বিনিময়ে একটি কপর্দকও পাননি, আর আমি এখনো জীবিত এবং অঢেল সম্পদের মালিক। আমার ভয় হয় যে, এসব সম্পদ হয়তো আমার ঐসব কাজের প্রতিদান, যা এ পৃথিবীতে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে।'

খাব্বাব ইবনে আরত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আল্লাহর সান্নিধ্যে গমনের পর আমীরুল মুমিনীন আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বলেন :

'আল্লাহ তাআলা খাব্বাবের ওপর রহম করুন। তিনি স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, নিষ্ঠা সহকারে হিজরত করেছিলেন এবং মুজাহিদী জীবন যাপন করেছেন। আল্লাহ উত্তম আমলকারীদের কর্মফল বৃথা যেতে দেন না।'

رَحِمَ اللّٰهُ خَبَّاباً فَلَقَدْ اَسْلَمَ راغباً وَهَاجَرَطَائِعاً وعاش مُجَاهِداً ...
ولن يضيّعَ اللّٰهُ اَجْرَمَنْ اَحْسَنَ عَمَلاً .

---

খাব্বাব ইবনে আরত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর জীবনী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সহায়ক গ্রন্থাবলি :

১. আল ইসাবাহ : ২২১০ নং জীবনী।
২. উসদুল গাবাহ : ২য় খণ্ড, ৯৮-১০০ পৃ.।
৩. আল ইসতিয়াব ঃ ১ম খণ্ড, ৪২৩ পৃ.।
৪. তাহযীবুত তাহযীব : ৩য় খণ্ড, ১৩৩ পৃ.।
৫. হুলিয়াতুল আওলিয়া : ১ম খণ্ড, ১৪৩পৃ.।
৬. সিফাতুস সাফওয়াহ : ১ম খণ্ড, ১৬৮ পৃ.।
৭. আল জামউ বাইনা রিজালিস সহীহায়ন : ১২৪ পৃ.।
৮. আল মাআরিফ লি ইবনে কুতায়বা : ৩১৬ পৃ.।
৯. হায়াতুস সাহাবা : ৪র্থ খণ্ডের সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।

# রাবিঈ ইবনে যিয়াদ আল হারেসী (রা)

*'আমি খলীফা নিযুক্ত হওয়ার পর রাবিঈ ইবনে যিয়াদ যেভাবে হক কথা ও সৎ পরামর্শ দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করেছে এমনটি আর কেউ করেনি।' –উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)*

আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ইনতিকালের শোকে মাদীনাতুর রাসূলের জনসাধারণ তখনো দুঃখে-শোকে মুহ্যমান। এখনো তাঁরা অশ্রুসিক্ত চক্ষু মুছেই চলেছেন। অপরদিকে খালীফাতুল মুসলিমীন উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাতে বায়'আত গ্রহণের জন্য আরবের প্রতিটি জনপদ থেকে প্রতিনিধি দলের আগমন অব্যাহত রয়েছে। তারা হেদায়াত ও দিক-নির্দেশনা শুনতে ও নতুন খলীফার হাতে শান্তি ও কঠিন মুহূর্তে আনুগত্যের বায়'আত করতে আসছে। এ রকম এক সকালে অন্যান্য প্রতিনিধি দলের সাথে বাহরাইনের এক প্রতিনিধি দলের আগমন ঘটে। যে প্রতিনিধি দলে ছিলেন বাহরাইনের বিভিন্ন জনপদের প্রতিনিধিগণ।

উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এ প্রতিনিধিদের কথাবার্তা ও বিভিন্ন পরামর্শাদি একান্ত আগ্রহ সহকারে শুনলেন। শুধু বাহরাইনের আগত প্রতিনিধি দলের কথাই মনোযোগ সহকারে শুনলেন না; বরং আগত প্রত্যেক সদস্যের কথাই শুনলেন একইভাবে। এ কারণে যে, তাদের থেকে হয়তো আল কুরআনের কোনো মূল্যবান উপদেশ, হেদায়াত ও পরামর্শ পাওয়া যাবে। পাওয়া যাবে আমল-আখলাকের কথা, রাষ্ট্র পরিচালনার কথা, মুসলমানদের কল্যাণের কথা।

কিন্তু তিনি তাদের থেকে যা আশা করেছিলেন তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ কথা শুনতে পেলেন না। অতঃপর উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু প্রতিনিধিদের এক ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন :

'আমার নিকট এসে বসুন।'

তার বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা দেখে তিনি আঁচ করতে পেরেছিলেন যে, এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই কোনো মূল্যবান পরামর্শ দেবে। নিকটে এলে বললেন।

'এবার আপনি কিছু বলুন।'

এ সুযোগে ঐ ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে বললেন :

'হে আমীরুল মুসলিমীন! আপনার উপর উম্মতে মুসলিমার গুরুদায়িত্ব নিঃসন্দেহে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিরাট পরীক্ষা। তিনি আপনার কৃতকর্মের হিসাব নেবেন, সাফল্য ও ব্যর্থতা পরীক্ষা করে দেখবেন। খিলাফতের যে কঠিন দায়িত্ব আপনার ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে, তা পালনে সবর্দাই আল্লাহকে ভয় করে চলুন। জেনে রাখুন, সুদূর ফোরাত নদীর তীরেও যদি একটি ছাগলছানা হারিয়ে যায়, সে সম্পর্কেও কিয়ামতের দিন আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হবে।'

এ কথা শুনে উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আতঙ্কিত হয়ে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে শুরু করলেন।

তিনি বললেন :

'খিলাফতের দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত এমন সত্য কথাটি আর কেউ আমাকে বলেননি। আপনি মূল্যবান নসীহত দ্বারা আমাকে ধন্য করেছেন।'

এবার বলুন : 'আপনি কে?'

তিনি উত্তর দিলেন :

'আমার নাম রাবিঈ ইবনে যিয়াদ আল হারেসী।'

উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞাসা করলেন :

'মুহাজির ইবনে যিয়াদের ভাই?'

উত্তর দিলেন : 'জী হ্যাঁ।'

অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটলে উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আবূ মূসা আল আশআরী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে ডেকে বললেন :

'রাবিঈ ইবনে যিয়াদের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ কর। সে যদি তার পরামর্শে সত্যিই নিঃস্বার্থ হয়ে থাকে, তাহলে তাকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে লাগানো যাবে এবং তার যোগ্যতা ও পরামর্শ রাষ্ট্র-পরিচালনার ক্ষেত্রে আমাদের বিরাট সহায়ক হবে। অতএব, তাকে কাজে লাগাও এবং তার কার্যক্রম সম্পর্কে আমাকে অবগত করতে থাক।'

কিছুদিন যেতে না যেতেই খালীফাতুল মুসলিমীন উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নির্দেশে আবূ মূসা আল আশআরী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু পারস্যের আহওয়াজ প্রদেশের 'মানাযির' নামক শহর বিজয়ের উদ্দেশ্যে সামরিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন এবং রাবিঈ ইবনে যিয়াদ ও তাঁর ভাই মুহাজিরকেও এ বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আবূ মূসা আল আশআরী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর বাহিনী দ্বারা মানাযির শহর আবরোধ করলে পারস্য বাহিনীর সাথে এক প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বেধে যায়। ইতিহাসে যার নজির দুর্লভ। এ প্রচণ্ড যুদ্ধে পারস্য বাহিনী যেমন অতুলনীয় বীরত্বের পরিচয় দেয়, তেমনি তাদের আক্রমণও ছিল প্রচণ্ড। তারা অত্যাধুনিক সামরিক কৌশল প্রয়োগ করে কল্পনাতীতভাবে আক্রমণ চালালে মুসলিম বাহিনীর সীমাহীন প্রাণহানি ঘটে। রমযান মাসে যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার কারণে মুসলিম বাহিনী ছিল স্বাভাবিকভাবেই শারীরিক দিক থেকে দুর্বল। রাবিঈ ইবনে যিয়াদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ভাই মুহাজির রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মুসলিম বাহিনীর এত প্রাণহানি দেখে শাহাদাতের উদ্দেশ্যে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি শরীরে কর্পুর জাতীয় সুগন্ধি মেখে কাফনের কাপড় পরিধান করে তারই ভাই রাবিঈকে শেষ ওসিয়ত করে প্রস্তুত হয়ে যান। তার এ অবস্থা দেখে রাবিঈ ইবনে যিয়াদ সেনাপতি আবূ মূসা আল আশআরী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিকট এসে বললেন :

'আমার ভাই মুহাজির শাহাদাতের উদ্দেশ্যে জান্নাতের বিনিময়ে নিজেকে বিক্রি করে ফেলেছে, অথচ সে রোযাদার। মুসলিম বাহিনী এ রোযার কারণে

বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় তারা রোযা ছাড়তে রাজি নয়, এখন আপনি কী সিদ্ধান্ত নেবেন ভেবে দেখুন।'

রাবিঈ ইবনে যিয়াদের এ প্রস্তাবে আবূ মূসা আল আশআরী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সৈন্যদের একত্র করে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন :

'হে মুসলিম ভাইয়েরা! আমি সকল রোযাদার সৈন্যদের আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, হয় আপনারা রোযা ভেঙে পানাহার করুন, নয়তো যুদ্ধ থেকে নিজেদের বিরত রাখুন। এ কথা বলে তিনি তাঁর হাতে ধারণ করা পানির পাত্র থেকে পানি পান করতে থাকলেন, যেন সৈন্যরা তাঁকে অনুসরণ করে রোযা ভেঙে পানাহার করে।'

রাবিঈ ইবনে যিয়াদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ভাই মুহাজির সেনাপতি আবূ মূসা আল আশআরী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এই ঘোষণার কথা শুনলে তিনিও এক চুমুক পানি পান করে বললেন :

'আল্লাহর শপথ! তৃষ্ণার জন্য পানি পান করছি না, শুধু সেনাপতির নির্দেশ পালনের জন্যই পানাহারে অংশ নিলাম। তারপর হাতের তলোয়ার কোষমুক্ত করেই শত্রুবাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। শত্রুবাহিনীর ব্যূহ ভেদ করে তাদের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েন। শত্রু বাহিনীতে হৈচৈ পড়ে গেল এবং আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। তাকে প্রতিহত করার জন্য চারদিক থেকে তার ওপর আক্রমণ চালানো হলো। তলোয়ারের একই সাথে চতুর্মুখী আক্রমণের ফলে তিনি শাহাদাত বরণ করলেন।'

শাহাদাতের পর তাঁর শিরশ্ছেদ করে তা যুদ্ধ ক্ষেত্রে এক উচ্চ টিলার ওপর বর্শার মাথায় ঝুলিয়ে রাখা হলো। রাবিঈ ইবনে যিয়াদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর ভাইয়ের কর্তিত শির দেখে বললেন :

'হে প্রিয় ভাই! তোমার শাহাদাতের সৌভাগ্যের জন্য ধন্যবাদ। তুমি জান্নাতের সীমাহীন নিয়ামতের অধিকারী। তোমার এ গৌরব লাভে আল্লাহর পক্ষ থেকে অনন্ত জীবনের জন্য আমার ঈর্ষা হচ্ছে। গৌরবময় স্থানে তুমি ঝুলন্ত। আল্লাহর শপথ করে বলছি, ইনশাআল্লাহ আমি তোমার এবং অন্য শহীদদের পক্ষ হতে অবশ্যই এর প্রতিশোধ গ্রহণ করব।'

সেনাপতি আবূ মূসা আল আশআরী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর ভাইয়ের প্রতি রাবিঈ ইবনে যিয়াদের আন্তরিক দরদ ও ঈমানী দৃঢ়তা প্রত্যক্ষ করে অভিভূত হলেন। প্রতিশোধের আগুন তার মধ্যে প্রজ্বলিত দেখে তিনি নিজে মানাযির শহর বিজয়ের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন। মুসলিম বাহিনীর সেনাপতির দায়িত্ব থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে সে দায়িত্ব অর্পণ করলেন রাবিঈ ইবনে যিয়াদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উপর। আর তিনি পারস্যেরই 'সূস' নগরী বিজয়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন। রাবিঈ ইবনে যিয়াদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর বাহিনীকে নিয়ে শত্রুদের ওপর ঝড়ের মতো আঘাত হানতে শুরু করলেন। শত্রুরা মনে করল এ যেন এক আসমানী কোনো গযব। প্রতিরোধ-ব্যূহ ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। শত্রুরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যেদিকে পারলো পালাতে শুরু করল। রাবিঈ ইবনে যিয়াদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এ আক্রমণের মধ্য দিয়ে আল্লাহ তাঁর হাতে 'মানাযির' নগরীর বিজয় দান করলেন। শত্রু বাহিনীকে সমূলে নিঃশেষ করে তাদের নারী ও শিশুদেরকে দাস রূপে আশ্রয় ক্যাম্পে নিয়ে এলেন। কল্পনাতীত মালে গনীমত লাভ করলেন। মানাযির বিজয়ের হীরো হিসেবে রাবিঈ ইবনে যিয়াদ যেন নতুন এক ইতিহাস গড়লেন। আরেক সফল সেনাপতির যেন আবির্ভাব ঘটল। তাঁর বীরত্বের প্রশংসা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। নতুন যে কোনো অভিযানের আগে তার কথাই সকলের স্মরণে আসত।

মুসলিম সেনাবাহিনী 'সিজিস্তান' বিজয়ের সিদ্ধান্ত নিলে এ অভিযানের জন্য তাঁকেই সেনাপতি হিসেবে নিযুক্ত করে তাঁর হাতেই তা বিজয়ের দৃঢ় প্রত্যাশা করা হয়। সেনাপতি রাবিঈ ইবনে যিয়াদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মুসলিম সেনাবাহিনীকে নিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদের লক্ষ্যে রওয়ানা হলেন। তিনি এ অভিযানে এমন দুর্গম ও বিপদসংকুল ২৫০ মাইল দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেন যে, মরুভূমির দুর্ধর্ষ ও হিংস্র প্রাণীরাও তা অতিক্রম করতে ভয় পায়। এ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে কারুকার্য খচিত সুউচ্চ অট্টালিকা, ধন-দৌলতের প্রাচুর্যবিশিষ্ট প্রকৃতির সৌন্দর্যের লীলাভূমি শস্য-শ্যামল ও সুউচ্চ দুর্ভেদ্য প্রাচীরবেষ্টিত সিজিস্তানের সীমান্তবর্তী 'রুস্তাকু যালেকের' নিকট পৌছেন। বিচক্ষণ সেনাপতি রাবিঈ ইবনে যিয়াদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু পূর্ব থেকেই 'রুস্তাকু যালেক' শহরে তাঁর গুপ্তচরদের জাল বিছিয়ে রেখেছিলেন। তাদের সূত্রে জানতে পারলেন যে :

'সহসাই শত্রুপক্ষ 'আল মাহারজান' নামক তাদের জাতীয় উৎসব উপলক্ষে 'রুস্তাকু যালেক' নগরীতে একত্রিত হতে যাচ্ছে। তিনি সে সময়ের অপেক্ষায় থাকলেন। নির্ধারিত রাত্রে শত্রুপক্ষ আনন্দ-উল্লাসে মেতে উঠলে তাদের উপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে বড় বড় জমিদার, দলপতি ও তাদের প্রাদেশিক গভর্নরসহ ২০ হাজার যোদ্ধাকে বন্দী করেছিলেন ও তাদেরকে দাস-দাসীতে পরিণত করেছিলেন। এই বন্দীদের মধ্যে উক্ত গভর্নরের এক ক্রীতদাসও ছিল। যে তার মনিবকে নির্ধারিত কর প্রদানের জন্য ৩ লাখ মুদ্রার বিরাট একটি অংক সাথে করে এনেছিল। রাবিঈ ইবনে যিয়াদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উক্ত ক্রীতদাসকে জিজ্ঞাসা করলেন :

'এ অর্থ কোথায় পেয়েছো?'

সে উত্তরে বলল : 'এক গ্রাম থেকে।'

'প্রতি বছরই কি একটি গ্রাম থেকে এই পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয়ে থাকে?'

উক্ত ক্রীতদাস উত্তর দিল : 'জী হ্যাঁ।'

রাবিঈ ইবনে যিয়াদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জিজ্ঞাসা করলেন :

'সেটা কিভাবে?'

সে উত্তর দিল :

'আমাদের কোদাল, কুড়াল ও কঠোর পরিশ্রমে বেরিয়ে আসা শরীরের ঘামের বিনিময়ে।'

যুদ্ধশেষে সেনাপতি রাবিঈ ইবনে যিয়াদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিকট বন্দী প্রাদেশিক গভর্নর মুক্তিপণের বিনিময়ে তার ও তার পরিবারের প্রাণভিক্ষার আবেদন জানান।

রাবিঈ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাকে বললেন :

'যদি পর্যাপ্ত মুক্তিপণ দিতে পারো, তাহলে আবেদন গ্রহণ করা যেতে পারে।'

গভর্নর আবেদন করল :

'বিনিময়ে কী পরিমাণ অর্থ চান?'

রাবিঈ ইবনে যিয়াদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উত্তর দিলেন :

'এই বর্শাটি মাটিতে গেড়ে দিলাম। এর মাথা বরাবর সোনা ও রূপা দ্বারা এমনভাবে ভরে দাও যেন বর্শাটি ঢেকে যায়।'

গভর্নর বলল :

'ঠিক আছে আমি তাতেই সম্মত।'

এই বলে তার ধন-ভাণ্ডার থেকে সোনা ও রূপা বের করে সেখানে স্তূপ করতে আরম্ভ করল। শেষ পর্যন্ত বর্শার মাথা তাতে ঢেকে গেল। তারপর রাবিঈ ইবনে যিয়াদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর বিজয়ী বাহিনী নিয়ে সিজিস্তানের ভিতরে ঢুকে পড়লেন। হেমন্ত ঋতুর প্রচণ্ড দমকা হাওয়ায় গাছ-পালার শুষ্ক পাতা ঝরে পড়ার ন্যায় সিজিস্তানের দুর্গ ও সামরিক ঘাঁটিসমূহ মুসলিম বাহিনীর পদানত হতে থাকল। শহর, নগর ও গ্রাম-গঞ্জের মানুষ মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পরিবর্তে তাদের সাদর সম্ভাষণ জানাতে থাকল এবং তাদের আনুগত্যের মধ্যেই নিজেদের মঙ্গল দেখতে থাকল।

এভাবে রাবিঈ ইবনে যিয়াদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর বাহিনীকে নিয়ে যুদ্ধ ছাড়াই সিজিস্তানের রাজধানী 'জারাঞ্জা' শহরে পৌঁছে গেলেন। সেখানে পৌঁছে দেখতে পেলেন যে, শত্রুবাহিনী মুসলিম বাহিনীকে প্রতিহত করার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। মুসলিম বাহিনীকে প্রতিরোধের জন্যে পারস্য সম্রাট বিপুল সৈন্য সমাবেশ করেছে। চারিদিক থেকে সামরিক রেজিমেন্টগুলো তাদের সহযোগিতার জন্য সমবেত করেছে। যে কোনো মূল্যে তারা 'জারাঞ্জা' থেকে মুসলিম বাহিনীকে হটিয়ে দিয়ে সিজিস্তান পুনরুদ্ধারে বদ্ধপরিকর। দু'বাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ বেধে গেল। এ যুদ্ধে কোনো পক্ষই তাদের সৈন্যদের জীবন অকাতরে বিলিয়ে দিতে কার্পণ্য করল না। উভয়পক্ষের বিপুল ক্ষয়-ক্ষতি ও প্রাণহানির এক পর্যায়ে মুসলিম বাহিনীতে বিজয়ধ্বনি উঠল। পারস্য বাহিনী ও জনগণের প্রাণ রক্ষার জন্য পারস্য সেনাপতি 'পারভেয' পরাজয় নিশ্চিত ভেবে অবিলম্বে রাবিঈ ইবনে যিয়াদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে অনিচ্ছা সত্ত্বেও শান্তি আলোচনার জন্য দূত পাঠাল। দূত মুসলিম সেনাপতি রাবিঈ ইবনে যিয়াদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আলোচনার সময় ও স্থান নির্ধারণের আবেদন জানাল। রাবিঈ ইবনে যিয়াদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু

১৬

পারস্য সেনাপতির এই প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। রাবিঈ ইবনে যিয়াদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু পারভেযের অভ্যর্থনার সময় ও স্থান নির্ধারণ করে মুসলিম বাহিনীকে বিশেষ প্রস্তুতির নির্দেশ দিলেন। তাদের এও নির্দেশ দিলেন অভ্যর্থনার স্থানকে পারস্য সেনাদের লাশের স্তূপে পরিণত করা হোক এবং যে পথে পারস্য সেনাপতি পারভেয রাবিঈ ইবনে যিয়াদের সাথে দেখা করতে আসবে তার দু'পাশেও পারস্য সৈন্যদের লাশ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখা হোক।

রাবিঈ ইবনে যিয়াদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণের লম্বা সুঠাম দেহের সুপুরুষ। তাঁর মাথাটিও ছিল আকারে বেশ বড়। তাঁকে দেখলেই অন্তর ভীতত্রস্ত হয়ে উঠত। পারস্য সেনাপতি পারভেয সন্ধির উদ্দেশ্যে আলোচনার স্থানে পৌছে রাবিঈ ইবনে যিয়াদের দিকে দেখামাত্রই ভয়ে কাঁপতে থাকল। তাকে পারস্য সৈন্যদের মৃতদেহের স্তূপের দৃশ্য ও রাবিঈ-এর চেহারা– উভয়ে মিলে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলল। রাবিঈ ইবনে যিয়াদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাথে করমর্দন করার জন্য সামনে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে দূরে দাঁড়িয়ে রুদ্ধশ্বাসে স্যালুট দিল। সেনাপতি রাবিঈ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিকট প্রস্তাবে বলল যে, ইরানী বড় বড় স্বর্ণের জামপ্লেট মাথায় বহনকারী এক হাজার ক্রীতদাস উপঢৌকনের বিনিময়ে সন্ধি প্রস্তাব নিবেদন করছি। রাবিঈ ইবনে যিয়াদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এ শর্তে সন্ধি করতে সম্মত হলেন।

সন্ধির দ্বিতীয় দিন রাবিঈ ইবনে যিয়াদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শহর প্রদক্ষিণে বের হলেন। তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য স্বর্ণের ইরানী জামপ্লেট মাথায় বহন করে দাসদের বিরাট দল নৃত্য করতে করতে তাঁকে ঘিরে ধরে। শহরের প্রবেশপথ ও অলিগলিতে জনতার ঢল নামে। রাস্তার দু'পাশে সারিবদ্ধ মানুষ মুসলমানদের বিজয়কে আল্লাহু আকবার তাকবীর ধ্বনি দিয়ে সমর্থন জানায়। ইতিহাসে এ এক স্মরণীয় ঘটনা।

রাবিঈ ইবনে যিয়াদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মুসলমানদের জন্য এমন একটি উন্মুক্ত তরবারি ছিলেন, যে তরবারির প্রচণ্ড আঘাতে শহরের পর শহর, নগরের পর নগরের বিজয় সুনিশ্চিত হয়ে উঠত। মুসলিম শাসিত এলাকার পরিধি বিস্তারকল্পে তিনি প্রদেশের পর প্রদেশ তার সাথে সংযোজন করে এসব প্রদেশে ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর এ অব্যাহত বিজয়ের এক পর্যায়ে মুসলিম বিশ্বের খিলাফতের দায়িত্ব উমাইয়া বংশের হাতে চলে যায়। মুআবিয়া

ইবনে আবূ সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাবিঈ ইবনে যিয়াদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে তাঁর অনিচ্ছাসত্ত্বেও খুরাসানের গভর্নর নিযুক্ত করেন। তিনি মানসিক দিক দিয়ে এ দায়িত্বভারে মোটেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। এ দায়িত্বের ব্যাপারে তাঁর অনীহা এ কারণে আরো চরম আকার ধারণ করে, যখন যিয়াদ ইবনে আবিহ (পিতৃ-পরিচয়হীন যিয়াদ) একজন উচ্চপদস্থ গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ব্যক্তি হিসেবে তাঁকে এই বলে নির্দেশ দেন যে :

'আমীরুল মুমিনীন মুআবিয়া গুরুত্বের সাথে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, যুদ্ধে অর্জিত মালামালের স্বর্ণ ও রৌপ্য কেন্দ্রীয় কোষাগারের জন্য নির্দিষ্ট রেখে অবশিষ্ট সম্পদ যোদ্ধাদের মাঝে বিতরণ করা হোক।'

রাবিঈ ইবনে যিয়াদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই নির্দেশ পাওয়ার পর যিয়াদ ইবনে আবিহ (পিতৃ-পরিচয়হীন যিয়াদ)-কে প্রত্যুত্তরে লিখে জানান :

'আমীরুল মুমিনীন মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর উদ্ধৃতি দিয়ে যে নির্দেশ পাঠিয়েছেন, আমি তাকে আল কুরআনের নির্দেশের পরিপন্থী মনে করি। কারণ, আল কুরআনে গনীমতের সম্পদ বণ্টনের যে পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে সমস্ত সম্পদের এক-পঞ্চমাংশই শুধু বায়তুল মালে জমাদানের নির্দেশ আছে। বাকি অংশ সম্পূর্ণই যোদ্ধাদের মাঝে বিতরণযোগ্য বলে উল্লেখিত। কুরআনের এ নির্দেশ মোতাবেক মালে গনীমত থেকে স্বর্ণ-রৌপ্য আলাদা করে সরকারি কোষাগারে জমা করার কোনো সুযোগ নেই।'

অতঃপর তিনি সকল মুজাহিদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা দেন :

'যে যেখানে যে অবস্থাতেই আছ, সে অবস্থাতেই গনীমতের অংশ বুঝে নাও। কুরআনের নির্দেশ মোতাবেক মুজাহিদদের মাঝে গনীমতের সম্পদ বিতরণ করে অবশিষ্ট মাত্র এক-পঞ্চমাংশই তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানী দামেশকে প্রেরণ করেন।'

যিয়াদ ইবনে আবিহ (পিতৃ-পরিচয়হীন যিয়াদ)-এর কুরআনবিরোধী ফরমানকে প্রত্যাখ্যানের পরেই শুক্রবার যিয়াদের নিকট এ পত্র পৌঁছার পূর্বের দিন মুসলিম বিশ্বের এই নন্দিত সিপাহসালার খুরাসানের গভর্নর রাবিঈ ইবনে যিয়াদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সাদা ধবধবে কাফনের কাপড় পরিধান করে জুমআর নামাযে ইমামতী করতে আসেন।

জনগণের উদ্দেশ্যে জুমআর খুতবা প্রদান করেন। খুতবাশেষে সমবেত মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে বলেন :

'হে ভাইয়েরা! আমি জীবনের প্রতি একান্তই বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছি। আমি আল্লাহর কাছে একটি দু'আ করছি আপনারা সবাই আমার দু'আর সাথে সাথে আমীন বলুন।'

অতঃপর তিনি দু'আ করতে থাকেন :

'হে আল্লাহ, তুমি যদি আমার মঙ্গল ও কল্যাণ চাও, তাহলে অনতিবিলম্বে আমাকে তোমার কাছে ডেকে নাও...। তাঁর নির্দেশ মোতাবেক সমবেত মুসল্লীগণ আমীন আমীন বলেন...।'

মহান আল্লাহ রাবিঈ ইবনে যিয়াদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর দু'আ সাথে সাথে কবুল করেন এবং সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার পূর্বেই তাঁর পবিত্র আত্মাকে তাঁর রহমতের সুমহান স্থান ইল্লিয়্যীনে উঠিয়ে নেন।

---

রাবিঈ ইবনে যিয়াদ আল হারেসী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জীবনী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সহায়ক গ্রন্থাবলি :


১. উসদুল গাবাহ : ২য় খণ্ড, ২০৬ পৃ.।

২. তারীখুত তাবারী : ৪র্থ খণ্ড, ১৮৩-১৮৫ পৃ. ৫ম খণ্ড, ২২৬, ২৮৫, ২৮৬ ও ২৯১ পৃ.।

৩. আল ইসাবাহ : ১ম খণ্ড, ৪০৫ পৃ.।

৪. আল কামেল ফিত তারীখ : সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।

৫. জুমহারাতুল আনসাব : ৩৯১ পৃ.।

৬. তাহযীবুত তাহযীব : ৩য় খণ্ড, ২৪৪ পৃ.।

৭. হায়াতুস সাহাবা : ২য় খণ্ড, ১৬৮ ও ২৬৮ পৃ.।

# আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা)

*'জান্নাতী ব্যক্তিকে দেখে যদি কেউ নিজের চক্ষু শীতল করতে চায়,*
*সে যেন আবদুল্লাহ ইবনে সালামকে দেখে।'*

হুসাইন ইবনে সালাম ইসলামপূর্ব শহর ইয়াসরিবের অধিবাসী ইহুদী পাদ্রিদের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা ও সর্বজনস্বীকৃত মহাজ্ঞানী নন্দিত ও পূজনীয় ব্যক্তি।

জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মদীনার সর্বস্তরের জনসাধারণের সম্মানের পাত্র। তিনি পরহেযগারী, দীনদারী, সত্যবাদিতা, নিষ্ঠা ও আমানতদারীতার এক বিরল ব্যক্তিত্ব।

তিনি এতবড় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও শ্রদ্ধাভাজন হওয়া সত্ত্বেও যেমন একান্তই ছিলেন সহজ-সরল জীবনের অধিকারী, তেমনি ছিলেন সদালাপী, মিষ্টভাষী, কঠোর পরিশ্রমী। সময়ের সদ্ব্যবহারকারী হিসেবেও খ্যাতি অর্জন করেন তিনি। সর্বদাই তাঁর সময়কে তিনি তিন ভাগে ভাগ করে কাজে লাগাতেন।

**প্রথম অংশ :** গির্জায় ওয়ায-নসীহত, বক্তৃতা-বিবৃতি ও ইবাদত-বন্দেগীতে।

**দ্বিতীয়াংশ :** খেজুর বাগানের পরিচর্যা– বৃক্ষ পরিষ্কার ও নর-নারী গাছের ফুলের তালকিহ্ বা মিলনকর্মসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজে।

**তৃতীয়াংশ :** তাওরাত কিতাবের ওপর ব্যক্তিগত লেখাপড়া ও গবেষণায়।

যখনই তিনি তাওরাত পাঠ করতেন এবং নবীকুলের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর মক্কার বুকে আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণীর আলোচনা পেতেন, তখন তিনি তা নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনায় নিমগ্ন হয়ে পড়তেন।

ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে তিনি শেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর আবির্ভাব সম্পর্কে নিশ্চিত হতেন। তাঁর প্রকৃতি, গুণাবলি ও পরিচয়ের নিদর্শনসমূহ এবং স্থান-কাল-সময় ইত্যাদির যোগ-বিয়োগ ও চিন্তা-ভাবনা করতে করতে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে পড়তেন। নবীর জন্মভূমি থেকে ইয়াসরিবে হিজরত করে এখানেই তাঁর বসবাস করার সময় ঘনিয়ে এসেছে বুঝতে পেরেও তাঁর চেহারা হাস্যোজ্জ্বল হয়ে উঠত।

তাওরাতে যখনই শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের এই অধ্যায় পাঠ করতেন অথবা চিন্তা-ভাবনা করতেন, তখনই আল্লাহর কাছে এটাই প্রত্যাশা করতেন, যেন তাঁকে সেই নবীর আগমনকাল পর্যন্ত দীর্ঘজীবী করা হয়। যেন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ এবং তাঁর প্রতি সর্বপ্রথম ঈমান গ্রহণ করার সৌভাগ্য দান করা হয়।

হেদায়াত ও রহমতের ভাণ্ডার নিয়ে সেই প্রত্যাশিত শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কায় আগমন ঘটল। তাঁর প্রেরণের মাধ্যমে আল্লাহ হুসাইন ইবনে সালামের দু'আর প্রতিফলন ঘটালেন। নবীজীর সাথে সাক্ষাৎ, তাঁর সাহচর্য গ্রহণ ও তাঁর ওপর অবতীর্ণ আল কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের সৌভাগ্য দান করলেন। এ জন্য আল্লাহ তাকে দীর্ঘজীবীও করেন।

প্রিয় পাঠক!

তাঁর ইসলাম গ্রহণের চিত্তাকর্ষক ঘটনার বিবরণ দেওয়ার জন্য আমরা তাঁর নিজ বর্ণনাকেই যথেষ্ট মনে করি। কারণ, তাঁর বিবরণই এ ব্যাপারে সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বোত্তম।

তিনি বর্ণনায় বলেন :

> 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের সংবাদ পেয়ে আমি তাঁর নাম, বংশ-পরিচয়, চারিত্রিক গুণাবলি, স্বভাব-চরিত্র, সময়কাল ইত্যাদি সঠিক তথ্যসমূহ সংগ্রহ করলাম। তাঁর এসব তথ্য তাওরাত কিতাবে বর্ণিত আলামতের সাথে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মিলাতে থাকলাম। সূক্ষ্ম পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাছাই করে তাঁর দাওয়াতের ব্যাপারে দৃঢ়ভাবে আস্থা পোষণ করলাম। কিন্তু তাঁর এ আবির্ভাবের সংবাদ কঠোরভাবে গোপন রাখলাম। এমনকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেদিন মক্কা থেকে মদীনার উদ্দেশ্যে হিজরত করেছেন, সেদিন পর্যন্ত এ সংবাদ কাউকে বললাম না।'

'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে ইয়াসরিবে পৌঁছে 'কুবা' নামক স্থানে যাত্রাবিরতি করেন। এক ব্যক্তি আমাদের মহল্লায় এসে লোকজনদের একত্র করে তাঁর আগমনের সুসংবাদ দেয়। আমি সেই মুহূর্তে খেজুর গাছের মাথায় চড়ে গাছের পরিচর্যায় ব্যস্ত ছিলাম। আমার ফুফু খালেদা বিনতে আল হারেস গাছের নিচে বসেছিলেন। সেই ব্যক্তির মুখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের সংবাদ শুনেই অকস্মাৎ আমার মুখ থেকে সরবে বের হয়ে পড়ল আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার!!'

আমার মুখ থেকে সরবে আল্লাহু আকবার ধ্বনি শুনে আমার ফুফু বলে উঠলেন :

'আল্লাহ তোমাকে নিপাত করুন। আল্লাহর শপথ, তুমি যদি আমাদের নবী মূসা ইবনে ইমরান আলাইহিস সালামের আগমনের সুসংবাদ শুনতে, তবু এর চেয়ে বেশি উৎফুল্ল হতে না।'

আমি তাকে উত্তর দিলাম :

'ফুফু! আল্লাহর শপথ করে বলছি, ইনি আমাদের নবী মূসা ইবনে ইমরান আলাইহিস সালামের ভাই এবং তাঁরই দীন ইসলামের অনুসারী। মূসা আলাইহিস সালামকে যে উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছিল তাঁকেও সে উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করা হয়েছে।'

আমার উত্তর শুনে তিনি নীরবতা অবলম্বন করেন। অতঃপর বলেন :

'ইনিই কি সেই নবী? যাঁর আগমনের কথা তুমি আমাদের শোনাতে এবং যাঁর সম্পর্কে বলতে যে, তিনি তাঁর পূর্বের সব নবুওয়াতের সাক্ষ্য দান করবেন ও রিসালাতের সমাপ্তি এবং পূর্ণতা দানকারী হবেন? তাহলে ইনিই কি সেই প্রত্যাশিত নবী?'

আমি উত্তর দিলাম : 'জী হ্যাঁ?'

ফুফু বললেন :

'তাহলে এখন আমাদের কী করণীয়?'

কিন্তু আমি এসব প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে কালবিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। সেখানে গিয়ে দেখি যে, তাঁর অবস্থানকক্ষের দরজায় লোকজনের ভীষণ ভীড়। এই ভীড় ঠেলে তাঁর নিকট পৌছলাম। তাঁর পবিত্র যবান থেকে আমি সর্বপ্রথম যা শুনি তা হলো :

اَيُّهَا النَّاسُ اَفْشُوْا السَّلَام ...

وَاَطْعِمُوْا الطَّعَام ...

وَصَلُّوْا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ...

تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ ...

'হে আল্লাহর বান্দাগণ, তোমরা বেশি বেশি করে সালামের প্রচলন কর, ক্ষুধার্তদেরকে খেতে দাও। রাত্রিতে জনগণ যখন ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ে, তখন উঠে তাহাজ্জুদের নামায আদায় কর, তাহলে নির্বিঘ্নে ও নিশ্চিন্তে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।'

আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁর চেহারা মুবারক দেখলাম। আলাপ-আলোচনাও খুব মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করতে থাকলাম। সব দেখে-শুনে নিশ্চিত হলাম যে, নবুওয়াতের কোনো মিথ্যা দাবিদারের চেহারা এমন নূরানী হতে পারে না। অতঃপর তাঁর আরো নিকটে এলাম ও কালেমা শাহাদাতের ঘোষণায় বললাম :

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো দ্বিতীয় ইলাহ নেই এবং এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দাহ ও তাঁর প্রেরিত রাসূল।'

এই সাক্ষ্য শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন :

'তোমার নাম কী?'

উত্তর দিলাম : 'আল হুসাইন ইবনে সালাম।'

তিনি বললেন : 'না, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম।'

উত্তর দিলাম :

'জী, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম। সেই আল্লাহর শপথ করে বলছি, যিনি আপনাকে সত্য দীন সহকারে প্রেরণ করেছেন। আজ থেকে আমার অন্য কোনো নাম হোক তা আমি চাই না।'

অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। বাড়িতে এসে আমার স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য সকলকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানালাম। আমার আহ্বানে সাড়া দিয়ে তারা সবাই ইসলামে দীক্ষিত হলো। তাদের সাথে সাথে আমার ফুফুও ইসলাম গ্রহণ করলেন। তখন তিনি একান্ত অশীতিপর বৃদ্ধা। তাদের ইসলাম গ্রহণের পর তাদের বললাম :

'আমার আগামী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত আমার ও তাদের ইসলাম গ্রহণের কথা ইহুদীদের থেকে যেন গোপন রাখা হয়।'

তারা সবাই হ্যাঁ-সূচক উত্তর দিল। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে বললাম :

'হে রাসূলুল্লাহ! নিঃসন্দেহে ইহুদী জাতি একটি বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট ও মিথ্যাবাদী জাতি। তা সত্ত্বেও আমার ইচ্ছা যে, আপনি তাদের নেতৃস্থানীয়দের আপনার খিদমতে আহ্বান করুন এবং আমাকে আপনার ঘরের যে কোনো একটি স্থানে লুকিয়ে রাখুন। আমার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ জানার পূর্বে তাদের কাছে আমার গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন। কারণ, তারা যদি এটা জানতে পারে যে, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, তাহলে আমাকে দোষারোপ করতে থাকবে এবং অশ্লীল ও ঘৃণিত ভাষায় গালি-গালাজ করবে।'

আমার পরামর্শ মোতাবেক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদীদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের আসার পূর্বে তিনি আমাকে একটা কক্ষে লুকিয়ে রাখলেন। অতঃপর ইহুদী নেতৃবৃন্দকে দাওয়াতী আলোচনার মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণের জন্য আহ্বান জানালেন। ঈমান গ্রহণের জন্য হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য উপস্থাপন করতে থাকেন। তাদের নিকট বিদ্যমান আসমানী কিতাবসমূহে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের নিদর্শন সম্পর্কে যা কিছু তারা জানে তারও উল্লেখ করেন।

তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নিষ্প্রয়োজন ও বেহুদা তর্কে লিপ্ত হয়। সত্য ও যুক্তির পরিবর্তে তারা ঝগড়া ও বাক-বিতণ্ডার পথ অনুসরণ করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাদের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে পুরোপুরি নিরাশ হলেন, তখন তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করেন :

'হুসাইন ইবনে সালামকে তোমরা কিভাবে মূল্যায়ন কর?'

তারা উত্তর দিল :

'তিনি আমাদের একজন পরম শ্রদ্ধাভাজন ধর্মীয় নেতা। তাঁর পিতাও আমাদের শ্রদ্ধাভাজন নেতা ছিলেন। তিনি আমাদের এত বিরাট ধর্মীয় পাদ্রি যে, তাঁর চেয়ে বড় পাদ্রি আমাদের মধ্যে দ্বিতীয় কেউ নেই। তাঁর পিতাও অনুরূপ ছিলেন। তিনি আমাদের ধর্ম বিশেষজ্ঞ।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এ কথা শুনে বললেন :

'তোমাদের কী ধারণা? সে যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে কি তোমরা ইসলাম গ্রহণ করবে?'

ইহুদী নেতারা উত্তর দিল :

'হতেই পারে না যে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করবেন। আমরা তার ইসলাম গ্রহণ থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাচ্ছি।'

আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বলেন :

তাদের এসব কথাবার্তার মাঝেই আমি তাদের সামনে উপস্থিত হই এবং বলি :

'হে ইহুদী সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দীনে হক এনেছেন তা কবুল কর।'

আল্লাহর শপথ করে বলছি, তোমরা ভালো করেই জান যে, তিনি নিঃসন্দেহে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। তোমাদের নিকট সংরক্ষিত তাওরাত কিতাবে তাঁর নাম, পরিচয়, গুণাবলি ও বর্ণনা ইত্যাদি বিস্তারিতভাবেই লিপিবদ্ধ দেখতে পাও। তোমরা জেনে রেখো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি নিঃসন্দেহে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল এবং আমিও তাঁর ওপর ঈমান এনেছি এবং তাঁর

রিসালাতের সাক্ষ্য দিচ্ছি। এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি তাঁকে নবী হিসেবেই জানতে পেরেছি।'

এ কথা শুনে তারা সমস্বরে চিৎকার করে বলে উঠল :

'মিথ্যা বলছ, তুমি মিথ্যা বলছ।'

'আল্লাহর শপথ! তুমি আমাদের মধ্যে একজন সর্বনিকৃষ্ট পিতার ইতরতম সন্তান, মূর্খের ছেলে গণ্ড মূর্খ।'

এমন কোনো গালি নেই যে, তারা তা উচ্চারণ করল না। এসব ঘটনার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম :

'হুযূর, আমি কি আপনাকে বলিনি যে, নিঃসন্দেহে ইহুদী জাতি একটি মিথ্যা ও জঘন্য ধরনের নিকৃষ্টতম জাতি। বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণা তাদের অস্থিমজ্জাগত।'

তখন থেকেই মরুভূমির তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির ঠাণ্ডা পানির প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার মতোই আবদুল্লাহ ইবনে সালাম ইসলামের শিক্ষার দিকে ঝুঁকে পড়েন। গভীর আন্তরিকতার সাথে আল কুরআন অধ্যয়ন করতে থাকেন। এমন একটি মুহূর্তও তাঁর কাটেনি যে মুহূর্তে তিনি আল কুরআনের তিলাওয়াত করতেন না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এমন নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলেন যে, সার্বক্ষণিকভাবে ছায়ার মতো অনুসরণ করতেন। নিজেকে সর্বদাই জান্নাতের কাজের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দেন। যে কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সেই সুসংবাদে ধন্য করেন, যা সাহাবীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। সেই সুসংবাদেরও একটি ঘটনা আছে, যা কায়েস ইবনে উবাদা ও অন্যান্য রাবী বর্ণনা করেছেন। কায়েস ইবনে উবাদা বর্ণনা করেন :

'একদা মদীনা মুনাওয়ারায় মসজিদে নববী শরীফের এক ইলমী মজলিস বা আলোচনাসভায় উপস্থিত ছিলাম। সে মজলিসে এক শেখও উপস্থিত ছিলেন। তাঁর কথাবার্তায় ভীষণভাবে আকৃষ্ট হচ্ছিলাম। তিনি উপস্থিত সুধীদের কাছে মিষ্টি ভাষায় মজার মজার আলোচনা করছিলেন। তিনি চলে যাওয়ার পর লোকেরা বলাবলি করছিল যে, যদি কেউ জান্নাতী ব্যক্তিকে দেখতে চায়, তবে সে যেন এই ব্যক্তিকে দেখে।'

প্রশ্ন করলাম : 'এই ব্যক্তি কে?'

তারা উত্তর দিল : 'আবদুল্লাহ ইবনে সালাম।'

আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম :

'আল্লাহর শপথ, আমি অবশ্যই তাঁকে অনুসরণ করব। তিনি যেদিকে রওয়ানা হলেন আমিও সেদিকেই তাঁকে অনুসরণ করতে থাকলাম। তিনি যেতে যেতে মদীনার এক শহরতলিতে পৌঁছে তাঁর বাড়িতে প্রবেশ করলেন।'

আমি তাঁর সাথে দেখা করতে চাইলে তিনি আমাকে তাঁর সাথে দেখা করার অনুমতি দিয়ে বললেন :

'হে ভাইপো, কী উদ্দেশ্যে এসেছ?'

তাঁকে বললাম :

'আপনি যখন মসজিদ থেকে বের হয়ে আসছিলেন, তখন লোকজন বলাবলি করছিল যে, জান্নাতী ব্যক্তিকে দেখে কেউ নিজের চক্ষু শীতল করতে চাইলে সে যেন এই ব্যক্তিকে দেখে। এই সংবাদ শুনে আমি বিস্তারিত জানার জন্য আপনার পেছনে পেছনে ছুটলাম। লোকেরা কিভাবে জানল যে, আপনি জান্নাতবাসী পুরুষ?'

তিনি উত্তর দিলেন :

'হে বৎস, জান্নাতবাসীদের সম্পর্কে আল্লাহই ভালো জানেন যে, কে জান্নাতী আর কে নয়।'

আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম :

'হ্যাঁ ঠিক আছে, কিন্তু তারপরও তো কোনো একটি কারণ নিশ্চয়ই আছে।'

তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, তারও একটা কারণ আছে।

বললাম :

'তাহলে সে কারণটি দয়া করে বলুন। আল্লাহ আপনাকে উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত করুন।'

তখন তিনি বললেন :

'আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় এক রাতে স্বপ্নে দেখি যে, আমার নিকট এক ব্যক্তি এসে আমাকে বলছে, দাঁড়ান। আমি দাঁড়িয়ে গেলে তিনি আমার হাত ধরে চলতে থাকেন। আমি তার সাথে কিছুদূর চলার পর বাম দিকে একটি রাস্তা দেখতে পেলাম। ঐ রাস্তায় চলতে মনস্থ করলে তিনি বললেন, এ রাস্তায় যেতে নেই। এ রাস্তা আপনার জন্য নয়। কিছুক্ষণ পর দেখি যে, আমার ডান পাশে সুপ্রশস্ত এক রাস্তা।'

তিনি তখন আমাকে বললেন :

'এই পথে চলুন। আমি তাঁর কথামতো সে রাস্তায় চলতে আরম্ভ করলাম। এমনকি ফুল-ফলে সুসজ্জিত মনোরম এক বিশাল বাগানে পৌঁছে গেলাম। যেমনই সবুজ সেখানকার গাছপালা, তেমনই সুন্দর তার ফুল-ফল। তার মধ্যবর্তী স্থানে বিরাট এক লৌহ স্তম্ভ। যার ভিত যমীনে ও মাথা আকাশে, যার মাথায় সোনার একটি হাতলিবিশেষ। আমার সঙ্গী বললেন, স্তম্ভে উঠুন। তাঁকে বললাম ওতে উঠা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'অতঃপর একজন খাদেম এসে ওখানে উঠার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করল। তার সহযোগিতায় আমি উঠতে উপরে থাকলাম। এমনকি সেই স্তম্ভের শীর্ষে পৌঁছে গেলাম। শীর্ষে পৌঁছে সেই হাতলিটি শক্ত করে ধরে সকাল পর্যন্ত ঝুলতে থাকলাম। এমনকি এভাবেই আমার ঘুম ভেঙে গেল।'

সকালে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে স্বপ্নের বিস্তারিত বর্ণনা দিলাম। তা শুনে তিনি বললেন,

'তুমি বামপাশে যে রাস্তা দেখেছ তা বামপন্থী (দোযখবাসীদের) পথ এবং ডানপাশের যে রাস্তা ধরেছ তা ডানপন্থীদের (জান্নাতীদের) পথ। আর সবুজ সুন্দর মনোরম বাগান যা তোমাকে আকর্ষণ করেছে, সেটি হলো ইসলাম। আর মাঝখানের স্তম্ভ হলো দীনের স্তম্ভ এবং হাতলটি হলো 'উরওয়াতুল উস্‌কা' বা দৃঢ় রশি– তুমি মৃত্যু পর্যন্ত এটি ধরে থাকবে।'

আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জীবনী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সহায়ক গ্রন্থাবলি :

১. আল ইসাবাহ : আস সাআদাহ সংস্করণ : ৪র্থ খণ্ড, ৮০-৮১ পৃ.।
২. উসদুল গাবাহ : ৩য় খণ্ড, ১৭৬-১৭৭ পৃ.।
৩. আল ইসতিয়াব : হায়দরাবাদ সংস্করণ : ১ম খণ্ড, ৩৮৩-৩৮৪ পৃ.।
৪. আল জারহু ওয়াত তা'দীলু : ২য় খণ্ড, ৬২-৬৩ পৃ.।
৫. তাজরীদু আসমাউস সাহাবা : ১ম খণ্ড, ৩৩৮-৩৩৯ পৃ.।
৬. সিফাতুস সাফওয়াহ : ১ম খণ্ড, ৩০১-৩০৩ পৃ.।
৭. তারিখু খলীফাতু ইবনে খাইয়াত : ৮ পৃ.।
৮. আল ইবরু : ১ম খণ্ড, ১৫-৩২ পৃ.।
৯. শাজারাতুযযাহাব : ১ম খণ্ড, ৫৩ পৃ.।
১০. তারীখুল ইসলাম লিযযাহাবী : ২য় খণ্ড, ২৩০-২৩১ পৃ.।
১১. তারীখু দামেশ্‌ক লিইবনে আসাকির : ৭ম খণ্ড, ৪৪৩-৪৪৮ পৃ.।
১২. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায : ১ম খণ্ড, ২২-২৩ পৃ.।
১৩. আসসীরাতুন নুবুবিয়াহ লিইবনে হিশাম : সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।
১৪. আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ : ৩য় খণ্ড, ২১১-২১২ পৃ.।
১৫. হায়াতুস সাহাবা : ৪র্থ খণ্ডের সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।

# শুরাকা ইবনে মালিক (রা)

*'শুরাকা! সেই দিনটি তোমার জন্য কতই না আনন্দদায়ক হবে, যেদিন পারস্য সম্রাটের মহামূল্যবান বালা দুটি তোমাকে পরিয়ে দেওয়া হবে।' –মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)*

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চলাফেরা গতিবিধি ও প্রত্যেক কর্মকাণ্ডের ওপর মক্কাবাসীর সজাগ দৃষ্টি। তাঁর জীবননাশই তাদের মূল লক্ষ্য। এমন এক পরিস্থিতিতে রাতের আঁধারে অজানা অভিমুখে তাঁর হিজরতের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল মক্কার অলি-গলিতে। মক্কাবাসী এ খবর পাওয়ার সাথে সাথে দিশেহারা হয়ে দৈনন্দিন কাজকর্ম ফেলে তাঁর সন্ধানে এদিক-সেদিক ছোটাছুটি শুরু করে দিল। কিন্তু কুরাইশ নেতৃবর্গ এ সংবাদ মোটেও বিশ্বাস করতে পারছিল না। তারা বনূ হাশিম গোত্রের প্রতিটি ঘরে ঘরে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খোঁজাখুঁজি শুরু করল। বনূ হাশিম গোত্রে তাঁকে না পেয়ে তারা সাহাবীদের ঘরে ঘরেও তল্লাশি চালাল। পরিশেষে তারা আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বাড়িতে এসে উপস্থিত। তাদের উদ্দেশ্যে আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কন্যা আসমা ঘর থেকে বেরিয়ে এলে আবূ জাহেল তাঁকে জিজ্ঞাসা করল :

'হে মেয়ে! তোমার আব্বা কোথায়?'

আসমা উত্তর দিলেন :

'তিনি এ মুহূর্তে কোথায় আছেন, ঠিক বলতে পারছি না।'

তাঁর এই উত্তর শোনামাত্রই আবূ জাহেল তাঁর গালে সজোরে চপেটাঘাত লাগায়। যার দরুন তিনি দূরে ছিটকে পড়েন। তাঁর দু'দুটি দাঁতও ভেঙে যায়। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন্ পথ অনুসরণ করেছেন, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য সে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তারা মক্কার পদচিহ্ন বিশেষজ্ঞদের ডেকে এনে তাদের সঙ্গে নিয়ে খুঁজতে বের হলো। সওর গুহায় পৌঁছে পদচিহ্ন বিশেষজ্ঞরা কুরাইশ নেতৃবর্গকে বলল :

'আল্লাহর শপথ! মুহাম্মদ এ গুহা অতিক্রম করেনি।'

বিশেষজ্ঞরা তাদেরকে নির্ভুল তথ্যই দিয়েছিল। কেননা, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাথী আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মূলত এ গুহাতেই আশ্রয় নিয়েছিলেন। কুরাইশরা তখন তাদের মাথার উপরেই দাঁড়িয়েছিল। আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু গুহার ভিতর থেকে তাদের গতিবিধি প্রত্যক্ষ করছিলেন এবং তিনি তাদের পা পর্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি শংকিত হয়ে পড়েন ও তাঁর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে। আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে এ অবস্থায় দেখে আল্লাহর রাসূল তাঁর দিকে অভয় ও স্নেহের দৃষ্টিতে তাকান। তখন আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলে উঠেন :

'হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর শপথ! আমি নিজের জন্য ভীত ও শঙ্কিত নই। তারা আপনার সাথে না জানি কী আচরণ করে, সেটা চিন্তা করেই আমি কাঁদছি।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে অত্যন্ত ধীরস্থির ও প্রত্যয়ের সাথে বলেন :

'হে আবূ বকর! কোনো চিন্তা করো না, আল্লাহ আমাদের সঙ্গেই আছেন।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভয়বাণী শুনে আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর অন্তর থেকে ভয়ভীতি সেই মুহূর্তেই দূর হয়ে যায় এবং আল্লাহর কথা স্মরণ করে ঈমানী দৃঢ়তাও বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। এরপর তিনি নিশ্চিন্ত মনে কুরাইশদের গতিবিধি ও পায়ের দিকে লক্ষ্য করতে থাকেন এবং সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবগত করাতে থাকেন।

তিনি বলেন :

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাদের কেউ যদি একটু নিচু হয়ে গুহার দিকে লক্ষ্য করে, তাহলেই কিন্তু আমাদের দেখে ফেলবে।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে তাঁকে বললেন :

'হে আবূ বকর! তুমি জানো না? আমাদের দু'জনের সাথে তৃতীয় যিনি আছেন, তিনি আল্লাহ।'

ঠিক এই মুহূর্তে এক যুবক কুরাইশ নেতাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলে :

'আসুন, আমরা এ গুহায় ঢুকেই দেখি, তারা এখানেও তো লুকিয়ে থাকতে পারে।'

তাকে তিরস্কার করে কুরাইশ সরদার উমাইয়া ইবনে খালফ বলে :

নির্বোধ আর কাকে বলে? গুহার মুখে এই মাকড়সাকে দেখছ না, সে কত বিরাট জাল বিস্তার করে বসে আছে? আল্লাহর শপথ! এটা তো মুহাম্মদের জন্মেরও পূর্বের মাকড়সা।

কিন্তু আবূ জাহেলই একমাত্র ব্যক্তি, যে নিশ্চিত হয়ে বলে উঠল :

'লাত ও উযযা দেবতার শপথ! আমার ধারণা যে, তারা আমাদের অতি নিকটতম কোনো স্থানেই লুকিয়ে আছে। আমরা যে তাদের সন্ধান করছি, তা তারা দেখছে এবং আমাদের কথাও শুনছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা আমাদের চোখে জাদু করেছে।'

সওর গুহা থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বন্দী করতে না পারলেও তারা হাল ছাড়ল না। ব্যর্থতার পরও আশাহত হলো না। তাদের দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহকে খুঁজে পাবে। তাই তারা মক্কা থেকে মদীনাগামী দীর্ঘ পথের দু'পাশের গোত্রগুলোর মাঝে ঘোষণা দিয়ে দিল :

'যে মুহাম্মদকে জীবিত বা মৃত অবস্থায় কুরাইশদের হাতে সোপর্দ করতে পারবে, তাকে আরবের সর্বোৎকৃষ্ট একশ'টি উট উপহার দেওয়া হবে।'

মক্কার অদূরে 'কুদাইদ' নামক স্থানে শুরাকা ইবনে মালিক আল মাদলাজী তার গোত্রের কোনো এক মজলিসে বসেছিল। ঠিক এমন সময়ে কুরাইশ ঘোষকরা তাদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা দিতে এল। তারা জানিয়ে দিল যে, মুহাম্মদকে জীবিত

বা মৃত অবস্থায় তাদের হাতে সোপর্দকারীকে আরবের সর্বোৎকৃষ্ট একশ' উট পুরস্কার দেবে।

শুরাকা ইবনে মালিক একশটি উটের এ বিরাট পুরস্কারের কথা শোনামাত্রই এ পুরস্কারের প্রতি তার মোহ জন্মে গেল। যে কোনো মূল্যে এই পুরস্কার পাওয়ার জন্য তার মনে প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি হলো। কিন্তু সে তার এই আগ্রহকে আপাতত চেপে রাখল। সে তাতে কোনো প্রকার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত না করে সবাইকে অন্যমনস্ক করে ফেলল। যেন এ পুরস্কারের প্রতি তাদের কারো আগ্রহ না জন্মে। সে তার উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে মজলিস থেকে বেরিয়ে আসার পূর্বেই তার গোত্রের এক ব্যক্তি সেখানে এসে বলল :

> 'আল্লাহর শপথ! কিছুক্ষণ আগেই আমার চোখের সামনে দিয়ে তিন ব্যক্তি মদীনার দিকে চলে গেছে। আমার ধারণা, তাদের তিন জনের একজন মুহাম্মদ, অপরজন আবূ বকর ও তৃতীয় জন তাদের পথ-প্রদর্শক।'

শুরাকা ইবনে মালিক তৎক্ষণাৎ তাকে উত্তর দিল :

> 'আরে তারা তো অমুক গোত্রের লোক, যারা তাদের হারানো উট খোঁজার জন্য সেদিকে যাচ্ছিল।'

সে ব্যক্তি শুরাকার এ কথা শুনে বলল :

হতেও পারে, তারা সে গোত্রেরই লোকজন। তাদের হারানো উটের সন্ধান করছে। এই বলে সে খামোশ হয়ে গেল।

যাতে তার বন্ধু-বান্ধবদের মনে কোনো সন্দেহ সৃষ্টি না হয়, সেজন্য কিছুক্ষণ সেখানেই তাদের সাথে আলাপচারিতার পর যখন তারা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল, তখন শুরাকা খুবই সন্তর্পণে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ল। শুরাকা অতি দ্রুত বাড়িতে পৌঁছে চাকরানীকে তার ঘোড়াটি বের করে লোকচক্ষুর আড়ালে মাঠের মাঝখানে বেঁধে রেখে আসতে বলে। অপর এক খাদেমকে কয়েক দিনের খাবার এবং তার বর্শাটিকে এমনভাবে বাড়ির পেছন দরজা দিয়ে বের করে নিয়ে ঘোড়ার নিকট রেখে আসতে বলে, যেন কেউ না দেখে ফেলে। শুরাকা ইবনে মালিক তার লৌহবর্ম পরিধান করে পূর্ণ প্রস্তুতি সহকারে নির্দিষ্ট স্থানে রাখা ঘোড়ার দিকে রওয়ানা হলো। আর কেউ যেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পেয়ে একশ' উটের সেই বিরাট পুরস্কার ছিনিয়ে না নেয়, সে জন্য মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণে খুবই দ্রুত রওনা হয়ে গেল।

নিঃসন্দেহে শুরাকা ইবনে মালিক ছিল দৃঢ়সংকল্পের অধিকারী ছিল। সে ছিল তার গোত্রের গুটিকয়েক দক্ষ ঘোড়সওয়ারের অন্যতম। বিরাট মাথা ও সুঠামদেহী দুর্দান্ত সাহসী পুরুষ ছিল সে। পদচিহ্ন বিশেষজ্ঞ, পথঘাটের প্রতিকূল পরিবেশে সীমাহীন ধৈর্যশীল হিসেবে পরিচিত সে আরবের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিও বটে। এসব গুণ ছাড়াও অত্যন্ত দূরদর্শী, বিচক্ষণ ও একজন বড় কবি। তার ঘোড়াটিও ছিল আরবের স্বীকৃত উচ্চ বংশজাত ঘোড়া। ঘোড়ায় চড়ে চাবুক মারামাত্রই ঘোড়াটি বিদ্যুৎবেগে চলল মদীনার পথে। এক পর্যায়ে তার ঘোড়াটি হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলে সেও দূরে ছিটকে পড়ল। এটি তার নিজের জন্য খারাপ লক্ষণ ভেবে সে বলে উঠল :

'এটা কিসের লক্ষণ?'

সে মনে করল, 'ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিটকে পড়া নিঃসন্দেহে একটা খারাপ লক্ষণ।' এ কথা ভাবতে ভাবতে আবার ঘোড়ায় চড়ে মদীনার পথে ছুটতে থাকল। দ্বিতীয় বারের মতোও ঘোড়াটি ফের হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল এবং সেও ছিটকে পড়ল। এবার তার সন্দেহ গাঢ় হলো। আলামত খারাপ মনে করে ফিরে আসতে মনস্থ করল। কিন্তু একশ' সর্বোৎকৃষ্ট উট পুরস্কারের আকাঙ্ক্ষা তাকে মাঝপথে পরিত্যাগ করতে হবে, তাতে তার মন সায় দিল না। এবারও সে ঘোড়ায় উঠে সামনের দিকে ছুট লাগাল। দ্বিতীয় বারের মতো হোঁচট খাওয়ার স্থান থেকে সামান্য কিছুদূর যেতে না যেতেই সে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথীদের পেয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ সে ধনুকের দিকে হাত বাড়াতেই অনুভব করল যে, তার হাত অবশ হয়ে পড়ছে, ঘোড়ার চারটি পা-ই বালুতে দেবে যাচ্ছে এবং তার সামনের রাস্তা কালো ধোঁয়া আর ধোঁয়ায় ছেয়ে গেছে।

এতদ্সত্ত্বেও সে বারবার ঘোড়াকে সজোরে চাবুকাঘাত করে সামনের দিকে এগুলোর আপ্রাণ চেষ্টা চালাল; কিন্তু সে ঘোড়াকে এগিয়ে নিত সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলো। মনে হচ্ছিল জমিনের সাথে ঘোড়ার পাগুলোকে মযবুতভাবে পেরেক মেরে দেওয়া হয়েছে। তার পরিণতি বুঝতে বিলম্ব হলো না। সে এক মহাবিপদ আঁচ করল। নিরুপায় হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর উদ্দেশ্যে আর্তনাদ করে বলতে থাকল :

'আপনারা দু'জন আমার জন্য আপনাদের রবের নিকট দু'আ করুন, যেন আমার ঘোড়ার পা মুক্ত হয়ে যায় এবং ঘোড়া চলতে সক্ষম হয়। এর প্রতিদানস্বরূপ আমি আপনাদের অনুসরণ থেকে বিরত থাকব।'

তার এই করুণ আর্তনাদের পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য দু'আ করলেন। সাথে সাথে আল্লাহ তার ঘোড়ার পা মুক্ত করে দিলেন এবং ঘোড়া চলতে আরম্ভ করল। এ বিপদ থেকে মুক্ত হতে না হতেই শুরাকা ইবনে মালিকের মনে একশ' উটের বিরাট পুরস্কারের লোভ আবারও মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় সে তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করল। সে তার ঘোড়া হাঁকিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে অগ্রসর হলো। এবারও তার ঘোড়ার পা পূর্বের চেয়ে আরো অধিক মাত্রায় মাটির সাথে আটকে গেল এবং তার শরীর আরও দ্রুত নিস্তেজ হতে থাকল। পূর্বের ন্যায় এবারও শুরাকা ইবনে মালিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে দু'আ করার জন্য মিনতি করতে লাগল। তাদেরকে সে আরয করল যে, আপনারা আমার নিকট থেকে সফরের সমস্ত খাবার ও পানীয়, সাজ-সরঞ্জাম এবং অস্ত্র ও বর্শা ইত্যাদি যা আছে সব কিছু নিয়ে নিন। তার বিনিময়ে আমাকে ও আমার ঘোড়াকে পাথর হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করুন। আল্লাহর শপথ! আমি এর বিনিময়ে আপনাদের ধরার উদ্দেশ্যে পিছনে যারা আসছে, তাদের প্রতিহত করব এবং তাদের ফেরত পাঠাব।

শুরাকা ইবনে মালিককে তাঁরা বললেন :

'তোমার কাছে থাকা অস্ত্র ও পানাহারের কোনো প্রয়োজন আমাদের নেই, শুধুমাত্র আমাদের অনুসরণকারীদের ফিরিয়ে দেওয়ার শর্তেই তোমার জন্য দু'আ করতে পারি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় তার জন্য দু'আ করলেন। এবারও তার ঘোড়ার পা মুক্ত হলো ও চলতে আরম্ভ করল।'

শুরাকা এবার প্রতিশ্রুতি মোতাবেক ফিরতে মনস্থ করতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে সম্বোধন করে বলল :

'আপনারা একটু দাঁড়ান, আমি আপনাদের নিশ্চিত করে বলছি, আল্লাহর শপথ! আমার পক্ষ থেকে আপনাদের কোনোই ক্ষতি হবে না। আমি শুধু আপনাদের সাথে একটু কথা বলতে চাই।'

তাঁরা বললেন : 'আমাদের কাছে কী চাচ্ছ?'

সে বলল :

'হে মুহাম্মদ! আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আরবে আপনার দীন অবশ্যই বিস্তার লাভ করবে এবং আপনার শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। আপনি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিন যে, আমি তখন যদি আপনার রাজ্যে আসি, তখন আমাকে রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত করবেন কি না? করলে আপনার নিকট থেকে লিখিতভাবে আমি তার প্রতিশ্রুতি চাই।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৎক্ষণাৎ শুরাকা ইবনে মালিককে এ প্রতিশ্রুতি লিখিতভাবে দেওয়ার জন্য আবূ বকর সিদ্দীককে নির্দেশ দিলেন। তিনি সাথে সাথে তা পরিত্যক্ত একটি হাড্ডিতে শুরাকাকে লিখে দিলেন।

সে এই লিখিত প্রতিশ্রুতি নিয়ে ফিরে আসার মনস্থ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন :

وَكَيْفَ بِكَ يَا سُرَاقَةُ اِذَا لَبِسْتَ سِوَارَيْ كِسْرٰى؟

'শুরাকা! সেই দিনটি তোমার জন্য কতই না আনন্দদায়ক হবে, যেদিন তোমাকে পারস্য সম্রাটের মহামূল্যবান বালা দুটি পরিয়ে দেওয়া হবে!

শুরাকা ইবনে মালিক আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল :

'কিস্‌রা বিন হুরমুযের বালা দুটি?'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন :

'হ্যাঁ, কিস্‌রা ইবনে হুরমুযের বালা দুটি।'

শুরাকা ইবনে মালিক তার গোত্রের দিকে ফিরে চলল। পথে সে দলে দলে লোকদের মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খোঁজার জন্য আসতে দেখে বলল :

'তোমরা ফিরে যাও। আমি মুহাম্মদ ও তার সাথীকে রাস্তার প্রতি ইঞ্চি জায়গায় তন্নতন্ন করে খুঁজেছি। আর তোমরা আমাকে একজন পদাঙ্কচিহ্ন

বিশেষজ্ঞ হিসেবে খুব ভালো করেই জান। ব্যর্থ চেষ্টায় তোমাদের পা না বাড়িয়ে ফিরে যাওয়াই উত্তম। এভাবে সে পিছু করা লোকদেরকে দলে দলে ফেরত দিতে থাকল। যতদিন না সে নিশ্চিত হলো যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ঠিকঠাক মতো কুরাইশদের নাগালের বাইরে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে গেছেন, ততদিন পর্যন্ত সে তার সাথে সংঘটিত ঘটনাটি গোপন রাখল। সে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়ার পরই এ ঘটনা প্রকাশ করলে আবূ জাহল তাকে একজন স্বার্থপর, সুযোগ সন্ধানী ও কাপুরুষ বলে গালমন্দ করে।

শুরাকা ইবনে মালিক তাঁর তিরস্কারের প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত কবিতায় আবূ জাহলকে জবাব দেয় :

اَبَا حَكَمٍ، وَاللّٰهِ لَوْ كُنْتَ شَاهِدًا

لِاَمْرِ جَوَادِي اِذْ تَسُوخُ قَوَائِمُهُ

عَلِمْتَ وَلَمْ تَشْكُكْ بِاَنَّ مُحَمَّدًا

رَسُولٌ بِبُرْهَانٍ، فَمَنْ ذَا يُقَاوِمُهُ!

'হে আবুল হাকাম! আল্লাহর শপথ! তুমি যদি আমার বেগবান যুদ্ধ-ঘোড়ার পা মাটিতে আটকে যাওয়ার অবস্থা প্রত্যক্ষ করতে, তাহলে তুমি নিঃসন্দেহে সাক্ষ্য দিতে যে, মুহাম্মদ সত্যিই আল্লাহর পক্ষ থেকে মুজিযাপ্রাপ্ত রাসূল। এমন কে আছে, যে তাঁর সামনে এক মুহূর্তও টিকতে পারে?'

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর অতিক্রান্ত হলো। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিনি একদিন নিঃসহায় ব্যথিত ও ভারাক্রান্ত মন নিয়ে রাতের আঁধারে মক্কা নগরী ত্যাগ করেছিলেন, তিনিই আজ বিজয়ী হিসেবে প্রত্যাবর্তন করেছেন। তাঁর পদতলেই আরবের নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের অহমিকা আজ অবনত। চোখ ঝলসানো তলোয়ার ও ধনুক এবং ঝকঝকে বর্শায় সুসজ্জিত হাজার হাজার অনুসারী আজ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে নিবেদিত। অপরদিকে আরবের যালিম কুরাইশ নেতৃবর্গ যাদের দাপটে একদিন মুসলমানগণ মক্কায় শান্তির একটি নিঃশ্বাসও নিতে পারেনি, তারাই আজ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে ভীত ও সন্ত্রস্ত মনে দয়া ও করুণা লাভের জন্য নতজানু।

জীবন ভিক্ষা চেয়ে তারাই আজ আবেদন-নিবেদনরত। তারাই আজ দয়া, করুণা ও ক্ষমার ভিখারী!

তাদের প্রতি আজ মহানবীর হৃদয় দয়া ও করুণার জোয়ারে উথলে পড়ছে। তাদেরকে আশ্বস্ত করা হলো :

اِذْهَبُوا فَاَنْتُمْ اَلطُّلَقَاءُ.

'তোমরা আপনজন ও নিজ নিজ ঘর-বাড়িতে নিশ্চিন্তে ও নির্বিঘ্নে ফিরে যাও, তোমরা সবাই আজ মুক্ত ও ক্ষমাপ্রাপ্ত।'

মক্কা বিজয়ের পর শুরাকা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হতে মনস্থ করল। ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেওয়ার এবং দশ বছর পূর্বের তাকে দেওয়া সেই লিখিত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সে বের হয়ে পড়ল।

শুরাকা ইবনে মালিক নিজ বর্ণনায় বলেন :

'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী জি'রানা নামক স্থানে আনসারদের ক্ষুদ্র একটি বাহিনী কর্তৃক পরিবেষ্টিত অবস্থায় পেলাম।

তাদের বেষ্টনী ভেদ করে আমি তাঁর দিকে অগ্রসর হতে থাকলাম। তখন তারা তাদের বর্শা দ্বারা আমাকে ধাক্কা দিতে দিতে বলতে লাগল :

'পিছনে যাও পিছনে যাও, তুমি কী চাও?'

আমি তাদের বাধা অতিক্রম করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছে গেলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাঁর উটনীর পিঠে বসেছিলেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেওয়া লেখাটি তাঁর দিকে উঁচু করে ধরে বলতে থাকলাম :

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি শুরাকা ইবনে মালিক। আর এ হলো আমাকে দেওয়া আপনার লিখিত প্রতিশ্রুতি।'

আমাকে দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

اُدْنُ مِنِّى يَاسُرَاقَةُ اُدْنُ ..... هٰذَا يَوْمُ وَفَاءٍ وَبِرٍّ

'হে শুরাকা আমার কাছে এস।'

আমি তাঁর নিকটে এলে তিনি বললেন :

'আজ তোমাকে প্রতিদান দেওয়ার ও ধন্য করার দিন।'

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর সামনেই ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে অতীব সম্মান ও কল্যাণে ভূষিত হই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে শুরাকা ইবনে মালিকের ইসলাম গ্রহণের কয়েক মাস যেতে না যেতেই আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবীকে নিজ রহমতের ছায়ায় ডেকে পাঠান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকালে শুরাকা ইবনে মালিকের মন ভেঙে পড়ে। তিনি খুবই মর্মাহত হন। সেদিনের কৃত অপরাধের কথা মনে পড়লেই অনুতাপ করতেন, যেদিন তিনি মাত্র একশ'টি উটের বিনিময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলেন। অথচ আজ সারা পৃথিবীর সমস্ত সম্পদের চেয়েও নবীর প্রতি একটু দৃষ্টিলাভই অধিক মূল্যবান। তিনি অতীতের প্রতি তাকিয়ে আফসোস করতেন এবং বার বার সেই মহাবাণীর পুনরাবৃত্তি করতেন :

'সেই দিনটি তোমার জন্য কতই না আনন্দদায়ক হবে, যেদিন তোমাকে পারস্য সম্রাটের মহামূল্যবান বালা দুটি পরিয়ে দেওয়া হবে।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে এক বিন্দু সন্দেহ ও সংশয় তাঁর মনে ছিল না। তিনি খুবই নিশ্চিত ছিলেন যে, তাঁকে সহসাই এ সম্মানে ভূষিত করা হবে। মাসের পর মাস ও বছরের পর বছর কেটে যাচ্ছিল আর দীন ইসলামের বিজয় দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। এক পর্যায়ে ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্বভার উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ওপর ন্যস্ত হলো। তাঁর গৌরবময় খিলাফতকালেই ইসলামী বাহিনী পারস্য সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ঝড়ো হাওয়ার ন্যায় আক্রমণ করল। মুসলিম বাহিনী পারস্য সৈন্যদের পরাজিত করে দুর্গের পর দুর্গ দখল করে সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকল। তাদের হাতে প্রাদেশিক রাজধানীগুলোর পতন হতে থাকলে গনীমতের বিপুল সম্পদ হস্তগত হয়। এ বিজয়ের এক পর্যায়ে আল্লাহ পুরো পারস্য সাম্রাজ্যের ওপর মুসলমানদের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব দান করলেন। খালীফাতুল মুসলিমীন উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খিলাফতের শেষের দিকে মদীনায় সা'দ

ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর দূত পারস্য বিজয়ের সুসংবাদ নিয়ে উপস্থিত হলেন। এ সুসংবাদের সাথে তিনি বহন করে এনেছেন বায়তুল মালের জন্য এক-পঞ্চমাংশ ($\frac{১}{৫}$) গনীমতের সম্পদ। উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সামনে বিপুল পরিমাণ গনীমতের মূল্যবান সম্পদ রাখা হলে তিনি অবাক হয়ে তা দেখতে থাকেন। সেসব সম্পদের মধ্যে ছিল পারস্য সম্রাটের মণিমুক্তা খচিত মুকুট এবং স্বর্ণজালিকার কারুকার্য খচিত রাজকীয় পোশাক ও হীরে-জহরত খচিত তাঁর মালা এবং দু'হাতের মহামূল্যবান বালা দু'খানা। ইতঃপূর্বে এত সুন্দর বালা আর কেউ কখনো দেখেনি। উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এসব মহামূল্যবান গনীমতের সম্পদ তাঁর হাতের লাঠি দ্বারা উলট-পালট করে দেখছিলেন ও তাঁর দরবারে উপবিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে লক্ষ্য করে বলছিলেন :

'নিঃসন্দেহে মুসলিম বাহিনী এই মূল্যবান সম্পদকে যথাস্থানে ও সঠিকভাবে পৌঁছে দিয়ে পূর্ণ আমানতদারীর পরিচয় দিয়েছে।'

আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সে মুহূর্তে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি খলীফাকে বললেন :

'হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি নিজেই যেহেতু সত্যিকারের আমানতদারী রক্ষা করে চলছেন, সেহেতু আপনার অধীনস্থ ব্যক্তিবর্গও জনসাধারণের অর্থ আত্মসাতের মতো জঘন্য কাজ থেকে আত্মরক্ষা করে চলেছে। আর যদি আপনি নিজে মুসলমানদের সম্পদ আত্মসাৎ করতেন, তাহলে তারাও আত্মসাতের পথ বেছে নিত।'

এই মজলিসেই খালীফাতুল মুসলিমীন উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শুরাকা ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে ডেকে পাঠান। তিনি উপস্থিত হলে খালীফাতুল মুসলিমীন তাঁকে পারস্য সম্রাটের রাজকীয় জামা ও তার রাজকীয় চাদর ও পায়ের মোজা পরিধান করিয়ে দেন। তারপর পারস্য সম্রাটের কোমরে বাঁধা বেল্টখানা শুরাকা ইবনে মালিকের কোমরে এঁটে দিয়ে তার তলোয়ারখানাও তাঁর কাঁধে ঝুলিয়ে দেন। এরপর তার মাথায় সম্রাটের মুকুট ও দু'হাতে পৃথিবীর সর্বাধিক মূল্যবান ও কারুকার্যখচিত বালা দু'খানা পরিয়ে দেন।

মজলিসে উপস্থিত সবাই শুরাকা ইবনে মালিককে দেখে আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার তাকবীর ধ্বনি দিয়ে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তোলেন। আর উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শুরাকা ইবনে মালিকের দিকে লক্ষ্য করে গর্বের সাথে বলতে থাকেন :

"بَخٍ ......... بَخٍ ..........

"أَعْرَبِيٌّ مِنْ بَنِيْ مَدْلَجٍ عَلٰى رَأْسِهٖ تَاجُ كِسْرٰى ... وفى يده سِوَارَيْهِ.

'বাহ!... বাহ!...

'বনূ মাদলাজ গোত্রের নগণ্য এক আরব সন্তান! আল্লাহর কুদরতে আজ তারই মাথায় পারস্য সম্রাটের তাজ এবং দু'হাতে তারই দু'খানা বালা...!! তারপর খালীফাতুল মুসলিমীন উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আকাশের দিকে মাথা তুলে আবেগজড়িত কণ্ঠে বলেন :

'হে আল্লাহ! তোমার প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সাল্লাম এবং আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আমার চেয়ে তোমার নিকট অধিক প্রিয় ও সর্বাধিক সম্মানিত ছিলেন। তুমি তাদেরকে এই সম্পদ দান করনি। অথচ আমাকে তুমি এই অঢেল সম্পদ দান করে পরীক্ষায় ফেলেছ। আমি এর সঠিক ব্যবহার না করার অপরাধে অপরাধী হওয়া এবং আমানতের খিয়ানত করা থেকে তোমার নিকট পানাহ চাই।' –এই বলে এ অঢেল সম্পদ যথাযথভাবে মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করার পরই তিনি মজলিস ত্যাগ করেন।

---

শুরাকা ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সহায়ক গ্রন্থাবলি :

১. উসদুল গাবাহ : ২য় খণ্ড, ২৩২ পৃ.।
২. আল ইসাবাহ : ২য় খণ্ড, ১৮ পৃ.।
৩. আমারুল কুলুব ফিল মুদাফ ওয়াল মানসুব লিসসা'আলাবী : ৯৩ পৃ.।
৪. আত তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনে সা'দ : ১ম খণ্ড, ১৮৮ পৃঃ, ২৩২ পৃ., ৪র্থ খণ্ড : ৩৬৬ পৃঃ, ৫ম খণ্ড, ৯০ পৃ.।
৫. আস সীরাতুন নুবুবিয়াহ লিইবনি হিশাম : ২য় খণ্ড, ১৩৩-১৩৫ পৃ. এবং সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।
৬. হায়াতুস সাহাবা : ৪র্থ খণ্ডের সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।
৭. তাজুল উরূস মিন জাওয়াহিরুল কামুস : ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৮৩ পৃ.।

# ফাইরোয আদ্‌দাইলামী (রা)

*'ফাইরোয আদ্‌দাইলামী মহৎ ও বরকতময় পরিবারের মহৎ ও বরকতময় ব্যক্তি।' –মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)*

বিদায় হজ্জ থেকে মদীনায় ফেরার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হয়ে পড়লে সমগ্র আরব উপদ্বীপে সে সংবাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এ সুযোগে ইয়ামেনের আসওয়াদ আল আনসী, ইয়ামামার মুসাইলামাতুল কায্‌যাব এবং বনূ আসাদ গোত্রের তুলাইহা আল আসাদী ইসলাম পরিত্যাগ করে নবুওয়াতের মিথ্যা দাবি করে বসে। তারা দাবি করতে থাকে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন কুরাইশ গোত্র থেকে নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন, তেমনি তারাও তাদের স্ব-স্ব গোত্রে নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছে।

ইয়ামেনের আসওয়াদ আল আনসী ছিল একজন জাদুকর। সে ছিল যেমন কুৎসিত, তেমনি গণ্ডারের মতো ভয়ঙ্কর চেহারার মানুষ। যেমন একাধারে সে যুগশ্রেষ্ঠ ধূর্ত, দাগাবাজ, কুটিল, তেমনি হীন মন-মানসিকতার অধিকারী। এতদ্‌সত্ত্বেও সে ছিল একজন সুসাহিত্যিক ও তুখোড় বক্তা। সে তার জাদুকরী বক্তৃতায় বড় বড় পণ্ডিতকেও হারিয়ে দিত এবং জনসাধারণকে প্রতারিত করত। সে তার জাদুর কূটকৌশলের জোরে সাধারণ ও সরলমনা ব্যক্তিদের ধোঁকায় ফেলতে যেমন ছিল পারদর্শী, তেমনি ছিল তার অর্থ, পদ ও কর্তৃত্বের প্রতি সীমাহীন ঝোঁক। সে দর্শকদের ভীত ও সন্ত্রস্ত করার উদ্দেশ্যে তার চেহারায় কৃত্রিম বীভৎস মেকআপ করে জনগণের সামনে আসত। সে সময় ইয়ামেনে 'আল আবনায়া' সম্প্রদায়ের মুসলমানেরা বেশ প্রভাবশালী ছিলেন। প্রসিদ্ধ

সাহাবী ফাইরোয আদ্‌দাইলামী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন তাদের অন্যতম নেতা। যারা পারস্য থেকে ইয়ামেনে হিজরত করে আসে, তাদের বংশধরদেরকেই 'আবনায়া' সম্প্রদায় বলা হতো। তাদের পিতারা ছিল পার্সিয়ান আর মায়েরা ছিল আরব। তাদের ইয়ামেনে হিজরতের প্রাক্কালে রোমান সম্রাট কিস্‌রা-এর প্রতিনিধি হিসেবে 'বাজান' ছিলেন ইয়ামেনের গভর্নর। এক পর্যায়ে তাঁর সামনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইসলামের সুমহান দাওয়াতে মুগ্ধ হয়ে তিনি পারস্য সম্রাটের আনুগত্য ত্যাগ করে তাঁর সম্প্রদায়সহ ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকেই ইয়ামেনের গভর্নর হিসেবে বহাল রাখেন। ভণ্ড নবী আসওয়াদ আল আনসীর নবুওয়াত দাবি করার মাত্র কিছু দিন পূর্বে তিনি নিজ পদে বহাল থাকা অবস্থায় ইনতিকাল করেন।

আসওয়াদ আল আনসীর স্ব-গোত্র 'বনূ মাজহিজ'-এর লোকজন সর্বপ্রথম এই ভণ্ডের কথায় সাড়া দেয়। সে তার গোত্রের যোদ্ধাদের নিয়ে ইয়ামেনের রাজধানী 'সানআ'তে অতর্কিত আক্রমণ চালায় এবং 'বাজান'- এর পুত্র গভর্নর 'শাহার'কে হত্যা করে তার স্ত্রী 'দাযা'কে জোরপূর্বক বিবাহ করে। এরপর সে 'সানআ' থেকে অন্যান্য অঞ্চলেও আক্রমণ চালায়। ইয়ামেনের হাদরামাউত থেকে তায়েফ এবং বাহরাইন থেকে আল আহ্‌সা পর্যন্ত বিরাট অঞ্চল দ্রুত তার করায়ত্তে আসে।

ভণ্ড নবী আসওয়াদ আল আনসী তার চমকপ্রদ জাদুকরী বক্তৃতায়ই শুধু নয়; একজন প্রতারক হিসেবেও ছিল প্রসিদ্ধ। তার কূটকৌশলও ছিল অদ্ভুত। সে তার অনুসারীদের ধারণা দিত যে, নির্দিষ্ট ফেরেশতারা তার নিকট গায়েবী সংবাদ বহন করে আনে এবং ওহী অবতীর্ণ করে থাকে।

লোকজনকে ভ্রান্ত ধারণায় বিশ্বাস করানোর জন্য তার চৌকস গুপ্তচরদের ব্যবহার করত। ঐসব গুপ্তচরদের সে সর্বত্র ছড়িয়ে রাখত, যেন তারা জনগণের অন্দর মহলের খবরাখবর সম্পর্কেও তাকে অবহিত করে। তাদের গোপনীয় বিষয়াদি জেনে তা তাকে সরবরাহ করত। দিনের বেলায় তারা তাদের সমস্যাদি সম্পর্কে অবগত হতো ও তাদের মনের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করত এবং রাতের অন্ধকারে এসে তাকে সেসব গোপনীয় তথ্যাদি সম্পর্কে অবহিত করত। অতঃপর যে ব্যক্তি যে ধরনের সমস্যার সম্মুখীন, সে সেসব সমস্যার আলোকে

তার সাথে কথা বলত। এভাবে সে জনগণের বিশ্বাসকে প্রতারিত করে তার প্রতি জনগণকে আকৃষ্ট করত। তার অনুসারীদের উদ্ভট ও অদ্ভুত গল্প-কাহিনী শোনানোর মাধ্যমে তাদের বিবেকের ওপর সে প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হতো। তার এসব ভ্রান্ত চিন্তা ও ভণ্ডামি সর্বত্র দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যথাসময়ে আসওয়াদ আল আনসী ও তার অনুসারীদের ইয়ামেনে বিদ্রোহ ঘোষণার সংবাদ পৌঁছে। তিনি ইয়ামেনের প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারী আস্থাবান ব্যক্তিদের প্রায় ১২ জন সাহাবীর নিকট জরুরিভাবে পত্র প্রেরণ করলেন। সেসব পত্রে তিনি তাদের বর্তমান পরিস্থিতিতে দৃঢ় মনোবল, ঈমানী চেতনা ও সাহসিকতার পরিচয় দিতে বলেন। সাথে সাথে যে কোনো মূল্যে এই ফিতনার মূলোৎপাটন ও ভণ্ড নবীর দাবিদার আসওয়াদ আল আনসীকে শেষ করে দেওয়ারও নির্দেশ দেন।

যেসব সাহাবীর নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পত্র প্রেরণ করেন, তারা সবাই কালবিলম্ব না করে আনন্দের সাথে এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে তৎপর হয়ে উঠেন। সর্বপ্রথম যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ আহ্বানে সাড়া দেন তারা হলেন, ফাইরোয আদ্‌দাইলামীর নেতৃত্বে 'আবনায়া' গোত্রের লোকজন।

প্রিয় পাঠক! আমরা এখানে ফাইরোয আদ্‌দাইলামী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিজের বর্ণনা থেকেই এ ঘটনা উদ্ধৃত করছি :

ফাইরোয আদ্‌দাইলামী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ভণ্ড নবী আসওয়াদ আল আনসীর সৃষ্ট পরিস্থিতি ও তার মূলোৎপাটনের ঘটনার বর্ণনায় বলেন :

> আমি এবং আমাদের 'আবনায়া' গোত্রের লোকজন কখনো আল্লাহর এ দীনের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ পোষণ করতাম না। এই ভণ্ড নবীর কোনো প্রকার ধূর্তামি আমরা সত্য বলেও মনে করতাম না। আমরা সবাই সে মুহূর্তের অপেক্ষায় ছিলাম যে, সুযোগ বুঝেই যে কোনো কৌশল ও ত্যাগের বিনিময়ে তার প্রতারণা থেকে জাতিকে মুক্ত করব। সেই মুহূর্তেই ইসলাম গ্রহণকারী নিষ্ঠাবান 'আবনায়া' সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয়দের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র পৌঁছায়। তাঁর আহ্বানে আমরা

পরস্পরে আরো সংঘবদ্ধ ও উৎসাহী হলাম এবং পরিকল্পনা মোতাবেক প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্থানে তৎপরতা শুরু করে দিলাম। অন্যদিকে সে তার প্রত্যাশিত বিজয়ের কারণে গর্ব ও অহংকারে ফেটে পড়তে থাকল। এমনকি তার সেনাপতি কায়েস ইবনে আবদে ইয়াগুসও তার অহংকারের শিকারে পরিণত হলো। সেনাপতি কায়েস তার দ্বারা লাঞ্ছিত হয় এবং তার জীবনও সঙ্কটাপন্ন হয়ে ওঠে।

এ সুযোগে আমি ও আমার চাচাত ভাই 'দাজাওয়াইহ' সেনাপতি কায়েস-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরিত পত্র সম্পর্কে অবহিত করি। রাত গভীর হওয়ার পূর্বেই খোদার দুশমন থেকে পরিত্রাণের জন্য তাকে আহ্বান জানাই। এ উদ্দেশ্যে তার নিকট আমাদের উপস্থিতি যেন তার জন্য আসমানী সাহায্য ছিল। আমাদের আহ্বানে তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিলেন এবং আসওয়াদ আল আনসীর প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত গোপন তথ্য ফাঁস করে দিলেন। আমরা তিনজন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলাম যে, আমরা খোদাদ্রোহী এই ভণ্ড নবীকে তার প্রাসাদের ভিতর থেকে এবং অন্যরা প্রাসাদের বাইরে থেকে যুগপৎ আক্রমণ করব। আমরা পরামর্শ করলাম যে, এই অভিযানে আমার চাচাত বোন– তার স্বামী শাহার ইবনে বাজানকে হত্যা করার পর আসওয়াদ আল আনসী যাকে জোরপূর্বক বিয়ে করেছে– তাকেও আমাদের সাথে নেব। পরিকল্পনা মোতাবেক আমি আসওয়াদ আল আনসীর প্রাসাদে ঢুকে আমার চাচাত বোন 'দাযা'– এর সাথে দেখা করে তাকে বললাম :

বোন! তুমি তো ভালো করেই অবগত আছ যে, আল্লাহর এ দুশমন তোমার ও আমাদের জন্য কি দুর্গতির কারণই না হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে তোমার স্বামীকে হত্যা করেছে। তোমার স্ব-গোত্রীয় নারীদেরকে লাঞ্ছিত করেছে এবং অগণিত পুরুষকে হত্যা করে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। তোমাদের থেকে রাজত্ব ছিনিয়ে নিয়েছে। এ হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিঠি, যাতে তিনি আমাদেরকে বিশেষভাবে এবং ইয়ামেনবাসীদেরকে সাধারণভাবে এই ভণ্ড নবীর সৃষ্ট ফিতনার মূলোৎপাটনের নির্দেশ দিয়েছেন। এ ব্যাপারে তুমি কি আমাদের সাহায্য করতে পার?

সে প্রশ্ন করল :

কী ধরনের সহযোগিতা তোমরা চাচ্ছ?

তাকে বললাম, ওকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চাই।

সে বলল :

ক্ষমতাচ্যুত নয়; বরং তাকে হত্যা করতে হবে।

তাকে বললাম :

আল্লাহর শপথ, এছাড়া আমাদের অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই। কিন্তু এ প্রস্তাব তোমার কাছে রাখতে ভয় পাচ্ছিলাম।

সে বলল :

যে আল্লাহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'বাশীর' (সুসংবাদদাতা) ও 'নাযীর' (ভীতি প্রদর্শনকারী) হিসেবে আমাদের নিকট প্রেরণ করেছেন, তাঁরই শপথ করে বলছি :

'আমি এক পলকের জন্যও ইসলামবিমুখ হইনি। আল্লাহর সৃষ্টিজগতে এই শয়তানের চেয়ে নিকৃষ্ট কোনো পুরুষ আমার দৃষ্টিতে পড়েনি। আল্লাহর শপথ! আমি আমার প্রথম দৃষ্টি থেকেই তাকে একজন পথভ্রষ্ট, ধোঁকাবাজ ও পাপিষ্ঠ শয়তান ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারিনি। সে এমন এক শয়তান, যার চরিত্রে না আছে সত্যের বিন্দুমাত্র নিশানা আর না আছে অসত্যের প্রতি ওর কোনো ঘৃণা।'

তাকে জিজ্ঞাসা করলাম :

কিভাবে তাকে হত্যা করতে পারি?

আমার চাচাত বোন বলল :

সে তার নিরাপত্তার ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক। দূরের পরিত্যক্ত ঐ ঘরটি ছাড়া এ প্রাসাদের সব স্থানেই থাকে চৌকস নিরাপত্তা বাহিনীর নিশ্ছিদ্র পাহারা। ঐ ঘরটির পেছনে বিরান জঙ্গলে আপনাদের পৌঁছতে হবে। রাতের অন্ধকারে আপনারা সে ঘরের দেয়াল ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে পড়বেন। ঢুকেই সেখানে অস্ত্র ও বাতি রাখা অবস্থায় পাবেন। আমি আপনাদের অপেক্ষায় থাকব। আমার সহায়তায় আপনারা তার রাত্রি যাপনের বিশেষ কক্ষে প্রবেশ করে তাকে হত্যা করবেন।

আমার বোনকে বললাম :

কিন্তু এই সুরক্ষিত প্রাসাদে একটা ঘরের দেয়াল ছিদ্র করা কোনো সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। তদুপরি সর্বক্ষণই পাহারাদাররা আওয়ায দিতে দিতে চক্কর কাটতে থাকে। এ পরিস্থিতিতে ঘরের দেয়ালে ছিদ্র করতে যাওয়া অপরিণামদর্শিতা ছাড়া আর কিছুই হবে না।

আমার বোন বলল :

আপনি যথার্থই বলেছেন। কিন্তু আমার নিকট এ ব্যাপারে অন্য একটি প্রস্তাবও আছে।

জিজ্ঞাসা করলাম তা কী?

সে বলল :

নির্ভরযোগ্য ও দেয়ালে গর্ত করতে সক্ষম এমন কয়েক ব্যক্তিকে ডেকে আগামীকাল আমার নিকট প্রেরণ করবেন। তাদেরকে দিয়ে আমি সেই ঘরের দেয়ালের ভেতর দিকটার নির্দিষ্ট স্থানে গর্ত করিয়ে রাখব। আপনারা রাতের বেলা সামান্য একটু গর্ত করে সহজেই ভিতরে প্রবেশ করতে পারবেন।

তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম : উত্তম চিন্তা করেছ তুমি।

তার সাথে এই পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে আমি আমার অন্য দু'সাথীকে এই পরিল্পনার কথা জানাই। তারাও এ পরিকল্পনায় সম্মতি জানালেন। এরপর থেকেই আমরা ভণ্ড নবীকে হত্যা করার জন্য আরো বেশি করে তৎপর হয়ে উঠলাম। আমাদের একান্তই বিশ্বস্ত মুমিন সাথীদেরকে গোপন সংকেত জানিয়ে দিয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বললাম। তাদের সাথে আমাদের আক্রমণের সময়-ক্ষণ পরের দিন ফজরের সময় বলে নির্ধারণ করলাম। রাত ঘনিয়ে এলে যথাসময়েই আমি, আমার দুই সাথীসহ গর্ত খননের নির্ধারিত স্থানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। সেখানে গিয়ে সামান্য গর্ত করেই আমরা ভিতরে প্রবেশ করি। বাতি জ্বালিয়ে আমরা অস্ত্রসজ্জিত হয়ে আল্লাহর সেই দুশমনের শয্যাকক্ষের দিকে অগ্রসর হতে থাকি। সেই কক্ষের দরজায় আমার চাচাত বোন আমাদের অপেক্ষায় ছিল। আমাদের দেখেই সে ভিতরে প্রবেশের ইঙ্গিত করল। আমরা ভিতরে প্রবেশ করেই দেখতে পাই যে, ভণ্ড

নবী আসওয়াদ আল আনসী নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে। কালবিলম্ব না করে আমি সজোরে তার গলায় খঞ্জর চালালাম। সে করা ষাঁড়ের মতো গোঙাতে এবং যবাহকৃত উটের মতো ছটফট ছটফট করতে আরম্ভ করল। চারদিক থেকে তার প্রহরীরা গোঙানোর আওয়ায শুনে তার কক্ষের দিকে ছুটে আসতে থাকল।

তারা জিজ্ঞাসা করল যে :

'কী ব্যাপার! এ বিকট আওয়ায কিসের?'

আমার বোন তাদেরকে উত্তর দিল :

'আপনারা নিশ্চিন্তে চলে যান, আল্লাহর নবীর উপর ওহী নাযিল হচ্ছে...। এ কথা শুনে প্রহরীরা যার যার স্থানে ফিরে গেল।'

তাকে হত্যা করার পর আমরা সুবহে সাদিক পর্যন্ত প্রাসাদেই অবস্থান করলাম। তারপর প্রাসাদের ছাদে উঠে সজোরে আযান দিলাম। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আশ্হাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ বলার পর সজোরে বললাম, আশহাদু আন্না আসওয়াদ আল আনসী কায্যাব অর্থাৎ আমি এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আসওয়াদ আল আনসী ভণ্ড, মিথ্যাবাদী। আমার অন্যান্য সাথীদের বাইরে থেকে আক্রমণ করার এটাই ছিল গোপন সংকেত। এ সংকেত পাওয়ামাত্রই মুসলমানরা চতুর্দিক থেকে এসে প্রাসাদে আক্রমণ চালাল। এতে প্রহরীরা হতভম্ব হয়ে গেল এবং তাদের অগ্রসর হতেই উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ বেধে গেল। ঐ মুহূর্তে আমি প্রাসাদের ছাদ থেকে আসওয়াদ আল আনসীর দ্বিখণ্ডিত শির ছুঁড়ে মারলাম। আসওয়াদ আল আনসীর সৈন্যরা তার দ্বিখণ্ডিত শির দেখে হতাশা ও নিস্তেজ হয়ে পড়ল। এদিকে ঈমানদাররা তার দ্বিখণ্ডিত শির দেখে আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলল। তারা শত্রু বাহিনীর ওপর নবোদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সূর্যোদয়ের পূর্বেই আল্লাহ মুসলমানদের বিজয় দান করলেন। সূর্যোদয়ের পর বিজয়ের সুসংবাদসহ একটি প্রতিনিধি দলকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে প্রেরণ করি। এই প্রতিনিধি দল মদীনা মুনাওয়ারায় পৌছে জানতে পারে যে, তাদের পৌছানোর পূর্বের রাতে রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে ইহজগৎ ত্যাগ করেছেন। তারা আরো জানতে পারে যে, যে রাতে আসওয়াদ আল আনসীকে হত্যা করা হয়েছে, সে রাতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওহী দ্বারা এ সংবাদ পৌঁছানো হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের কাছে এ ব্যাপারে সুসংবাদ প্রদান করে বলেছেন :

'গত রাতে অত্যন্ত মুবারক পরিবারের মুবারক ও মহৎ এক ব্যক্তি আসওয়াদ আল আনসীকে হত্যা করেছে।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই মুবারক ব্যক্তির পরিচয় জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন :

'সে হলো ফাইরোয.......!

মুবারক হোক, ফাইরোয.......!

মুবারক হোক সেই ফাইরোয...... ।'

---

ফাইরোয আদ্‌দাইলামী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সহায়ক গ্রন্থাবলি :


১. আল ইসাবাহ : ৭০১২ নং জীবনী।
২. আল ইসতিয়াব : (ইসাবার টীকা) ৩য় খণ্ড , ২০৪ পৃ.।
৩. উসদুল গাবাহ : ৪র্থ খণ্ড, ২৭১ পৃ.।
৪. তাহযীবুত্ তাহযীব : ৮ম খণ্ড, ৩০৫ পৃ.।
৫. আত-তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনি সা'দ : ৫ম খণ্ড, ৫৩৩ পৃ.।
৬. তারীখু আত-তাবারী : ৩য় খণ্ড ও ১০ম খণ্ডের সূচিপত্র দ্রষ্টব্য ।
৭. আল কামিল লি- ইবনি আছীর : ১১শ সালের হাওয়াদেস অধ্যায়।
৮. ফুতুহুল বুলদান লিল বালাযিরী : ১১১-১১৩ পৃ.।
৯. জামহিরাতুল আনসাব : ৩৮১ পৃ.।
১০. তারীখুল খামীস : ২য় খণ্ড, ১৫৫ পৃ.।
১১. দাইরাতুল মাআরিফ আল ইসলামিয়াহ : ২য় খণ্ড , ১৯৮ পৃ.।
১২. তারীখ খলীফাতু ইবনে খাইয়াত : ৮৪ পৃ.।
১৩. হায়াতুস সাহাবা : ২য় খণ্ড, ২৩৮-২৪০ পৃ.।
১৪. আল আ'লাম লি যিরকানী : ৫ম খণ্ড , ২৯৯ পৃঃ এবং ৫ম খণ্ড, ৩৭১ পৃ.।

# ছাবেত ইবনে কায়েস আল আনসারী (রা)

*'একমাত্র ছাবেত ইবনে কায়েস আল আনসারী (রা)-এর ওসিয়ত ব্যতীত অন্য কোনো মৃত ব্যক্তির ওসিয়ত ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ নয়।' –ফুকাহাদের অভিমত*

ইয়ামেন থেকে এসে ইয়াসরিবে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে আরবের প্রখ্যাত খাযরাজ গোত্র। এই গোত্রের প্রখ্যাত নেতা হলেন ছাবেত ইবনে কায়েস আল আনসারী। মদীনার অধিকাংশ আনসারই এই খাযরাজ গোত্রের সদস্য। ইয়াসরিব নগরীর প্রভাবশালী নেতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম।

তিনি ছিলেন কোমল হৃদয়ের অধিকারী, মানবপ্রেমিক, যুক্তিবাদী, উচ্চ কণ্ঠস্বরবিশিষ্ট এবং তেজস্বী বক্তা। মোটকথা, প্রায় সবদিকেই ছিল তাঁর প্রখর প্রতিভার বিকাশ। ইয়াসরিবে সর্বপ্রথম ইসলামগ্রহণকারী ব্যক্তিদেরও তিনি ছিলেন অন্যতম। একবার মদীনায় মুসআব ইবনে উমায়ের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এক দাওয়াতী সমাবেশে মধুর স্বরে কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। সেই তিলাওয়াতের সুমধুর স্বর ও তার ভাব-ব্যঞ্জনা ছাবেত ইবনে কায়েস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর অন্তরে গভীরভাবে রেখাপাত করে। তিলাওয়াতকৃত আয়াতের মর্মবাণী তাঁর মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে। পরিশেষে ঈমান গ্রহণের জন্য আল্লাহ তাঁর অন্তরকে প্রশস্ত করে দেন। এভাবেই তিনি ঈমানের ঘোষণা দিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাওহীদী ঝাণ্ডার ছায়াতলে আশ্রয় নেন এবং মুমিনদের কাতারে শামিল হন। অতঃপর দীনের দাওয়াত সম্প্রসারণের জন্য তিনি আত্মনিয়োগ করেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরত করে এলেন। ছাবেত ইবনে কায়েস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর গোত্রের বিরাট অশ্বারোহী বাহিনীসহ তাঁকে শানদার ইসতিক্‌বাল বা এক উষ্ণ সম্বর্ধনা দেন। তিনি স্বাগত ভাষণে আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ছানা ও দরূদ পাঠের পর অত্যন্ত ঈমানদীপ্ত ভাষণ দেন। সে ভাষণে শ্রোতারা অত্যন্ত মুগ্ধ হন। তিনি তাঁর ভাষণ এই বলে শেষ করেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার সাথে প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমরা আমাদের পরিবার-পরিজন, স্ত্রী-পুত্র ও নিজেদের জান-মাল, ইয্‌যত ও আবরুকে যেভাবে হেফাযত করি, আপনাকেও সেভাবে প্রাণের বিনিময়ে হলেও হেফাযত করব এবং সর্বপ্রকার সহযোগিতা অব্যাহত রাখব ইনশাআল্লাহ। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাদের অবহিত করবেন কি যে, এর বিনিময়ে আমরা কী পেতে পারি? এ স্বাগত ভাষণের জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

'তোমরা এ মহান ত্যাগের বিনিময়ে পাবে 'জান্নাত'।'

এ বিরাট সংবর্ধনাসভায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে 'জান্নাত'-এর প্রতিশ্রুতি শোনামাত্রই তাদের হৃদয়-মন আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠে। তাদের হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় খুশির চমক ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিদানের এই মহান ঘোষণায় তারা এক বাক্যে বলে উঠে :

'হে আল্লাহর রাসূল! আমরা সন্তুষ্ট হয়েছি...।

হে আল্লাহর রাসূল! আমরা সন্তুষ্ট হয়েছি...।'

সেদিন থেকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাবেত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে তাঁর মুখপাত্র নিযুক্ত করেন। হাসসান ইবনে ছাবেত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে যেমন তাঁর কবি হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন।

আরবের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাহিত্যিক, ভাষাবিদ ও প্রখ্যাত বক্তাদের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বাহাস বা বিতর্কের জন্য প্রায়ই মদীনায় আসত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে জ্বালাময়ী বক্তৃতা ও জাদুকরী ছন্দের দ্বারা তাদের উপযুক্ত জবাব দেওয়ার জন্য ছাবেত ইবনে কায়েস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে তিনি দায়িত্ব দিতেন। এমনিভাবে কবি ও পণ্ডিতদের প্রতিনিধিদল প্রতিযোগিতার জন্য এলে কবিতার মাধ্যমে তাদেরকে দাঁতভাঙা জবাব দেওয়ার জন্য হাসসান ইবনে ছাবেত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে নির্দেশ দিতেন।

ছাবেত ইবনে কায়েস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দৃঢ় ঈমানী চেতনার অধিকারী ছিলেন। আল্লাহর ভয় ও তাকওয়ার দিক থেকেও ছিলেন বিরল ব্যক্তিত্বের মানুষ। আল্লাহ নারাজ হতে পারেন, এ জাতীয় কোনো আচার-আচরণ ও কথাবার্তা থেকে তিনি সর্বদাই দূরে থাকতেন। একবার রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে খুবই বিমর্ষ, চিন্তিত এবং ভীত-বিহ্বল দেখতে পেলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন :

'আবূ মুহাম্মদ তোমার কী হয়েছে?'

উত্তরে তিনি আরয করলেন :

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার আশঙ্কা হচ্ছে, আমি ধ্বংস হয়ে না যাই।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন :

'সেটা কিভাবে?'

ছাবেত ইবনে কায়েস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন :

'আমি যা করিনি সে বিষয়ে কেউ আমার প্রশংসা করুক, এমন করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন। অথচ আমি আমার প্রশংসা করাকেই পছন্দ করি এবং ভালোবাসি। গর্ব ও অহংকার প্রদর্শন করার ইচ্ছাকে আল্লাহ নিষেধ করেছেন, অথচ তা আমি ভালোবাসি এবং পছন্দ করি।'

এসব চিন্তা করতে করতে তিনি আল্লাহর ভয়ে অস্থির হয়ে পড়ছিলেন। অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আশ্বস্ত করছিলেন। এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন :

হে ছাবেত! তুমি কি চাও না যে, তুমি একজন প্রশংসিত ব্যক্তি হিসেবে জীবন যাপন কর... এবং আল্লাহর পথে শাহাদাতের মৃত্যুবরণ কর...? তুমি কি জান্নাতে প্রবেশ করতে চাও না...?

ছাবেত ইবনে কায়েস রাদিয়াল্লাহ তাআলা আনহু এ সুসংবাদ শ্রবণ করামাত্রই তাঁর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠে। তিনি বলতে থাকেন, নিশ্চয়ই ইয়া রাসূলাল্লাহ! নিশ্চয়ই ইয়া রাসূলাল্লাহ!

রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন :

'হে ছাবেত, তোমার জন্যই উক্ত ঐ সংবাদ।'

যখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা হুজুরাতের এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন :

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْآ اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ـ

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবীর আওয়াযের চেয়ে উচ্চ আওয়াযে কথা বলো না। তোমরা পরস্পরে যেমন উচ্চস্বরে কথাবার্তা বলে থাক, তাঁর সাথে তেমনভাবে কথা বলো না, অসতর্কতার কারণে তোমাদের সমস্ত আমল যেন বৃথা না যায়।' (সূরা হুজুরাত : ২)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অগাধ ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও ছাবেত ইবনে কায়েস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে উপস্থিত হওয়া হতে বিরত থাকলেন। শুধু জামাআতের সাথে নামায আদায় ছাড়া বাকি সময় তিনি নিজ গৃহেই অবস্থান করতে থাকলেন। তাঁর অনুপস্থিতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তীব্রভাবে অনুভব করছিলেন।

তিনি সাহাবীদের বললেন : 'এমন কে আছ যে, আমাকে ছাবেত ইবনে কায়েস-এর সংবাদ এনে দিতে পার?'

আনসারদের একজন দাঁড়িয়ে আরয করলেন :

হে আল্লাহর রাসূল! এ জন্য আমি প্রস্তুত। তিনি আনসারী ছাবেত ইবনে কায়েস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বাড়ি গিয়ে দেখতে পেলেন যে, তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ও বিষণ্ন মনে মাথা নিচু করে বসে আছেন। তাঁকে এ অবস্থায় দেখে জিজ্ঞাসা করলেন :

'হে আবূ মুহাম্মদ আপনার কী হয়েছে?'

তিনি উত্তর দিলেন : 'আমি ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় দিনাতিপাত করছি।'

তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন : 'কিভাবে?'

তিনি জানালেন :

'হে আনসারী ভাই! তুমি ভালো করেই জান যে, আমার উচ্চকণ্ঠ। অনেক সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আওয়াজের চেয়ে আমার আওয়াজ উচ্চ হয় বলে আমি মনে করি। এ ব্যাপারে আল কুরআনে যে আয়াত নাযিল হয়েছে, তা তুমি জান। আমার এ উচ্চৈঃস্বর এমন না হয় যে,

আমার সমস্ত কর্মফল বৃথা যায় ও আমি দোযখবাসী হয়ে যাই। তাঁর এ অবস্থা দেখে ও বক্তব্য শুনে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরে এসে বিস্তারিত বর্ণনা দেন। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে নির্দেশ দিলেন যে :

'তুমি পুনরায় তার নিকট গিয়ে তাকে সুসংবাদ দাও যে, তুমি দোযখবাসী নও; বরং তুমি অবশ্যই জান্নাতবাসী।'

ছাবেত ইবনে কায়েস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জন্য এটা ছিল নিঃসন্দেহে সুসংবাদ, যিনি তাঁর সারা জীবন এ সুসংবাদের আশায় অতিবাহিত করেন।

ছাবেত ইবনে কায়েস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একমাত্র বদরের যুদ্ধ ছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সমস্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষায় তিনি শত্রুপক্ষের প্রচণ্ড আক্রমণকে উপেক্ষা করে তাদের ওপর বীরবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। তাদের ব্যূহ ভেদ করে অভ্যন্তরে ঢুকে আক্রমণ চালাতেন। কিন্তু প্রতিবারই তাঁকে শাহাদাতের দ্বারপ্রান্ত থেকে ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় ফিরে আসতে হয়েছে। পরিশেষে তিনি এ আকাঙ্ক্ষা নিয়েই আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খিলাফতকালে মুসলমান ও ভণ্ড নবী মুসাইলামার মধ্যে সংঘটিত রিদ্দার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

এ যুদ্ধে ছাবেত ইবনে কায়েস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন আনসার বাহিনীর সিপাহসালার এবং আবূ হুযাইফার আযাদকৃত ক্রীতদাস সালেম ছিলেন মুহাজির বাহিনীর সিপাহসালার। আনসার ও মুহাজিরসহ সমস্ত মরুসন্তানদের যৌথ বাহিনীর সুপ্রিম কমান্ডের অধিনায়ক ছিলেন খালেদ ইবনে ওয়ালীদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। এ যুদ্ধের সার্বিক পরিস্থিতি প্রথম থেকেই মুসাইলামাতুল কাযযাব ও তার বাহিনীর অনুকূলে ছিল।

এক পর্যায়ে তারা মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি খালিদ ইবনে ওয়ালীদের তাঁবুতে আক্রমণ চালাতে সমর্থ হয়। তারা সুপ্রিম কমান্ডের নিয়ন্ত্রণ কক্ষকে তছনছ করে এর রশিগুলো কেটে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে। তাঁবুতে অবস্থানরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদের স্ত্রী 'উম্মু তামীম'কে পর্যন্ত হত্যা করতে উদ্যত হয়। ছাবেত ইবনে কায়েস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সেদিন মুসলমানদের দুর্বলতা ও বিশৃঙ্খলা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে অতীব দুঃখিত ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তারা এজন্য পরস্পরকে দায়ী করতে থাকেন। শহরবাসীরা মরুবাসীদের এই কাপুরুষোচিত কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী করে। আর মরুবাসীরা শহরবাসীদের দায়ী করে বলে,

মূলত তারা আরামপ্রিয় হওয়ায় যুদ্ধ করতে জানে না এবং বোঝে না যুদ্ধ কিভাবে করতে হয়!

মুসলিম বাহিনীর এই চরম বিশৃঙ্খলা ও পারস্পরিক দোষারোপের দুঃখজনক পরিস্থিতি দেখে ছাবেত ইবনে কায়েস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি স্ব-উদ্যোগে কাফনের কাপড় পরিধান করে লাশে যে সুগন্ধি মাখানো হয়, তা তাঁর শরীরে লাগিয়ে নেন। অতঃপর মুজাহিদদের এই বলে আহ্বান জানান যে, হে মুসলিম বাহিনী! আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় কখনোই এমন বিশৃঙ্খলাপূর্ণ যুদ্ধ করিনি। তোমাদের নিজেদের ওপর শত্রুবাহিনীকে আক্রমণের সুযোগ করে দিয়ে বড়ই অপরিণামদর্শিতার কাজ করেছ...। এবং নিজেদের দুর্বলতার প্রকাশ ঘটিয়ে অযোগ্যতার পরিচয় দিয়ে নিজেদের পরাজয় ও শত্রুদের বিজয়ের পথ সুগম করে দিয়েছ...। অতঃপর আকাশের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকেন, হে আল্লাহ! ভণ্ড নবী মুসাইলামাতুল কাযযাব ও তার অনুসারীরা যে শিরক ও ফিত্না বিস্তার করছে, তা থেকে আমি নিজেকে নির্দোষ ঘোষণা করছি। তেমনিভাবে মুসলিম বাহিনী যে বিশৃঙ্খলা ও দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছে, তা থেকেও আমি নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করছি। এ বলে তিনি বারাআ ইবনে মালিক আল আনসারী ও আমীরুল মুমিনীন উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ভাই যায়েদ ইবনে খাত্তাব, প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণকারী আবী হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আযাদকৃত ক্রীতদাস সালেম ও অন্যান্য সাহাবীদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ক্ষিপ্ত সিংহের ন্যায় শত্রুবাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের সৃষ্ট ব্যূহ তছনছ করে দেন। এ দৃশ্য দেখে মুসলিম বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে নতুন শক্তি-সাহসের সঞ্চার হয়। তাদের এই প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে মুশরিক বাহিনীর অভ্যন্তরে প্রচণ্ড দুর্বলতা ও ভীতির সঞ্চার হয়।

ছাবেত ইবনে কায়েস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শত্রুবাহিনীর ওপর তলোয়ারের আঘাতের পর আঘাত এবং শত্রুবাহিনীর নানাবিধ অস্ত্রের আক্রমণের মুখে বীরবিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন। শত্রুবাহিনীর আঘাতের তীব্রতায় তাঁর ক্ষতবিক্ষত দেহ ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পড়ল। তুমুল সংঘর্ষের এক পর্যায়ে ছাবেত ইবনে কায়েস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যুদ্ধ-ময়দানেই শাহাদাতের কোলে ঢলে পড়েন। অন্তিম শয্যায় শায়িতাবস্থায় তাঁর প্রিয় হাবীব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক শাহাদাতের ভবিষ্যদ্বাবাণী বাস্তবায়নে আনন্দিত ও

মুসলমানদের বিজয় সূচনা দেখে তাঁর চক্ষুদ্বয় শীতল করেন। গৌরবদীপ্ত শাহাদাতকে আলিঙ্গন করার সাথে সাথেই তার পবিত্র রূহ মুবারক ইল্লিয়্যীনের পথে যাত্রা করে।

ছাবেত ইবনে কায়েস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর গায়ে অত্যন্ত লোভনীয় একটা যুদ্ধ-পোশাক ছিল। তাঁর মৃতদেহের পাশ দিয়ে এক মুসলিম সৈন্য অতিক্রমকালে সেই পোশাকটির দিকে দৃষ্টি পড়ে। সে লোভ সংবরণ করতে না পেরে তা খুলে নেয়। ছাবেত ইবনে কায়েস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর শাহাদাতের পরের রাতে মুসলিম বাহিনীর জনৈক সৈন্য স্বপ্নে দেখেন যে, তাকে ছাবেত ইবনে কায়েস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলছেন :

'আমি ছাবেত ইবনে কায়েস। তুমি কি আমাকে চিনতে পেরেছ?

সে উত্তর দেয় :

হ্যাঁ, চিনতে পেরেছি। অতঃপর ছাবেত ইবনে কায়েস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাকে বললেন :

'আমি তোমাকে একটি বিষয়ে ওসিয়ত করছি, খবরদার! আমার কথাকে নিছক স্বপ্ন মনে করে উড়িয়ে দিও না।'

আমি গতকাল যখন শহীদ হই, আমার মৃতদেহের পাশ দিয়ে এই বিবরণসম্পন্ন একজন মুসলিম সৈন্য অতিক্রম করে। আমার যুদ্ধ পোশাকটির লোভ সংবরণ করতে না পেরে সে তা নিজের জন্য খুলে নেয়। অতঃপর ক্যাম্পের শেষ প্রান্তে তার তাঁবুতে গিয়ে ডেকের নিচে ঘোড়ার পিঠের গদি দিয়ে ঢেকে রাখে। তুমি মুসলিম সেনাপতি খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিকট গিয়ে বল, যেন লোক পাঠিয়ে সেই ব্যক্তি থেকে আমার যুদ্ধ-পোশাকটি উদ্ধার করে আনেন। এখন পর্যন্ত তা সেখানেই লুক্কায়িত রয়েছে। অন্য আরেকটি ওসিয়তের মতো এটাকেও নিছক স্বপ্ন মনে করে উড়িয়ে দিও না।

তুমি খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বলবে, মদীনায় খলীফা আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিকট প্রত্যাবর্তনের পর যেন তাঁকে বলেন, ছাবেত ইবনে কায়েসের অমুক অমুক ব্যক্তির নিকট এত পরিমাণ ঋণ রয়েছে...। অমুক অমুক নামের তার দুইজন ক্রীতদাস রয়েছে। তিনি যেন আমার সেই ক্রীতদাস দু'জনকে মুক্ত করে দেন ও আমার ঋণগুলো পরিশোধ করে দেন।'

এই স্বপ্ন দেখামাত্র তার ঘুম ভেঙে গেল। তিনি দ্রুত সেনাপতি খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিকট এসে তার সেই স্বপ্নের বিবরণ ও ছাবেত ইবনে কায়েস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কৃত ওসিয়তের বিবরণ দিলেন।

সেনাপতি খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনাকারীর বিবরণ অনুযায়ী তৎক্ষণাৎ ছাবেত ইবনে কায়েস-এর যুদ্ধ পোশাক খুলে নেওয়া সেই ব্যক্তির নিকট লোক পাঠালেন। তারা বর্ণিত তাঁবুতে গিয়ে দেখতে পায় যে, উক্ত যুদ্ধ-পোশাকটি বর্ণিত স্থানেই রয়েছে। তারা তা উদ্ধার করে আনেন। খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাথে দেখা করেন। যুদ্ধের বর্ণনার সাথে তিনি ছাবেত ইবনে কায়েস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দেন ও তাঁর কৃত ওসিয়ত সম্পর্কে অবহিত করেন। আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর সেই ওসিয়ত সরকারিভাবে বাস্তবায়ন করার অনুমতি প্রদান করেন। ছাবেত ইবনে কায়েস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ব্যতীত ইসলামের বিধান অনুসারে আর কোনো মৃত ব্যক্তির ওসিয়তকে কার্যকরী করা হয়েছে বলে কারো জানা নেই। ছাবেত ইবনে কায়েস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যেমন আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, তেমনি আল্লাহও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। আল্লাহ তাঁকে ইল্লিয়্যীনের সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থানে অধিষ্ঠিত করেছেন।

---

ছাবেত ইবনে কায়েস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জীবনী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সহায়ক গ্রন্থাবলি :


১. আল ইসাবা : জীবনী নং ৯০৪।
২. আল ইসতিয়াব : হামেশে ইসাবা : ১ম খণ্ড, ১৯২ পৃ.।
৩. তাহযীবুত তাহযীব : ২য় খণ্ড, ১২ পৃ.।
৪. ফাতহুল বারী : ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪০৫ পৃ.।
৫. তারীখুল ইসলাম লিযযাহাবী : ১ম খণ্ড, ৩৭১ পৃ.।
৬. হায়াতুস সাহাবা : ৪র্থ খণ্ডের সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।
৭. আল বয়ানু ওয়াত তাবয়ীনু : ১ম খণ্ড, ২০১ ও ৩৫৯ পৃ.।
৮. সীরাতে ইবনে হিশাম : ২য় খণ্ড, ১৫২ পৃঃ ৩ খণ্ড, ৩১৮ পৃঃ ৪র্থ খণ্ড, ২০৭ পৃ.।
৯. আস সিদ্দীক লি হুসাইন হাইকাল : ১৬০ পৃ.।
১০. সিয়ারু আলামিন্ নুবালা।
১১. উসদুল গাবাহ : ১ম খণ্ড, ২৭৫ পৃ. অথবা ৫৬৯ নং জীবনী।

# আসমা বিনতে আবূ বকর (রা)

## (দুই খণ্ড কমরবন্দ বিশিষ্ট জান্নাতী মেয়ে)

*'আসমা বিনতে আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে একশ' বছর আয়ু দান করা হয়েছিল। এ বয়সেও তার একটি দাঁতও পড়েনি, কিংবা বিবেক-বুদ্ধিতেও কোনো ভাঁটা পড়েনি।' –ঐতিহাসিকদের উক্তি*

প্রিয় পাঠক!

আমরা এমন এক মর্যাদাসম্পন্ন, শ্রদ্ধাভাজন, অত্যন্ত সম্মানিত ও খ্যাতিসম্পন্ন মহিলা সাহাবী সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করব, যাঁর ব্যক্তিত্বই ছিল মহান আদর্শের প্রতীক। তাঁর পিতা, পিতামহ, বোন, স্বামী এমনকি তাঁর ছেলেও ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় সাহাবী। এমন ঐতিহ্যের অধিকারী সাহাবী পরিবারের পরিচয়ই কি তাঁর এ গৌরবের জন্য যথেষ্ট নয়?

তাঁর পিতা আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সারা জীবনের অন্তরঙ্গ সাথী ও বন্ধু ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর তিনিই ছিলেন তাঁর প্রথম খলীফা। তাঁর পিতামহ আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পিতা আবূ আতীক ও তাঁর বোন উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা। তাঁর স্বামী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাওয়ারী বা একান্তই আস্থাভাজন সাহায্যকারী যুবায়ের ইবনে আলআওয়াম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। তাঁর ছেলে ইতিহাস বিখ্যাত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। আল্লাহ তাঁদের সবার প্রতি সন্তুষ্ট হোন। এক কথায়, তাঁর

পরিচয় এটাই যথেষ্ট যে, তিনি হলেন 'আসমা বিনতে আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা।'

আসমা বিনতে আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা ছিলেন প্রথম দিককার ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীদের অন্যতম। ঈমানের মর্যাদায় মর্যাদা লাভকারী সতেরো জন নারী ও পুরুষের মধ্যে তিনি ছিলেন সৌভাগ্যবান ও গৌরবের অধিকারিণী। তাঁকে 'যাতুন নিতাকাইন' বা দুই খণ্ড কমরবন্দের অধিকারিণী উপাধিতে ভূষিত করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মদীনায় হিজরতের প্রাক্কালে তিনি এক মনোমুগ্ধকর খিদমত আঞ্জাম দেওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। তা হলো, তাঁদের সফর সামগ্রী ও পানির মশক বাঁধার কোনো রশি না পেয়ে তিনি তাঁর পরিধানের পায়জামার কমরবন্দকেই দু'খণ্ড করে এক খণ্ড দ্বারা পাথেয়গুলো এবং অন্য খণ্ড দ্বারা পানির মশক-এর মুখ বেঁধে দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পুরস্কারস্বরূপ জান্নাতে তাঁর জন্য দু'দুটি কমরবন্দের জন্য দু'আ করেন। সেই থেকেই তাঁকে দু'খণ্ড কমরবন্দবিশিষ্ট জান্নাতী মেয়ে হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

যুবায়ের ইবনে আল আওয়াম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। যুবায়ের ছিলেন খুবই গরীব। যুদ্ধের জন্য একটি ঘোড়া ছাড়া তাঁর আর কিছুই ছিল না। পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য অর্থোপার্জনের কোনো পথও ছিল না তাঁর। তাঁর পরিবারে কোনো খাদেমা ছিল না। আসমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ছিলেন তাঁর উত্তম জীবনসঙ্গিনী। তিনি ছিলেন স্বামীর খিদমতে যেমন নিবেদিতাপ্রাণ, তেমনি ছিলেন তাঁর একমাত্র যুদ্ধের ঘোড়াটির পরিচর্যায় যত্নবান। তিনি ঘোড়াটির সেবাযত্নে ছিলেন খুবই আন্তরিক। ঘোড়াটিকে ঘাস-পাতা ও আহারাদি খাওয়াতেন ও নিজহাতে তার খাবার জন্য খেজুরের আঁটি পিষতেন। আল্লাহ তাদের অভাব-অনটন শীঘ্রই দূর করে দেন। ধন-দৌলতের আগমন ঘটতে থাকে। কালক্রমে তিনি অন্যতম ধনাঢ্য সাহাবী হিসেবে পরিণত হয়ে যান। যখন দীন ইসলামের হেফাযতের লক্ষ্যে মদীনায় হিজরত করার সুযোগ এল, আসমা বিনতে আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তখন ছিলেন পূর্ণ গর্ভবতী। তাঁর এই শারীরিক অসুস্থতা মদীনায় সফর করার মতো ক্লান্তিকর ও কষ্টকর পরিস্থিতির অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। কষ্টকর এ দীর্ঘ পথ

অতিক্রম করে মদীনার পাদদেশে 'কুবা' নামক স্থানে যাত্রাবিরতিকালে তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের ভূমিষ্ঠ হন।

আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের আগমনে মদীনার প্রতিটি মুহাজিরের ঘরে ঘরে আনন্দ-উল্লাস ছড়িয়ে পড়ে। আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের জন্মগ্রহণে সকল মুহাজিরের মুখে আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে মদীনার আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। কেননা, তিনি ছিলেন মদীনায় মুহাজিরদের ঘরে জন্মলাভকারী প্রথম সন্তান। নবজাতক আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাজির করে তাঁর কোলে রাখা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'তাহনীকস্বরূপ' তাঁর মুখের লালা কিঞ্চিৎ নবজাতকের ঠোঁটে দেন ও কিঞ্চিৎ খেজুর চিবিয়ে নবজাতকের মুখে দিয়ে তার জন্য দু'আ করেন। নবজাতকের পাকস্থলীতে সর্বপ্রথম যা প্রবেশ করে তা হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লালা মুবারক।

আসমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ছিলেন সর্বগুণে গুণান্বিত মহীয়সী নারী। তাঁর মতো পূত-পবিত্র চরিত্রের অধিকারিণী, নম্র, ভদ্র, বুদ্ধিমতী মহিলা দ্বিতীয় আর কেউ ছিল না, যার সঙ্গে তাঁর তুলনা করা যায়। তিনি ছিলেন এমন দানশীলা, যাঁর দানকে উদাহরণ হিসেবে স্মরণ করা হতো। তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা) বলেন :

> 'আমার খালা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ও আমার আম্মার চেয়ে দানশীলা কোনো মহিলা আমি দেখিনি। উভয়ই দানশীলা হওয়া সত্ত্বেও পরস্পরের দানের ধরনে বিরাট পার্থক্য ছিল।

আমার খালা তাঁর হাত শূন্য করে ততক্ষণ পর্যন্ত সব বিলিয়ে দিতেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর চলার জন্য কোনো অর্থ হাতে না পৌঁছতো। প্রয়োজনের অধিক কিছু পৌঁছামাত্রই তিনি অভাবীদের মধ্যে তা বিতরণ করে দিতেন। অপরদিকে আমার আম্মা তাঁর হাতে আগামীকালের জন্য কোনো সঞ্চয় রাখতেন না।'

আসমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা শুধু একজন বুদ্ধিমতী মহিলাই ছিলেন না, যে কোন কঠিন পরিস্থিতির মোকাবেলায় তিনি ছিলেন অত্যন্ত পারদর্শী। আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

সঙ্গে মদীনায় হিজরত করার সময় তাঁর ঘরে রক্ষিত ৬,০০০ (ছয় হাজার) দিরহাম ছিল। এ অর্থের এক কপর্দকও নিজ সন্তানদের জন্য না রেখে সবই সঙ্গে নেন পথের প্রয়োজন মেটানোর জন্য।

আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পিতা আবূ কুহাফা যিনি তখনও পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ না করে পৌত্তলিকতাকেই আঁকড়ে ধরে ছিলেন। ছেলে আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু'র হিজরত করে মদীনায় চলে যাওয়ার সংবাদ শুনে সে তার বাড়িতে এসে নাতি-নাতনীদের উদ্দেশ্যে বলে :

> 'আল্লাহর শপথ! সে তার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তোমাদের শুধু দুশ্চিন্তাগ্রস্তই করেনি, সাথে সাথে অর্থনৈতিকভাবেও বিপদে ফেলে গেছে।'

দাদার এ মন্তব্য শুনে আসমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তাকে বলেন :

> 'না দাদাজান, তা কখনো নয়। নিঃসন্দেহে আমার আব্বা আমাদের জন্য প্রচুর অর্থ রেখে গেছেন।'

এ কথা বলে তিনি দেয়ালে সন্নিবেশিত সিন্দুকে পাথর কণা রেখে তার ওপর কাপড় দিয়ে ভালোভাবে ঢেকে তাতে তার অন্ধ দাদার হাত রেখে বলেন :

> 'দাদাজান! হাত দিয়ে দেখুন, সিন্দুকে কত অর্থ! সবই আব্বা আমাদের জন্য রেখে গেছেন। তাঁর দাদাও তাতে হাত রেখে সানন্দে বলেন : এসব যদি তোমাদের জন্য রেখে গিয়ে থাকে, তবে তো বেশ ভালো কথাই। আসমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এই সাজানো ঘটনা দ্বারা দুটি বিষয় বোঝাতে চেয়েছেন। প্রথমত, বৃদ্ধ দাদার মনকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা। দ্বিতীয়ত, যেহেতু তিনি দাদা হওয়া সত্ত্বেও একজন পৌত্তলিক, তাই একজন মুশরিক দাদার করুণার হাত তাদের প্রতি সম্প্রসারণ হওয়াকে মনে-প্রাণে প্রত্যাখ্যান করা।'

ইসলামের বিজয়ের জন্য আসমা বিনতে আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার সারা জীবনের কৃতিত্ব ও বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাস যদি তা ভুলেও যায় অর্থাৎ ইতিহাসবেত্তারা যদি ইতিহাসে লিপিবদ্ধ না করেন, তাহলেও তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাথে শেষ মোলাকাতই তাঁর গর্বের জন্য যথেষ্ট। তিনি ছেলে আবদুল্লাহকে দেওয়া

পরামর্শে যে বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেন এবং সত্যের পথে অবিচল থাকার যে দৃঢ় মনোবল ও ঈমানী চেতনার কথা স্মরণ করেছেন, তা চির অম্লান হয়ে থাকবে।

ঘটনা হলো : ইয়াযীদ ইবনে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মৃত্যুর পর আসমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাতে খিলাফতের বায়'আত করা হয়। হেজায (মক্কা-মদীনা), মিসর, ইরাক, খোরাসানসহ সিরিয়ার অধিকাংশ জনগণ ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে নেওয়া সত্ত্বেও হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ আস্‌সাকাফীর নেতৃত্বে বনূ উমাইয়ারা দুর্ধর্ষ বাহিনী নিয়ে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হয়। উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ বেধে যায়। প্রতিটি যুদ্ধে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে বীরযোদ্ধা হিসেবে সবার দৃষ্টি কেড়ে নেন। কিন্তু তিক্ত হলেও এ কথা সত্য যে, তাঁর সাথী-সঙ্গীরা ভয় অথবা প্রলোভনের জোয়ারে একের পর এক ভেসে যেতে থাকে। পরিশেষে তাঁকে ও তাঁর বাহিনীকে পবিত্র খানায়ে কা'বায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হতে হয়। আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর শাহাদাতের মাত্র কয়েক ঘণ্টা পূর্বে তাঁর মা আসমা বিনতে আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার সাথে শেষ দেখা করার জন্য তাঁর খিদমতে উপস্থিত হন। তাঁর মা আসমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তখন অশীতিপর দৃষ্টিহীনা বৃদ্ধা মহিলা। তিনি মাকে উদ্দেশ্য করে বলেন :

'আম্মাজান! আস্‌সালামু আলাইকি'

আসমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা উত্তরে বলেন :

'হে আবদুল্লাহ! ওয়া আলাইকাস্‌সালাম।'

যখন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের 'মিনজানিক' বা পাথর-নিক্ষেপ কামান খানায়ে কাবায় তোমার সৈন্যদের ওপর অবিরাম পাথর নিক্ষেপ করছে, যার প্রচণ্ড আওয়াযে মক্কার ঘরবাড়ি ও দরজা-জানালা পর্যন্ত কাঁপছে, বৎস ঠিক সেই মুহূর্তে তুমি কী মনে করে আমার কাছে এলে?

আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উত্তর দিলেন :

'আপনার সাথে পরামর্শ করার উদ্দেশ্যে এসেছি মাত্র।'

আসমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন :

'আমার সাথে পরামর্শ? ... কী ব্যাপারে?'

আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের উত্তর দিলেন :

'নিঃসন্দেহে লোকজন আমাকে লাঞ্ছিত করেছে, হাজ্জাজের ভয়ে বা তার অর্থ ও পদের লোভে তারা আমার থেকে সরে পড়েছে। এমনকি আমার সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনও আমার থেকে বিদায় নিয়ে নিরাপদে চলে গিয়েছে। এ মুহূর্তে আমার সাথে মাত্র মুষ্টিমেয় যোদ্ধা রয়েছে। তারা যত দৃঢ়তা ও ধৈর্যের সঙ্গেই যুদ্ধ করুক না কেন, তাদের পক্ষে কয়েক ঘণ্টার বেশি টিকে থাকা সম্ভব নয়। বনূ উমাইয়ার দূত আমার কাছে বারবার প্রস্তাব নিয়ে আসছে, 'আমি যদি অস্ত্র ত্যাগ করে আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের হাতে বায়'আত করি, তাহলে দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও পদমর্যাদা যা চাইব তা-ই আমাকে দেওয়া হবে'-এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কী?'

এ কথা শুনে আসমা বিনতে আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা বললেন :

'আবদুল্লাহ! তুমিই তোমার পরামর্শের জন্য যথেষ্ট। কারণ, তোমার অন্তরের খবর তুমিই ভালো জানো। তুমি যদি মনে-প্রাণে বিশ্বাস কর যে, তুমি ন্যায় ও সত্যের পথেই আছ, তাহলে তাদের মতো দৃঢ়তা ও ধৈর্য অবলম্বন কর, যারা তোমার পতাকাতলে দৃঢ়তা ও ধৈর্য অবলম্বন করে তাদের জীবন কুরবান করেছে...। অতঃপর রাগান্বিত হয়ে উচ্চৈঃস্বরে বলতে থাকেন আর তুমি যদি প্রকৃতপক্ষেই দুনিয়ার কর্তৃত্ব-নেতৃত্বের উদ্দেশ্যেই এ যুদ্ধ পরিচালনা করে থাক, তবে তো তোমার চেয়ে দুর্ভাগা এ পৃথিবীতে দ্বিতীয় আর কেউ নেই। তোমার সঙ্গী-সাথীদেরকেও তুমি ধ্বংস করেছ এবং নিজেও ধ্বংস হয়েছ।'

আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উত্তরে বলেন :

'আম্মা! নিঃসন্দেহে আজই আমি শহীদ হতে যাচ্ছি। এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।'

আসমা বিনতে আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা উত্তর দিলেন :

'স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের হাতে আত্মসমর্পণের চেয়ে তা-ই তোমার জন্য অনেক উত্তম। তুমি নিজেকে তাদের হাতে তুলে দিও না। তা হলে বনূ উমাইয়ার ছেলেরা তোমার কর্তিত শির দিয়ে খেলা করবে।'

আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের উত্তর দিলেন :

'আমি শহীদ হওয়াকে মোটেও ভয় করছি না। যে বিষয়ে ভয় করছি তা হলো, আমার মৃতদেহের নাক-কান কেটে তা বিকৃত না করে ফেলে।'

আসমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বললেন :

'শাহাদাতের পর তাঁর মৃতদেহের সাথে কে কী আচরণ করল, সেটা মৃত ব্যক্তির বিচারের বিষয় নয়। যবাহকৃত বকরির চামড়া খুলে নিলে তাতে বকরির মাথা ব্যথা কিসের?' এ কথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মুখমণ্ডল ঈমানী চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

তিনি বলে উঠলেন :

'আপনি সঠিক নির্দেশনার মাধ্যমে নিঃসন্দেহে মাতৃত্বের দাবি পূরণ করলেন এবং আমাকে ধন্য করলেন। যেমন সর্বদাই আমাকে ধন্য করেছেন আপনার পূত-পবিত্র চারিত্রিক ও নৈতিক প্রভাবের মাধ্যমে। প্রকৃতপক্ষে, এই সংকটপূর্ণ মুহূর্তে আপনার কাছে এই মূল্যবান দিক-নির্দেশনার জন্যই এসেছিলাম। কী মহানই না আপনার ব্যক্তিত্ব ও উত্তমই না আপনার চরিত্র! আল্লাহকে সাক্ষী রেখে ঘোষণা করছি, আমি দুর্বল হইনি বা আমি নৈরাশ্যেরও শিকার হইনি। সেই মহান সত্তাকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমি দুনিয়াপূজারীদের মতো প্রাচুর্যের ও ক্ষমতার মোহে জিহাদের ঝাণ্ডা না তুলে ধরেছি আর না রাষ্ট্রীয়ভাবে আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তুকে গ্রহণ করে আল্লাহর গযবকে আহ্বান জানিয়েছি।'

হ্যাঁ, আপনার পছন্দনীয় পথেই আমি অগ্রসর হচ্ছি। আমি যদি শহীদ হয়ে যাই, আমার জন্য কোনো অনুশোচনা করবেন না। আমাকে আল্লাহর ওপর সোপর্দ করুন।'

আসমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা উত্তর দিলেন :

'বৎস! যদি তুমি অন্যায়ভাবে জীবন দাও, তবেই তোমার জন্য অনুশোচনা করব।'

আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁকে বললেন :

'মা, আপনি আপনার ছেলের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকুন যে, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো অন্যায় করিনি কিংবা কখনো কোনো ঘৃণ্য ফাহেশা কাজে লিপ্ত হয়ে আল্লাহর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করিনি। আমি আমানতের খিয়ানত করিনি। কোনো অমুসলমান ও আশ্রিতদের ওপর অত্যাচার এবং তাদের সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে বিশ্বাসঘাতকতাও করিনি। জেনে রাখুন, আপনার ছেলের নিকট আল্লাহর সন্তুষ্টির চেয়ে আর কোনো কিছুই প্রিয় নয়। এসব সাফাই হিসেবে বলছি না, বরং শুধু এই জন্য বলছি যে, যেন আমার ব্যাপারে আপাতত আপনার মনকে বেশি বেশি করে সান্ত্বনা দান করতে ও সবর করতে সাহায্য করে।'

উত্তরে মা আসমা বিনতে আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বললেন :

'আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ ও আমার পছন্দনীয় পথে পরিচালিত হওয়ার জন্য তোমাকে মুবারকবাদ ...।'

এই বলে পুত্র আবদুল্লাহকে বললেন :

'হে বৎস, আমার কাছে এসো, আমি চির বিদায়ের এই মুহূর্তে তোমার দেহে একটু হাত বুলিয়ে দেই ও তোমার জান্নাতী দেহের একটু ঘ্রাণ নেই।'

হতে পারে এটাই তোমার সাথে আমার শেষ দেখা। আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা মা আসমা বিনতে আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমার দু'হাত ও পা মুবারকে চুম্বন দিতে দিতে তার কোলে ঢলে পড়েন এবং মা আসমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাও অন্তর নিংড়ানো আদরে মাথায় স্পর্শ, চেহারায় ও ঘাড়ে হাত ছোঁয়াতে থাকেন। আর ঘ্রাণ নিতে নিতে ছেলেকে চুমু দেন এবং সোহাগ ভরে দু'হাতে ছেলের শরীরকে স্পর্শ করতে থাকেন। এরই এক পর্যায়ে হঠাৎ আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমার দেহ থেকে তাঁর দু'হাত গুটিয়ে নিয়ে অবাক হয়ে ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন :

'আবদুল্লাহ! তুমি একি পোশাক পরেছ?'

আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উত্তর দিলেন :

'আমার যুদ্ধ-পোশাক লৌহবর্ম।'

মা আসমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা প্রশ্ন করলেন :

'প্রিয় বৎস! শাহাদাতই যার কাম্য, সে কি নিরাপত্তার প্রতীক এই লৌহবর্ম পরিধান করতে পারে?'

আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উত্তর দিলেন :

'আমি একজন যোদ্ধা হিসেবে শুধু আপনার সম্মানার্থে ও আপনার মনকে সান্ত্বনা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এ পোশাক পরেছি।'

মা আসমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তাঁকে পরামর্শ দিলেন :

'তুমি তা দেহ থেকে খুলে ফেল। কারণ, তুমি একজন বীর যোদ্ধা হিসেবে আল্লাহর পথে শাহাদাত লাভের জন্য সহজ হালকা-পাতলা পোশাক পরে যুদ্ধ কর– এটাই বেশি কার্যকর। তুমি লম্বা ইযার বা পায়জামা পরিধান করে নাও। যেন শাহাদাতবরণেরকালে মাটিতে ছিটকে পড়লে তোমার দেহ আবৃত থাকে ও ফরয তরক না হয়।' মায়ের এ উপদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর দেহ থেকে লৌহবর্ম 'দোআর' খুলে ফেলেন এবং তাঁর পরিবর্তে তার পায়জামা পরিধান করে কাবা শরীফে অবস্থানরত যোদ্ধা সাথীদের সাথে যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন।

বিদায়কালে মাকে সম্বোধন করে বললেন :

'আম্মাজান! আমার জন্য দু'আ করুন।

ছেলের এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মা আসমা বিনতে আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তাঁর দু'হাত আকাশের দিকে তুলে দু'আ করতে আরম্ভ করেন :

'হে আল্লাহ! মানুষ যখন গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন তখন আমার ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের দীর্ঘ রাত পর্যন্ত দাঁড়িয়ে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করত এবং রাতের অন্ধকারে তোমার দরবারে আহাজারী করত। তুমি তার দু'আ কবুল কর এবং আহাজারীর প্রতি সদয় হও।

হে আল্লাহ! মক্কা-মদীনার প্রচণ্ড উত্তাপ ও লু প্রবাহের কষ্টকর দিনে ক্ষুধা-তৃষ্ণাকে বরদাশত করে তোমার নিমিত্তে তার রোযাকে কবুল কর এবং তার প্রতি সদয় হও।'

হে আল্লাহ! পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি, সম্মান-মর্যাদার এবং আনুগত্যের প্রতিদানস্বরূপ তুমি আজ তার প্রতি সদয় হও।

হে আল্লাহ! আমি তাকে এ মুহূর্তে তোমার মর্জির ওপর ছেড়ে দিলাম। এবং তার ব্যাপারে তুমি যা সিদ্ধান্ত নিয়েছ ও তার ভাগ্যে যা রেখেছ তাতেই আমি সন্তুষ্ট। তার ব্যাপারে আমাকে ধৈর্য ধারণ করার 'তাওফীক' দাও এবং তাঁর জন্য সবর করার জন্য আমাকেও উত্তম পুরস্কারে ভূষিত কর।'

সেদিন সূর্যাস্তের পূর্বেই আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শাহাদাতের অমিয়ধারা পান করে আল্লাহর দরবারে পৌছে যান। আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর শাহাদাতের এগারো বা বারো দিন পরই তার মা আসমা বিনতে আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমাও ইনতিকাল করে ইল্লিয়্যীনের মহা সম্মান ও শান্তির স্থানে ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের সঙ্গে মিলিত হন। মৃত্যুকালে আসমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার বয়স ছিল একশত বছর, অথচ তখনো তাঁর একটি দাঁতও পড়েনি। তাঁর তীক্ষ্ণ জ্ঞান বা শক্তিতে কোনো ভাঁটাও পড়েনি।

---

আসমা বিনতে আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমার জীবনী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য সহায়ক গ্রন্থ :

১. আল ইসাবাহ : জীবনী নং-৪৬।
২. উসদুল গাবাহ : ৫ম খণ্ড, ৩৯২-৩৯৩ পৃ.।
৩. আল ইসতিয়াব : হায়দ্রাবাদ সংস্করণ : ২য় খণ্ড, ৭০৪-৭০৫ পৃ.।
৪. তাহযীবুত তাহযীব : ১২তম খণ্ড, ৩৯৭ পৃ.।
৫. সিফাতুস সাফওয়া : ২য় খণ্ড, ৩১-৩২ পৃ.।
৬. শাজারাতুযাহাব : ৮০ পৃষ্ঠা।
৭. তারীখুল ইসলাম লিযাহাবী : ৩য় খণ্ড, ১৩৩-১৩৭ পৃ.।
৮. আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ : ৮ম খণ্ড , ৩৪৬ পৃ.।
৯. আলামুন নিসা লিকিহালাহ : ১ম খণ্ড, ৩৬ পৃ.।
১০. আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের মিন সিলসিলাতি আলামিল আরব : ড. খারবুতলী।
১১. সিয়ারু আলামিন নুবালা : ২য় খন্ড, ২০৮ পৃ.।
১২. কালায়েদুল জুমান : ১৪৯ পৃ.।
১৩. আন্নুজুমুয যাহিরাহ : ১ম খণ্ড, ১৮৯ পৃ.।
১৪. আল মুহাব্বারু : ২২, ৫৪, ১০০ পৃ.।

# তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ আত তাইমী (রা)

*'যদি কেউ প্রকৃতপক্ষে শাহাদাতপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তিকে দেখে আনন্দিত ও তার চক্ষুদ্বয়কে শীতল করতে চায়, তাহলে সে যেন তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা)-কে দেখে।'*

*–মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)*

কোনো এক কুরাইশ বাণিজ্য কাফেলার অন্তর্ভুক্ত হয়ে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ সিরিয়ার হাওরাস অঞ্চলের বুসরার বাণিজ্য কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। বুসরার[১] এক ব্যস্ততম বাজারে পৌঁছেই অভিজ্ঞ কুরাইশ ব্যবসায়ীগণ ক্রয়-বিক্রয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ অল্পবয়সী এবং ব্যবসায়ে অনভিজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও ক্রয়-বিক্রয়ে তার বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতা সাথী ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়। শুধু তাই নয়, তার সাথী-সঙ্গী অভিজ্ঞ ও ঝানু ব্যবসায়ীদের চেয়েও তিনি ব্যবসায় বেশি মুনাফা করতে থাকেন।

বুসরার বাজারে দূর-দুরান্ত থেকে আগত ব্যবসায়ীদের ভিড়ে সে নিজেও ক্রয়-বিক্রয়ের কাজে সকাল-বিকাল বাজারে গমনাগমনে ব্যস্ত। তালহা ও তার সঙ্গীদের ব্যবসায়িক ব্যস্ততার এক পর্যায়ে এমন একটি ঘটনা ঘটে, যা শুধু তালহার জীবনের মোড়ই পরিবর্তন করে না, নতুন এক ইতিহাসেরও জন্ম দেয়।

প্রিয় পাঠক!

সেই ঐতিহাসিক ঘটনাটি কী তা জানেন কি? যা তালহার জীবনকে এক নতুন মানুষে বদলে দেয়? ঘটনাটি তার মুখ থেকেই শুনুন।

---

১. ইরাকের 'বসরা' বন্দর নয়। এটি সিরিয়ার একটি বাণিজ্যিক বন্দর।

তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেন, আমরা যখন বুসরার বাণিজ্য এলাকায় নিজ নিজ ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত, সেই সময় একজন পাদ্রি উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা দিচ্ছিলেন যে :

'হে ব্যবসায়ী বন্ধুরা! আপনাদের মধ্যে 'আহলে হারাম' বা মক্কার অধিবাসী কি কেউ আছেন?'

আমি এই পাদ্রির কাছেই ছিলাম। আরও নিকটবর্তী হয়ে উত্তর দিলাম :

'জী, আমি হারামের অধিবাসী।'

পাদ্রি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন :

'আপনাদের মাঝে কি আহম্মদ-এর আবির্ভাব ঘটেছে?'

তাঁকে প্রশ্ন করলাম : 'আহম্মদ আবার কে?'

তিনি উত্তর দিলেন :

'আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিবের ছেলে। এ মাসেই তিনি আবির্ভূত হবেন। তিনিই সর্বশেষ নবী। আপনাদের জন্মভূমি হারামের দেশেই তাঁর আবির্ভাব। তিনি হিজরত করে আসবেন কালো পাথরবিশিষ্ট এমন এক দেশে, যার উপরিভাগ লবণাক্ত অথচ তলদেশ থেকে উত্থিত সুপেয় পানি খেজুর বাগানসমূহকে সজীব করে থাকে। হে বৎস! সেই নবীর আহ্বানে দ্রুত সাড়া দেওয়াই হবে তোমাদের কর্তব্য।'

তালহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন :

'পাদ্রির সেই কথাগুলো আমার অন্তরের অন্তস্তলে প্রবেশ করল। আমি তাড়াতাড়ি নিজেকে প্রস্তুত করে আমার উটের পিঠে হাওদা বা মালামাল বহন করার আসনবিশেষ বেঁধে নিলাম। আমাদের বাণিজ্য কাফেলাকে পিছনে রেখে দ্রুতগতিতে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম।

মক্কায় পৌঁছে আমার পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞাসা করলাম :

'ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে আমাদের সিরিয়া চলে যাওয়ার পরে মক্কায় কি নতুন কোনো ঘটনা ঘটেছে?'

তারা উত্তরে আমাকে জানালেন : 'হ্যাঁ ঘটেছে!'

মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ঘোষণা দিয়েছে যে, সে আল্লাহর প্রেরিত নবী। আবূ কুহাফার ছেলে আবূ বকর তার ওপর ঈমান এনেছে।

তালহা বলেন :

'আমি আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে ভালো করেই জানতাম। খুব সহজ-সরল শান্ত ও নরম স্বভাবের মানুষ। সবারই প্রিয় ব্যক্তিত্ব। তিনি একজন উন্নত চরিত্রের ন্যায়পরায়ণ ও সত্যবাদী ব্যবসায়ী হিসেবে সুপরিচিত। বংশ-পরিচিতি, কুরাইশদের নসবনামা ও ইতিহাস বিশেষজ্ঞও বটে। আমরা তাঁর প্রতি স্বাভাবিকভাবেই আকৃষ্ট ছিলাম। তাঁর মজলিসে হাজির হতাম। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতের প্রতি ঈমান গ্রহণের সংবাদ শুনে আমি তাঁর কাছে ছুটে এলাম।'

তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম :

'এ কথা কি সঠিক যে, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন এবং আপনি নিজেও তাঁর ওপর ঈমান এনেছেন?'

তিনি উত্তর দিলেন : 'হ্যাঁ ...।'

অতঃপর তিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘটনাবলির বর্ণনা দিতে লাগলেন এবং আমাকেও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনার জন্য অনুপ্রাণিত করতে থাকলেন। আমিও আবূ বকর সিদ্দীককে বুসরার পাদ্রির সেই ভবিষ্যদ্বাণী শোনালাম। তিনি পাদ্রির দেওয়া সংবাদ শুনে অবাক হয়ে গেলেন এবং আমাকে বললেন :

'চলো আমার সাথে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাই। তোমার এ সংবাদ তুমি নিজেই অবগত করো।'

তিনি তাঁর দাওয়াত সম্পর্কে কী বলেন, 'তা তুমিও অবগত হও। এটা তোমাকে ইসলাম গ্রহণে সাহায্য করবে।'

তালহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন :

'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি ইসলাম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দিলেন ও আমাকে পবিত্র কুরআন মাজীদের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করে শোনালেন। ইসলাম গ্রহণ করলে তা কিভাবে পরকালের জন্য কল্যাণকর হবে, সে সুসংবাদও দিলেন। তাঁর এ আলোচনাই ইসলামের প্রতি আমার মনকে আল্লাহ তাআলা প্রশস্ত করে দিলেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বুসরার সেই পাদ্রির ভবিষ্যদ্বাণীর কথা শোনালে তিনি খুবই খুশি হলেন। তাঁর

মুখমণ্ডলীতে আনন্দের ছাপ পরিস্ফুট হলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনেই কালেমা শাহাদাত পাঠের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করলাম। আমি হলাম আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাতে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে তৃতীয় অথবা চতুর্থ ব্যক্তি।'

কুরাইশ যুবক তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ইসলামগ্রহণ তাঁর পরিবার-পরিজন ও নিকটাত্মীয়দের ওপর যেন বজ্রাঘাত হিসেবে নিপতিত হলো। তাঁর ইসলাম গ্রহণে সবচেয়ে বেশি চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়ল তাঁর মা। তার মনে বিরাট আশা ছিল যে, তার ছেলে যে উন্নত চরিত্রের অধিকারী এবং তাঁর যে যোগ্যতা রয়েছে তাতে একদিন সে অবশ্যই তার গোত্রের সরদারের আসনে সমাসীন হবে। তাঁর চেনা-জানা পৌত্তলিক মহলের ও তাঁর গোত্রের প্রত্যেকেই তাঁকে ইসলাম ত্যাগ করে পৌত্তলিকতায় ফিরিয়ে আনার জোর প্রচেষ্টা চালাতে থাকল। কিন্তু তিনি নিজ মতে অবিচল থাকেন। তাদের কাকুতি-মিনতি, আবেগ ও অনুরোধ সবই যখন ব্যর্থ হলো, তখন তারা দৈহিক নির্যাতনের পথ গ্রহণ করল।

মাসঊদ ইবনে খারাশ তাঁর ওপর শারীরিক নির্যাতনের ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন :

'আমি সাফা ও মারওয়া পাহাড় দুটির মধ্যে 'সাঈ' করার নিয়ম অনুযায়ী দৌড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম, অনেকগুলো লোক একটি যুবককে কেন্দ্র করে সমবেত হয়েছে। তারা তার দু'হাত কাঁধের সাথে বেঁধে পেছন থেকে মাথায় ও পিঠে আঘাত করছে ও তাকে দৌড়াতে বাধ্য করছে। তাদের পেছনে পেছনে এক বৃদ্ধা মহিলা তাকে উচ্চৈঃস্বরে গালি-গালাজ করছে ও অভিশাপ দিচ্ছে।'

আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলাম : 'এ যুবকের কী হয়েছে?'

তারা বলল :

'এ যুবক তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ। সে তার ধর্ম ত্যাগ করে বনূ হাশিম গোত্রের এক ব্যক্তির প্রতি ঈমান এনেছে।'

তাদের জিজ্ঞাসা করলাম :

'তার পেছনে এ বৃদ্ধা মহিলা কে?'

তারা বলল :

'সে এই যুবকের মা সা'বাহ বিনতে আলহাদরামী। অতঃপর কুরাইশ বংশের সিংহ নামে খ্যাত নওফেল ইবনে খুয়াইলিদ তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহকে ও আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে এক সাথে জোড়া রশি দিয়ে মযবুতভাবে বেঁধে মক্কার নিকৃষ্টতম দুষ্ট ছেলেদের হাতে নির্যাতনের জন্য সোপর্দ করে। এ জন্য আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ও তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমাকে القرينين। বা 'জোড়া বন্ধু' বলা হয়ে থাকে।'

এভাবে দিনের পর দিন ও মাসের পর মাস যেমন অতিবাহিত হতে থাকে, তাঁর ওপর যুলুম-নির্যাতনও তেমনি বৃদ্ধি পেতে থাকে। শুধু তাই নয়, এ নির্যাতনের মাধ্যমে তাঁর ঈমানী পরীক্ষাও কঠোর থেকে কঠোরতর হতে থাকে। তাঁর এই ঈমানী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ দেখে মুসলমানগণ তাঁকে যিন্দা শহীদ উপাধি দান করেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে তালহা আল খাইর, তালহা আল জুদ ও তালহা আল ফাইয়াদ অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাবী, দানবীর সাহাবী ও প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী সাহাবী হিসেবে সম্বোধন করতেন। এসব উপাধির প্রত্যেকটির এক একটি ইতিহাস রয়েছে, যা একদিকে হৃদয়বিদারক, অপরদিকে অবিস্মরণীয়।

'যিন্দা শহীদ' উপাধিতে ভূষিত হওয়ার পিছনে অনেক ঘটনার মধ্যে একটি ছিল :

'উহুদের যুদ্ধের এক পর্যায়ে কুরাইশদের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে মুসলিম বাহিনী ভীষণভাবে পর্যুদস্ত হয়। অনেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রণক্ষেত্রে শত্রুর সামনে ফেলে রেখে পালাতে থাকে। সেই সংকটময় মুহূর্তে আনসারদের এগারো জন ও মুহাজিরদের মধ্যে একমাত্র তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর সাথে দৃঢ় অবস্থান নেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বিপর্যয়কর অবস্থা দেখে তাঁর এই বারো জন সাথীসহ উহুদ পাহাড়ে আশ্রয় নিতে মনস্থ করেন। ঠিক এই মুহূর্তে কুরাইশ বাহিনীর একটি দুর্ধর্ষ দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যার উদ্দেশ্যে সেখানে ছুটে এসে তাঁর ওপর হামলা চালায়। মারাত্মক এ আক্রমণে তিনি মুমূর্ষু হয়ে পড়েন এবং দেহরক্ষী এই সাহাবাদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা দেন যে :

'কে এ মুহূর্তে আক্রমণকারী বাহিনীকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম? যে পারবে সে জান্নাতে আমার বন্ধু হিসেবে অবস্থান করবে।'

তালহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন :

'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আক্রমণকারীদের আমি একাই বিতাড়িত করব। ইনশাআল্লাহ।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন :

'না, তুমি স্ব স্থান থেকেই দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ করতে থাক।'

আনসারদের একজন অগ্রসর হয়ে বললেন :

'ইনশাআল্লাহ আমিই ওদের বিতাড়িত করব।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দিয়ে বললেন :

'যাও তোমাকে অনুমতি দিলাম।'

সেই আনসারী আক্রমণকারী বাহিনীর ভেতরে ঢুকে তাদের ওপর আঘাতের পর আঘাত হানতে থাকলেন। তাঁর প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে কুরাইশ বাহিনী বাধার সম্মুখীন হলো। এই সুযোগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাহাড়ে কিছু দূর ওপরে উঠলেন। সে আনসারী শহীদ হওয়ার পর আবার তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ধাওয়া করে তাঁর নিকট পৌঁছলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

'ওদের বিতাড়িত করার জন্য আমাদের মধ্যে কি কেউ নেই?'

তালহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবারও নিজেকে পেশ করে বললেন :

'আমি প্রস্তুত ইয়া রাসূলাল্লাহ!'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন :

'না তুমি তোমার স্থান থেকেই দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ করতে থাক।'

আনসারীদের একজন এগিয়ে এসে বললেন :

'আমি প্রস্তুত, ইয়া রাসূলাল্লাহ!'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে অনুমতি দিয়ে বললেন :

'হ্যাঁ, তোমাকে অনুমতি দিলাম।'

এ আনসারীও তাদের হামলা প্রতিহত করতে শুরু করলেন। তাদের গতি থেমে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ফাঁকে তাঁর অন্যান্য সাথীদের নিয়ে আর একটু ওপরে উঠলেন। বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে সেই আনসারীও শহীদ হলেন। আক্রমণকারী সেই বাহিনী পুনরায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদম নিকটে পৌঁছে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্বের ন্যায় এবারও তাঁর সাথীদের আহ্বান জানালেন।

এবারও তালহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজেকে পেশ করে বললেন :

> 'আমি নিজেকে পেশ করছি ইয়া রাসূলাল্লাহ। এবারও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বারণ করে তাঁর বদলে আর এক আনসারীকে অনুমতি দিলেন। এভাবে একমাত্র তালহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছাড়া একের পর এক এগারো জন আনসারী শাহাদত বরণ করলেন। বাধার পর বাধা অতিক্রম করে এবারও শত্রুবাহিনী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছে গেল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবার তালহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে অনুমতি দিয়ে বললেন :

> 'তালহা এবার তুমি...।'

এই বাহিনীর আক্রমণের পূর্বেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দান্দান মুবারক শহীদ হয় এবং চেহারা মুবারকে অস্ত্রের কালি ঢুকে পড়ে। ঠোঁট মুবারক ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়। চেহারা মুবারক থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে। আঘাতের প্রচণ্ডতা, রক্তক্ষরণ ও ক্লান্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভীষণ দুর্বল করে ফেলে। এমতাবস্থায় তালহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আক্রমণকারী এই বাহিনীর ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ করে তাদের অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত করেন। অতঃপর তড়িৎগতিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তাঁকে কাঁধে নিয়ে পাহাড়ের আরও একটু ওপরে উঠেন। শত্রুবাহিনী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছলে শত্রুবাহিনীর ওপর পুনরায় প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ চালিয়ে তাদের বিতাড়িত করেন। এ সুযোগে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাঁধে নিয়ে পাহাড়ের উঁচুতে নিরাপদ স্থানে উঠেন। শত্রুবাহিনী নিকটে পৌঁছতেই তাঁকে নিরাপদ স্থানে রেখেই পুনরায় তাদের ওপর নতুন করে প্রচণ্ডবেগে ঝাঁপিয়ে

পড়েন। একই সঙ্গে আক্রমণকারী এই বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিহত ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাহাড়ের মাথায় নিরাপদ স্থানে আনতে সক্ষম হলেন।

আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন :

> 'সে সময় আমি ও আবূ উবায়দা ইবনে জাররাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বেশ দূরে শত্রুবাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলাম। শত্রুবাহিনীকে যুদ্ধের ময়দান থেকে বিতাড়িত করার পর আমরা দু'জন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেবা-শুশ্রূষার জন্য দ্রুত তাঁর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন :
>
> أُتْرُكَانِي وَانْصَرِفَا اِلٰى صَاحِبِكُمَا، يُرِيْدُ طَلْحَةَ ۔
>
> 'তোমরা উভয়েই আমাকে ছেড়ে দ্রুত তোমাদের সাথী তালহার কাছে যাও।'

আমরা তাঁর নিকট এসে দেখি যে, তাঁর শরীরে ৭০ থেকে ৭৯টির মতো আঘাত। তার সারা দেহ বর্শার আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত, তীরের আঘাতে জর্জরিত। তাঁর দেহ থেকে ভীষণভাবে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। তাঁর এক হাতের কর্তিত কব্জি দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাহাড়ের গর্তে ছিটকে পড়েছে ও সে বেহুঁশ অবস্থায় পড়ে আছে। উহুদ যুদ্ধের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই বলতেন :

> مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَنْظُرَ اِلَى رَجُلٍ يَمْشِي عَلَى الْاَرْضِ
> قَدْ قَضَى نَحْبَهُ فَلْيَنْظُرْ اِلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ ۔
>
> 'যদি কেউ প্রকৃতপক্ষে শাহাদাতপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তিকে দেখে আনন্দিত ও তার চক্ষুদ্বয়কে শীতল করতে চায়, তবে সে যেন তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহকে দেখে।'

আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উহুদ যুদ্ধের বর্ণনা এলেই বলতেন,

> 'উহুদ যুদ্ধের সারা দিনটাই ছিল তালহার।'

এই হলো তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে 'যিন্দা শহীদ' হিসেবে ভূষিত করার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। তাঁকে দানবীর ও সর্বোত্তম সাহাবী

বলে ভূষিত করার শতাধিক ঘটনা রয়েছে। এসব ঘটনার মধ্যে একটি হলো :

তিনি প্রচুর ধন-সম্পত্তি ও প্রাচুর্যের অধিকারী ছিলেন। ব্যবসায়ী হিসেবেও তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্য চতুর্দিকে বিস্তৃত ছিল। একদা ইয়ামেনের রাজধানী হাদারামাওত থেকে সাত লাখ দিরহাম তাঁর কাছে পৌঁছলে তিনি অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত ও বিনিদ্রাবস্থায় রাত যাপন করেন। তাঁকে দুশ্চিন্তা ও আতঙ্কগ্রস্ত দেখে তাঁর স্ত্রী উম্মু কুলসুম বিনতে আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা জিজ্ঞাসা করলেন :

'আবূ মুহাম্মদ, আপনার কী হয়েছে? আমার পক্ষ থেকে কোনো বেয়াদবি ও ত্রুটি হয়নি তো?'

উত্তরে তালহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন :

'না, না, নিঃসন্দেহে তুমি একজন উত্তম জীবনসঙ্গিনী। কিন্তু রাতভর চিন্তা করছি এবং মনে মনে বলছি এই বিশাল সম্পদ ঘরে নিয়ে যে ব্যক্তি শান্তিতে ঘুমাতে পারে, সে আল্লাহর নিকট কী জবাব দেবে?'

স্ত্রী উম্মু কুলসুম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা উত্তর দিলেন :

'এতে চিন্তা ও পেরেশানীর এমন কী আছে? আপনার নিকটাত্মীয় ও আপনার দীনী ভাইবন্ধুদের তো আপনি ভুলে যাননি। তাদের মধ্যে যারা অভাবী তাদের মধ্যে ভোর হতে না হতেই সমুদয় অর্থ বিতরণ করে দিন।'

তালহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু স্ত্রীর এই পরামর্শ শুনে বললেন :

'আল্লাহ্ তোমার ওপর সন্তুষ্ট হোন, নিঃসন্দেহে তুমি আমার মনঃপূত ব্যক্তির মনঃপূত মেয়ে। সকাল হতে না হতেই এই অর্থগুলো বস্তায় ভরে নিয়ে মুহাজির ও আনসারদের অভাবী, দুঃস্থ ও গরীব পরিবারসমূহের মধ্যে বিতরণ করে দেন।'

তাঁর ব্যাপারে আরো বর্ণিত হয়েছে :

'একদা এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে কিছু আর্থিক সাহায্যের আবেদন করে এবং আলাপ-আলোচনার এক পর্যায়ে সে তালহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে মীরাসপ্রাপ্ত আত্মীয় হিসেবে নিজের পরিচয় দেয়।'

এ শুনে তালহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন :

'মীরাস পাওয়ার মতো এত নিকটতম আত্মীয় হিসেবে ইতঃপূর্বে কোনো দিন আপনার সম্পর্কে আমাকে কেউ বলেনি। আমার একখণ্ড জমি রয়েছে, এর মূল্য হিসেবে উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিন লাখ মুদ্রা দিতে চেয়েছেন। আপনি যদি ভালো মনে করেন এই জমিখন্ড গ্রহণ করুন। আর যদি চান এই তিন লাখ মুদ্রার বিনিময়ে তা বিক্রি করে বিক্রয়লব্ধ মূল্যও নিতে পা

তিনি বললেন

'বিক্রয়লব্ধ মূল্য দিলেই ভালো। তার পছন্দমতোই তিনি তাকে তার বিক্রয়লব্ধ মূল্য দিয়ে দেন। দানবীর ও সর্বোত্তম সাহাবী হিসেবে তালহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে দেওয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এসব উপাধি সার্থক হয়েছে। আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন ও তাঁর কবরকে নূর ও জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করে তুলুন।'

---

তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ আত তাইমী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সহায়ক গ্রন্থাবলি :


১. আত তাবাকাতুল কুবরা : ৩য় খণ্ড, ১৫২ পৃ.।
২. তাহযীবুত তাহযীব : ৫ম খণ্ড, ২০ পৃ.।
৩. আল বাদউ ওয়াত তারীখু : ৫ম খণ্ড, ১২ পৃ.।
৪. আল জামউ বাইনা রিজালিস সাহীহাইন : ২৩০ পৃ.।
৫. গায়াতুন নিহায়াহ : ১ম খণ্ড, ৩৪২ পৃ.।
৬. আর রিয়াদুন নাদরাহ : ২য় খণ্ড, ২৪৯ পৃ.।
৭. সিফাতুস সাফওয়া : ১ম খণ্ড, ১৩০ পৃ.।
৮. হুলিয়াতুল আওলিয়া : ১ম খণ্ড, ৭ পৃ.।
৯. যায়লুল মুযাইল : ১১ পৃ.।
১০. তাহযীব ইবনে আসাকির : ৭ম খণ্ড, ৭১ পৃ.।
১১. আল মুহাব্বারু : ৩৫৫ পৃ.।
১২. রাগবাতুল আমাল : ৩য় খণ্ড, ১৬ ও ৮৯ পৃ.।

# আবূ হোরাইরা আদ দাওসী (রা)

*'আবূ হোরাইরা (রা) রাসূলুল্লাহ (স) থেকে উম্মতে ইসলামের জন্য ষোলো শ'র অধিক হাদীস হিফয করে বর্ণনা করে গেছেন।'*

*–মুহাদ্দিসগণের উক্তি*

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের এই উজ্জ্বল নক্ষত্র সম্পর্কে আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন। উম্মতে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন কে আছে, যে আবূ হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নাম শোনেনি? ইসলামপূর্ব জাহেলী যুগে তাঁকে 'আবদুশ শাম্‌স' বা 'সূর্যের দাস' নামে ডাকা হতো। আল্লাহ তাঁকে ইসলামের গৌরবে ধন্য করেন। প্রিয়নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তাঁকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার নাম কী?'

উত্তরে তিনি বললেন : 'আবদুশ শাম্‌স'।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন :

'না, আবদুশ শাম্‌স নয়, আবদুর রহমান।'

তিনি বললেন :

'জী হ্যাঁ, আবদুর রহমান। রাসূলুল্লাহ! আপনার জন্য আমার পিতা ও মাতা কুরবান হোক। এখন থেকেই আমার নাম আবদুর রহমান।'

কিন্তু আবদুর রহমানের চেয়ে তিনি তাঁর ডাকনাম আবূ হোরাইরা নামেই বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

তাঁকে আবূ হোরায়রা হিসেবে ডাকার একটি বিশেষ কারণও ছিল। শিশুকালে তাঁর ছোট্ট একটি বিড়ালছানা ছিল, যাকে নিয়ে তিনি প্রায়ই খেলা করতেন। যে কারণে তাঁর সমবয়সী অন্যান্য শিশুরা তাঁকে 'বিড়াল ছানাওয়ালা' বা 'আবূ হোরায়রা' বলে ডাকত। আস্তে আস্তে তিনি এই নামেই পরিচিত হয়ে ওঠেন। তার প্রকৃত নামে খুব কম লোকেই তাঁকে ডাকত। পুরুষ বিড়ালছানাকে 'হির্‌র' এবং ছোট্ট স্ত্রী বিড়ালছানাকে 'হোরায়রা' বলা হয়। পুরুষ স্ত্রীর চেয়ে উত্তম, তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো কোনো সময় আদর ও স্নেহ করে তাঁকে 'আবূ হির্‌র' বলে ডাকতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাখা নামের পাশাপাশি তাঁর শিশুকালের নামটিই সর্বজনীন হয়ে পড়ে।

আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু গর্ব করে বলতেন :

> 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে 'আবূ হের্‌র' নামে ডেকেছেন।'

আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু প্রখ্যাত সাহাবী তুফায়েল ইবনে আমের আদ দাওসী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ইয়ামেনের দাওস গোত্রেই বসবাস করতে থাকেন। অতঃপর একটি প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে দেখা করার জন্য মদীনায় আসেন। দাওস গোত্রের এই যুবক সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যে থাকতেন এবং সার্বক্ষণিকভাবে তাঁর খিদমতে নিয়োজিত ছিলেন। মসজিদে নববীকেই নিজের আশ্রয়স্থল ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর শিক্ষক হিসেবে গ্রহণ করে শিক্ষা গ্রহণে আত্মনিয়োগ করেন। সে কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় তিনি বিয়ে করেননি। একমাত্র বৃদ্ধা মা ছাড়া তাঁর আর কেউ ছিল না। কিন্তু তাঁর মা ইসলাম গ্রহণের পরিবর্তে পৌত্তলিকতাকেই আঁকড়ে ধরে থাকে। কিন্তু আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এতে বিচলিত না হয়ে অত্যন্ত ধৈর্য ও বিনয়ের সাথে তাঁর মাকে সর্বদা ইসলামের পথে আহ্বান জানাতেন। তিনি অব্যাহতভাবে তাঁর মাকে কালেমা শাহাদাতের দাওয়াত দিতে থাকেন। অপরদিকে তাঁর মা সর্বদাই এই দাওয়াত অবজ্ঞা করত। তাঁর মা শিরকের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকায় আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু খুবই চিন্তিত ও ব্যথিত থাকতেন। একদিন তাঁর মাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান

গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানালেন। উত্তরে তাঁর মা রেগে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে এমন কটূক্তি ও আপত্তিকর কথা বলল, যা আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে খুবই পীড়া দেয়। তিনি মায়ের এই কটূক্তি ও গালিগালাজ শোনার পর খুবই দুঃখিত ও ব্যথিত মনে কাঁদতে কাঁদতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন :

مَا يُبْكِيكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟

'আবূ হোরায়রা, কী জন্য কাঁদছ?'

আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উত্তর দিলেন :

'আমি সর্বদা আমার মাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে আসছিলাম। তিনিও সর্বদা আমার দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেই চলছিলেন। প্রতিবারের ন্যায় তাঁকে আজও ইসলামের দাওয়াত দেই। তিনি আজ রেগে আমাকে আপনার সম্পর্কে খুবই আপত্তিকর ও দুঃখজনক কথাবার্তা শুনিয়েছেন।' এই বলে তিনি আরয করলেন :

'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার মায়ের ইসলাম গ্রহণের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে দু'আ করুন। আল্লাহ যেন ইসলামের প্রতি তার মনকে আকৃষ্ট করেন। আমার এই আবেদনের প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার আম্মার জন্য বিশেষভাবে দু'আ করলেন।

আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন :

'অতঃপর আমি বাড়ি ফিরে দেখি, ঘরের দরজা বন্ধ এবং ভিতরে পানির খলখল আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ভিতরে প্রবেশের ইচ্ছা করলে আমার আম্মা আমাকে বললেন : 'আবূ হোরায়রা বাইরেই অপেক্ষা কর।'

অতঃপর তার বস্ত্র পরিধান করে আমাকে বললেন : 'এখন ভিতরে প্রবেশ কর।'

তার অনুমতি পেয়ে ভেতরে প্রবেশ করলাম। তিনি তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘোষণা দিলেন :

'আশহাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহূ' – 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং

এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।'

'আমার মায়ের মুখে কালেমা শাহাদাতের ঘোষণা শুনে আমি এতই আনন্দিত হলাম, যা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। আমার চক্ষুদ্বয় দিয়ে আনন্দ-অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকল। আনন্দের এই কান্না নিয়ে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলাম এবং তাঁকে বললাম :

'সুসংবাদ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ আপনার দু'আ কবুল করেছেন। আবূ হোরায়রার মাকে ইসলামের হেদায়াত দান করেছেন। তিনি কালেমা শাহাদাতের সাক্ষ্য দিয়ে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছেন।'

আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মনে-প্রাণে ভালোবাসতেন। যে ভালোবাসা তাঁর মন-মগজ ও রক্তে-মাংসে একাকার হয়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে তাকিয়েই থাকতেন, নজর ফেরাতে চাইতেন না।

তিনি বলতেন :

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারার চেয়ে সুন্দর ও উজ্জ্বল চেহারা আমি জীবনে কোথাও দেখিনি, যেন সূর্যরশ্মি তাঁর চেহারা মুবারকে ঝলক সৃষ্টি করেছে।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভ এবং ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় পাওয়ার জন্য তিনি সর্বদা আল্লাহর শুকরগোযারী করতেন।

তিনি বলতেন :

'সেই মহান আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা, যিনি আবূ হোরায়রাকে ইসলামের হেদায়াত দান করেছেন।

সেই আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা, যিনি আবূ হোরায়রাকে আল কুরআনের ইলম ও শিক্ষা দান করেছেন।

সেই আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা, যিনি আবূ হোরায়রাকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য দান করেছেন।'

আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সার্বক্ষণিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছায়ার মতো অনুসরণ করতেন। প্রতি মুহূর্তেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতেন। এটাই তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে গিয়েছিল। শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ও ব্যাকুলতা যেন তাঁর স্বভাবে পরিণত হয়েছিল।

যায়েদ ইবনে সাবেত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেন : একদা আবূ হোরায়রা, আমি ও আমার জনৈক বন্ধু মসজিদে নববীতে বসে আল্লাহর কাছে দু'আ ও তাঁকে স্মরণ করছিলাম। এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং আমাদের সাথে বসে পড়লেন। তাঁর উপস্থিতিতে আমরা নীরবতা অবলম্বন করলাম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বললেন :

> 'তোমরা যা করছিলে, তা করতে থাক। তাঁর নির্দেশে আমি ও আমার বন্ধু আগের মতো আল্লাহর কাছে দু'আ করতে থাকলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দু'আর মাঝে আমীন, আমীন বলতে লাগলেন।'

আমাদের দু'আশেষে আবূ হোরায়রা দু'আ করতে আরম্ভ করলেন এবং তার দু'আয় বলতে থাকলেন :

> 'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তা-ই চাই, যা আমার দুই সাথী চাইলেন এবং সাথে সাথে আমি এমন ইলম চাই, যা কখনো না ভুলি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দু'আতেও আমীন বললেন।'

তাঁর এ দু'আ শুনে আমরা দু'জনও বললাম :

> 'আমরাও আল্লাহর কাছে এমন ইলম চাই, যা কখনো না ভুলি।'

আমাদের পরবর্তী দু'আ শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

> 'দাওস গোত্রের যুবকটি তোমাদের পূর্বেই তা লাভ করেছে।'

আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বিদ্যার্জনের প্রতি নিজে যেমন অস্বাভাবিক আগ্রহী ছিলেন, তেমনি তাঁর আগ্রহ ছিল অন্যরাও তাঁর মতো বিদ্যা অর্জন করুক। একদিন তিনি মদীনার বাজারের পাশ দিয়ে গমনকালে দেখতে

পান, জনগণ অস্বাভাবিকভাবে কেনা-কাটা করছে। দুনিয়াদারীতে তারা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে বললেন :

'হে মদীনাবাসী ভাইয়েরা! তোমরা এখনো কেন অপারগতা প্রকাশ করে পিছিয়ে আছ?'

তারা বলল : কিসের অপারগতা?

আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন :

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীরাস বণ্টন হচ্ছে, আর তোমরা এখনো বাজারে...। কেন তোমরা দ্রুত সেখানে গিয়ে তোমাদের অংশ গ্রহণ করছ না?'

তারা প্রশ্ন করল :

'আবূ হোরায়রা, কোথায় তা বণ্টন হচ্ছে?'

আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উত্তর দিলেন :

'মসজিদে নববীতে।'

আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এই সংবাদ শুনে তারা কেনাকাটা ছেড়ে দ্রুত মসজিদে নববীর দিকে ছুটে গেল। তাদের ফিরে না আসা পর্যন্ত তিনি সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। তারা ফিরে এসে আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বলল :

'হে আবূ হোরায়রা! আমরা মসজিদে গিয়ে ভিতরে সন্ধান করে দেখলাম, সেখানে তো মীরাস বণ্টনের কোনো নাম-নিশানাও নেই।'

আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাদেরকে প্রশ্ন করলেন :

'মসজিদে নববীতে কি কোনো লোককে দেখনি?'

তারা বলল :

'হ্যাঁ দেখেছি। দেখলাম অনেকেই নামায পড়ছে, অনেকেই কুরআন তিলাওয়াত করছে এবং অনেকেই পরস্পর বসে হালাল ও হারাম ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করছে ...।'

আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন :

'তোমাদের দুর্ভাগ্য! ওটাই তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীরাস।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যে থেকে শিক্ষা গ্রহণ ও জ্ঞান চর্চার জন্য প্রায়ই আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে ক্ষুধায় সীমাহীন কষ্ট ও জীবন যাপনে অমানুষিক দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। যেমনটি তাঁর সমবয়স্কদের কারোর পক্ষেই করা সম্ভব হয়নি। বিদ্যার্জনের পথে তাঁর দুর্ভোগ ও কষ্টের বর্ণনায় তিনি বলেন :

'আমি কখনো ক্ষুধায় এমন অস্থির হয়ে পড়তাম যে, নিরুপায় হয়ে আমার জানা থাকা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো সাহাবীকে কুরআনের একটি আয়াত ও তার শিক্ষণীয় বিষয়াদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতাম। আমার উদ্দেশ্য হতো যে, আমার চেহারার দিকে তাকিয়ে হয়তো বা তার বাড়িতে ডেকে নিয়ে আমাকে কিছু খেতে দেবেন।

এমনিভাবে একদিন ক্ষুধায় এমন অস্থির হয়ে পড়লাম যে, পেটে পাথর বেঁধে নিলাম। এতেও লাভ হলো না। পরিশেষে সাহাবীদের গমনাগমনের পথে বসে পড়লাম। আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে এ পথে অতিক্রমকালে এ উদ্দেশ্যে কুরআনের একটি আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করলাম, হয়তো তিনি আমার ক্ষুধা আঁচ করে আমাকে তাঁর বাড়িতে ডেকে নিয়ে কিছু খেতে দেবেন। কিন্তু তিনি একই কারণে আমাকে তাঁর বাড়িতে আহ্বান জানালেন না। তারপর উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই পথই অতিক্রম করছিলেন। তাঁকেও একই উদ্দেশ্যে কুরআনের একটি আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করলাম। উদ্দেশ্য, যাতে তিনি আমার দিকে তাকালে আমার ক্ষুধা আঁচ করতে পেরে আমাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে কিছু খেতে দেন। কিন্তু তিনিও একই কারণে তাঁর বাড়িতে আহ্বান জানালেন না। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ পথ অতিক্রম করতে গেলে তিনি আমাকে দেখেই আমার চেহারায় ক্ষুধার তাড়না আঁচ করতে পেরে বললেন :

'আবূ হোরায়রা?'

আমি উত্তর দিলাম :

'লাব্বায়েক ইয়া রাসূলাল্লাহ!' অর্থাৎ 'আপনার নির্দেশ শিরোধার্য'– এই বলে তাঁর চলার পথ অনুসরণ করে তাঁর বাড়িতে পৌছলাম। তিনি সন্ধান নিয়ে বাড়িতে পানাহারের মধ্যে শুধু বাটিতে একটু দধি পেলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞাসা করলেন :

'এ দধি কোথা থেকে এসেছে?'

তারা বললেন :

'পাত্রের দধিগুলো প্রতিবেশীর ঐ বাড়ি থেকে আপনার জন্য পাঠানো হয়েছে।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা শুনে আমাকে বললেন :

'হে আবূ হোরায়রা! তুমি 'আহলে সুফ্‌ফা' অর্থাৎ পরিবার-পরিজনহীন অনাথ গরীব-মিসকীনদের– যারা সর্বক্ষণ মসজিদেই অবস্থান করে শরীআতের শিক্ষা গ্রহণে নিমগ্ন, তাদেরকে ডেকে আন।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই নির্দেশ আমার বড়ই অপছন্দ ও আপত্তিকর মনে হচ্ছিল। কেননা, আমি মনে মনে ভাবছিলাম যে, এই সামান্য একটু দধি আহলে সুফ্‌ফার এত লোককে কিভাবে খাওয়ানো সম্ভব হবে? আমি ইচ্ছা করছিলাম যে, ক্ষুধায় ও পিপাসায় কাতর আমি নিজেই এটুকু পান করে পরিতৃপ্ত হই। অথচ এখন অনেক লোক এতে অংশ নেবে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের দাওয়াত দিলাম। তারা সবাই এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে বসে পড়লেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন :

'আবূ হোরায়রা, দধির এ পাত্রখানা ধর এবং উপস্থিত সবাইকে তা থেকে পান করতে বল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশমতো প্রথম ব্যক্তিকে দিলাম। তিনি তা তৃপ্তি সহকারে খেলেন। তারপর পরবর্তী জনও তৃপ্তি সহকারে খেলেন। এমনিভাবে এক এক করে সবাই তৃপ্তি

সহকারে খেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা নিচু করে বসেছিলেন। পরিশেষে তাঁর সামনে তা পেশ করলে তিনি মাথা উঁচু করে আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন :

এখন মাত্র তুমি ও আমি খেতে বাকি আছি?

আমি বললাম :

জী, ঠিকই বলেছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন :

খাও। তাঁর নির্দেশমতো আমি খেলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় আমাকে বললেন : খাও, তাঁর নির্দেশমতো আমি পুনরায় খেলাম। আমি যতবারই খেলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ততবারই বললেন : আরো খাও, আরো খাও, এমনকি পরিশেষে বাধ্য হয়ে বললাম :

'সেই মহান আল্লাহর শপথ! যিনি আপনাকে সত্য দীন সহকারে প্রেরণ করেছেন। আমি এতই পরিতৃপ্ত হয়েছি যে, এখন আর একটুও খেতে পারব না।'

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দধির পাত্রখানা আমার হাত থেকে নিয়ে অবশিষ্টটুকু নিজে খেলেন।

আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে এ দুঃখ-কষ্ট বেশি দিন সইতে হয়নি। কিছুদিন যেতে না যেতেই দান-খয়রাতের প্রাচুর্য দেখা দিল। চতুর্দিক থেকে মালে গনীমত আসা আরম্ভ করল। অতঃপর আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ধন-দৌলত, বাড়ি-ঘর, আসবাবপত্র, স্ত্রী ও সন্তানাদি সব কিছুরই অধিকারী হলেন।

এতসব কিছু হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সাধারণ জীবন যাপনে কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। তিনি তাঁর অতীত কষ্টের জীবন ভুলে যান।

তিনি বলতেন :

'ইয়াতীম হিসেবে প্রতিপালিত হয়েছি। সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় হিজরত করেছি। পেটের ক্ষুধায় এক মুষ্টি খাবারের জন্য বুশরা বিনতে গাযওয়ান

নাম্নী মহিলার কর্মচারী হিসেবে দিন কাটিয়েছি। তাদের উট পরিচর্যা করেছি। তারা সফরে বের হলে উটের রশি ধরে চালকের কাজ করেছি। আল্লাহ্ করুণা করে একদিন বুশরা বিনতে গাযওয়ান নাম্নী সেই মহিলার সাথেই আমাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়েছেন ...।'

আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা, যিনি দীন ইসলামের বিজয় দান করেছেন। ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা হয়েছে এবং আবূ হোরায়রাকে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পক্ষ থেকে মদীনার আমীর বা গভর্নর করা হয়েছে। তাঁর সুমহান মর্যাদা ও মধুর চারিত্রিক গুণাবলিতে মুগ্ধ হয়ে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁকে একাধিকবার মদীনা মুনাওয়ারার গভর্নর বা আমীর পদে পুনর্নিয়োগ দিয়েছেন।

মদীনায় গভর্নরের দায়িত্ব পালনকালে একদা গলিপথে আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু পারিবারিক কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে এক বোঝা লাকড়ি কাঁধে করে সালামা ইবনে মালিকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তিনি বললেন :

'ইবনে মালিক! তোমাদের আমীরের জন্য একটু রাস্তা দাও।'

উত্তরে তিনি বললেন : 'আপনার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক, এতখানি রাস্তা কি আপনার জন্য যথেষ্ট নয়?'

'তিনি তাকে বললেন : 'আমীরের পিঠে বহন করা লাকড়ির এই বিরাট বোঝার জন্য একটু বেশি রাস্তার প্রয়োজন।'

আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একাধারে যেমন ছিলেন দীনদার, অসাধারণ ইলমসম্পন্ন বিদ্বান, তেমনি ছিলেন খোদাভীরু এক বিরল ব্যক্তিত্ব। তিনি দিনের বেলায় রোযা রাখতেন এবং রাতে নিয়মিত কাজকর্ম সেরে রাতের এক-তৃতীয়াংশ সময় ইবাদত-বন্দেগীতে কাটাতেন। রাতের দ্বিতীয় অংশে তাঁর স্ত্রী ইবাদত-বন্দেগী শুরু করলে তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন। শেষ এক-তৃতীয়াংশে তাঁর মেয়ে ইবাদতের জন্য উঠতেন ও রাতের অবশিষ্ট সময় ইবাদত-বন্দেগীতে নিমগ্ন থাকতেন। এভাবে আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ঘর নিয়মিত সারা-রাত ইবাদত-বন্দেগীতে মুখর থাকত।

আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর 'যিনজিয়া' গোত্রের এক সুদানি ক্রীতদাসী ছিল। একবার সে গুরুতর এক অন্যায় কাজ করে বসে, যার কারণে

পুরো পরিবারই চিন্তিত ও মর্মাহত হয়। আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাকে চাবুক উঁচু করে কশাঘাত করতে উদ্ধত হয়েই উঁচিয়ে ধরা চাবুক নামিয়ে নিয়ে বললেন :

'এই কশাঘাতের বিনিময়ে কিয়ামতের দিন যদি আমাকেও কশাঘাত করা না হতো, তাহলে আমাদের যেমন কষ্ট দিয়েছিস, তোকেও তেমনি কশাঘাতের মাধ্যমে তার প্রতিশোধ নিতাম। যে পরিমাণ অর্থে তোকে খরিদ করেছি, সেই পরিমাণ অর্থে আজ তোকে বিক্রি করছি, আর এই মূল্যও আমি কিয়ামতের ভয়াবহ দিনে বুঝে নেব। অর্থাৎ তোকে আল্লাহর পথে আযাদ করে দিচ্ছি। তারপর তিনি সেই ক্রীতদাসীকে বললেন :

'যা, মহান আল্লাহর ওয়াস্তে তোকে আযাদ করে দিলাম। এখন থেকে তুই স্বাধীন।'

আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মেয়ে তাঁকে বলতেন :

'আব্বাজান, আমার বান্ধবীরা আমাকে এই বলে লজ্জিত করে যে, তুমি তোমার পিতার একমাত্র মেয়ে, তা সত্ত্বেও তিনি কেন তোমাকে স্বর্ণালংকার তৈরি করে দেন না?'

উত্তরে তিনি বলতেন :

'তুমি তাদের বলবে : আমার পিতা খুবই ভয় করেন যে, এসব স্বর্ণালঙ্কারের জন্য আমাকে দোযখের আগুনে না পুড়তে হয়।'

আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যে কৃপণতা বা অর্থের প্রতি অধিক মোহের কারণে মেয়েকে স্বর্ণালঙ্কার তৈরি করে দেওয়া পছন্দ করতেন না, ব্যাপারটি এমন নয়। পক্ষান্তরে তিনি ছিলেন, নিঃসন্দেহে একজন দানবীর ও আল্লাহর পথে দানের ক্ষেত্রে বিরল ব্যক্তিত্ব।

একবার খলীফা মারওয়ান ইবনে হাকাম আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে একশ'টি স্বর্ণমুদ্রা প্রেরণ করেন। পরদিন এক পত্রের মাধ্যমে বলেন :

'আমার কর্মচারী ভুলবশত আপনাকে একশ' স্বর্ণমুদ্রা পাঠিয়ে দিয়েছে। মূলত এই স্বর্ণমুদ্রাগুলো আমি আপনার জন্য নয়, বরং অন্য আরেকজনকে দেওয়ার জন্য রেখেছিলাম। তাই প্রেরিত অর্থ ফেরত দেওয়া হোক।'

এ কথা জেনে আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতভম্ব হয়ে যান। অতঃপর বিষণ্ন হয়ে বলেন :

'আমি তো ঐ রাতেই সবগুলো স্বর্ণমুদ্রা আল্লাহর পথে বিলিয়ে দিয়েছি। প্রেরিত স্বর্ণমুদ্রার একটিও আমার কাছে অবশিষ্ট নেই। অতএব, বায়তুল মাল থেকে আমার জন্য নির্ধারিত ভাতা থেকে ওটা কেটে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।'

প্রকৃতপক্ষে মারওয়ান ইবনে হাকাম এই স্বর্ণমুদ্রার প্রতি আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর লোভ ও মোহ আছে কি না তা-ই পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। যখন দেখলেন যে, আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু অর্থলোভী নন, বরং রাতের অন্ধকারে গরীব-মিসকীনদের মধ্যে অর্থ বিতরণকারী এক মহান ব্যক্তি। তখন তাঁকে আরও বেশি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করতে থাকেন।

আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সারা জীবন তাঁর মায়ের প্রতি সদয় ও বিনয়ী ছিলেন। যখনই তিনি ঘর থেকে বের হতেন, তাঁর আম্মার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বলতেন :

'আম্মাজান! আস্‌সালামু আলাইকি ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহূ।'

তাঁর মা উত্তরে বলতেন :

'প্রিয় বৎস! ওয়া আলাইকাস্‌ সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহূ।'

তাঁর মায়ের জবাবী সালামের উত্তরে বলতেন :

'শিশুকালে আমাকে যেমন আদর-স্নেহ দিয়ে লালন-পালন করেছেন, আল্লাহ আপনার প্রতি তেমনি সদয় হোন। আপনার প্রতি করুণা বর্ষণ করুন।'

প্রত্যুত্তরে তাঁর মাও বলতেন :

'বড় হয়ে তুমি যেমন আমার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করছ, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনও তোমার প্রতি তেমনি সদয় হোন।'

তিনি বাড়ি ফিরে প্রথমে তাঁর আম্মার কাছে উপস্থিত হয়ে সালাম দিতেন ও দু'আ নিতেন। অতঃপর অন্যান্য কাজকর্মে মনোনিবেশ করতেন।

আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শুধু যে নিজেই মায়ের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তা নয়; বরং তিনি সবাইকে তাদের পিতামাতার প্রতি অনুগত ও

শ্রদ্ধাশীল থাকার ও তাদের খিদমত করার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দিতেন।

একবার তিনি দুই বৃদ্ধ ব্যক্তিকে একত্রে হেঁটে যেতে দেখেন। যাদের একজন অপরজনের চেয়ে বয়োবৃদ্ধ। অল্প বয়সের বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলেন,

'এই বৃদ্ধ লোকটি কি আপনার নিকটাত্মীয়?'

তিনি উত্তর দিলেন : 'হ্যাঁ, তিনি আমার পিতা।'

আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন :

'খবরদার! আপনি ভুলক্রমেও আপনার পিতাকে নাম ধরে সম্বোধন করবেন না। কখনো তার আগে আগে পথ চলবেন না। তার আগে আপনি কখনো চেয়ারে বা অন্য কোনো আসনে বসবেন না।'

আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুশয্যার সম্মুখীন হলে ক্রন্দন করতে থাকেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো–

'আবূ হোরায়রা! আপনি কী জন্য এমন ক্রন্দন করছেন?'

তিনি উত্তরে বললেন :

'আমি এ দুনিয়ায় আরো কিছু দিন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবিত থাকার জন্য কাঁদছি না; বরং আমার স্বল্প পাথেয় ও সফরের দীর্ঘ পথ অতিক্রমের কথা চিন্তা করেই ক্রন্দন করছি। আমি এমন একটি পথের শেষ প্রান্তরে এসে দাঁড়িয়েছি, এই মুহূর্তেই যার সমাপ্তি ঘটবে। তারপর জান্নাত বা জাহান্নাম। আমি জানি না, ... আমার জন্য কোন্‌টি নির্ধারণ করা হয়েছে।'

মারওয়ান ইবনে হাকাম এ মুহূর্তে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসে বলেন :

'হে আবূ হোরায়রা! আল্লাহ আপনাকে আরোগ্য দান করুন।'

আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তা শুনে বললেন :

'হে আল্লাহ, এ মুহূর্তে আপনার দীদার ও সাক্ষাতই আমার কাম্য। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাকে আপনার দীদার ও দর্শন দান করুন।'

আল্লাহর কী ইচ্ছা, মারওয়ান ইবনে হাকাম তাঁর বাসস্থান থেকে বিদায় নেওয়ার পূর্বেই আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে তাঁর সীমাহীন রহমতের ছায়াতলে আশ্রয় দান করুন। যিনি কিয়ামত পর্যন্ত আগত

সমস্ত মুসলমানের জন্য ৫৩৭৪ (পাঁচ হাজার তিন শত চুয়াত্তর)-টি হাদীস হিফয ও বর্ণনা করে গিয়েছেন।

আল্লাহ্ তাঁকে ইসলামের সুমহান খিদমত করার জন্য ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষ থেকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন। আমীন!

---

আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সম্পর্কে জানার বিস্তারিত সহায়ক গ্রন্থাবলি :


১. আল ইসাবাহ (দারুসসা'দা) : ১৯৯-২০৭ পৃ.।
২. আল ইসতিয়াব (হায়দ্রাবাদ সংস্করণ) : ৬৯৭-৬৯৮ পৃ.।
৩. উসদুল গাবাহ : ৫ম খণ্ড, ৩১৫-৩১৭ পৃ.।
৪. তাহযীবুত তাহযীব : ১২তম খণ্ড, ২৬২-২৬৭ পৃ.।
৫. তাকরীবুত তাহযীব : ২য় খণ্ড, ৪৮৪ পৃ.।
৬. আল জামউ বাইনা রিজালুস্ সাহীহাইনে : ২য় খণ্ড, ৬০০-৬০১ পৃ.।
৭. তাজরীদু আসমাউস সাহাবা : ২য় খণ্ড, ২২৩ পৃ.।
৮. হুলিয়াতুল আওলিয়া : ১ম খণ্ড, ৩৭৬-৩৮৫ পৃ.।
৯. সিফাতুস সাফওয়াহ : ১ম খণ্ড, ২৮৫-২৮৯ পৃ.।
১০. তাযকিরাতুল হুফফায : ১ম খণ্ড, ২৮-৩১ পৃ.।
১১. আল মাআরিফ লি-ইবনে কুতায়বা : ১২০-১২১ পৃ.।
১২. তাবাকাতুশ শিঈরানী : ৩২-৩৩ পৃ.।
১৩. মা'রিফাতুল কুররা আল কিবার : ৪০-৪১ পৃ.।
১৪. সাযরাতুয যাহাব : ১ম খণ্ড, ৬৩-৬৪ পৃ.।
১৫. আত তাবাকাতুল কুবরা : ২য় খণ্ড, ৩৬২-৩৬৪ পৃ.।
১৬. তারীখুল ইসলাম লিয্যাহাবী : ২য় খণ্ড, ৩৩৩-৩৩৯ পৃ.।
১৭. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১০৩-১১৫ পৃ.।
১৮. আবূ হোরায়রা মিন সিলসিলাতি আ'লামিল আরব লি মুহাম্মদ ইযায আল খতীব।

# সালামা ইবনে কায়েস আল আশজাঈ (রা)

*আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।*

খালীফাতুল মুসলিমীন উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মদীনার বিভিন্ন মহল্লা ও অলিগলিতে ঘুরে ঘুরে প্রায়ই বিনিদ্র রাত অতিবাহিত করতেন। উদ্দেশ্য, জনগণ যাতে নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে ঘুমাতে পারে। শুধু তাই নয়, কে কোন্ অবস্থায় রাত কাটাচ্ছে, তা জানার জন্য তাঁর রাতের এই ঘোরাফেরা।

আবাসিক ও বাণিজ্যিক এলাকায় টহল দেওয়ার সময় একদা তিনি গভীরভাবে চিন্তা করছিলেন, মদীনার অবশিষ্ট সাহাবীগণের মধ্যে কে কে এমন উন্নত চরিত্রের অধিকারী ও বিচক্ষণ যে, নেতৃত্বদানে সক্ষম। তাদের থেকে এমন একজনকে পাওয়া দরকার, যাকে পশ্চিম ইরানের 'আহ্ওয়ায' অভিযানের জন্য সেনাপতি নিযুক্ত করা যেতে পারে এবং যার হাতে ইসলামের ঝাণ্ডা তুলে দেওয়া যায়।

দীর্ঘক্ষণ চিন্তা-ভাবনার পর ফারূকে আযম বললেন :

> হ্যাঁ পেয়েছি, এমন এক ব্যক্তির সন্ধান পেয়েছি ইনশাআল্লাহ। সকাল হলে তিনি সালামা ইবনে কায়েস আল আশজাঈ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে ডেকে পাঠান।

তিনি যথাসময়ে উপস্থিত হলে তাঁকে বললেন :

'তোমাকে পশ্চিম ইরানের আহ্ওয়ায অভিযানের জন্য অপেক্ষমাণ সৈন্যদের 'সেনাপতি' নিযুক্ত করেছি। তুমি আল্লাহর ওপর ভরসা করে রওয়ানা হয়ে যাও। অভিযানে যাওয়ার সময় উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁকে যেসব উপদেশ দেন, তা হলো :

১. আল্লাহর সাথে যারা কুফরীতে লিপ্ত, তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধ কর। তোমাদের শত্রু মুশরিকদেরকে প্রথমে অবশ্যই ইসলামের দাওয়াত দেবে। যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে স্বগৃহেই থাকতে চায় এবং তোমাদের সাথে জিহাদে অংশ গ্রহণ না করে, সেক্ষেত্রে তাদের থেকে শুধু তাদের মালের 'যাকাত' গ্রহণ করবে। তারা সেক্ষেত্রে ফাই বা যুদ্ধবিহীন শত্রুপক্ষ থেকে পাওয়া ধন-সম্পদ হতে কোনো অংশ পাবে না।

২. আর যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করার পর তোমাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়, সেক্ষেত্রে তারা তোমাদের মতোই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে।

৩. যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে চুক্তিবদ্ধ থাকতে চায়, তাহলে তাদের নিরাপত্তার স্বার্থে জিযিয়া প্রদানের কথা বলে দিতে হবে। সেক্ষেত্রে তারা তাদের নিজ নিজ ধর্ম-কর্ম স্বাধীনভাবে পালন করতে পারবে। তাদেরকে তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদান করা হবে এবং তাদের ওপর এমন কোনো দায়িত্ব অর্পণ করা হবে না, যা পালন করা তাদের পক্ষে কষ্টকর।

৪. তাতেও যদি তারা অসম্মতি জানায়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদের ওপর তোমাদেরকে বিজয় দান করবেন।

৫. তারা যদি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দুর্গে আশ্রয় নিয়ে তোমাদের কাছে আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশানুযায়ী আচরণের দাবি করে, সেক্ষেত্রে তোমরা তাদের সে দাবি অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করবে। কারণ, তোমরা জান না, এ ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নীতি কী? এমনকি তারা যদি অস্ত্র সজ্জিত অবস্থায় তোমাদের কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আশ্রয়

গ্রহণ করতে চায়, তাহলেও তোমরা তাদের এ পাতা ফাঁদে পা দেবে না; বরং যদি কাউকে আশ্রয় দিতে চাও, তাহলে তোমরা নিজ দায়িত্বেই তাকে আশ্রয় দেবে।

৬. যুদ্ধে জয়ী হলে কোনোক্রমেই ক্ষমতার অপব্যবহার করতে পারবে না। কারো সাথে কোনো প্রতিশ্রুতি দিলে বিশ্বাসঘাতকতাও করতে পারবে না। যুদ্ধে নিহত প্রতিপক্ষের কারো নাক-কান কেটে বিকৃত করতে পারবে না এবং শিশুদের রক্তে নিজেদের হাত রঞ্জিত করতে পারবে না।

সালামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বললেন :

'হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার আদেশ শিরোধার্য। আমি এক্ষেত্রে পূর্ণ আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।'

অতঃপর উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু অত্যন্ত আবেগাপ্লুত হয়ে তাঁর সাথে করমর্দন করলেন এবং বিনীতভাবে তাঁর জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করে আনন্দের সাথে বিদায় জানালেন।

মূলত এ নির্দেশের মাধ্যমে আমীরুল মুমিনীন উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সালামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ও তাঁর বাহিনীর কাঁধে বিরাট এক দায়িত্ব অর্পণ করেন। তিনি জানতেন যে, আহওয়ায একটি পাহাড়ি শহর, পথ-ঘাট অত্যন্ত দুর্গম ও কণ্টকাকীর্ণ। শহরটি বিভিন্ন দুর্ভেদ্য দুর্গ পরিবেষ্টিত। বসরা ও পারস্যের মধ্যবর্তী এ অঞ্চলের অধিবাসীরা কুর্দীদের চেয়েও ভয়ঙ্কর।

ইসলামী রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিধান করা ও সমর কৌশলের দৃষ্টিকোণ থেকে এ শহরের গুরুত্ব অপরিসীম। এ শহরকে ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করে বসরা নগরীর নিরাপত্তা বিধান করা ছাড়া কোনো গত্যন্তরও ছিল না। শুধু তাই নয়, ইরাকের ওপর অভিযান পরিচালনা ও এর শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করা থেকে পারস্য সৈন্যদের বিরত রাখার কোনো বিকল্প পথও ছিল না।

সালামা ইবনে কায়েস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর ইসলামী বাহিনী নিয়ে মদীনা থেকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্যে আহ্ওয়ায অভিমুখে রওয়ানা হলেন। তিনি ইরানের আহ্ওয়ায সীমান্তে প্রবেশ করতে না করতেই সেখানকার চরম ভূ-প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হলেন। কখনো বা তাঁর এ বাহিনীকে

নিয়ে পাহাড়-পর্বতের চূড়ায় উঠতে হলো। কখনো বা পাহাড়ি বন্ধুর রাস্তা অতিক্রম করতে হলো। আবার কখনো বা এ বাহিনীকে অতিক্রম করতে হলো সুবিশাল জলাশয় ও চোরাবালি সদৃশ পলিমাটি। এমনিভাবেই তাঁর বাহিনীকে দুর্গম পাহাড় এবং জঙ্গল ও দুরূহ দুঃসাধ্য যাত্রাপথে বিষাক্ত সাপ, বিচ্ছু, বাঘ-ভাল্লুক ও হিংস্র প্রাণীর সাথে রাত-দিন লড়াই করতে করতে সামনের দিকে অগ্রসর হতে হলো।

এ দুঃসাধ্য যাত্রাপথে সালামা ইবনে কায়েস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বলিষ্ঠ ঈমানী চেতনা এবং উন্নত নৈতিক চরিত্রের প্রভাব সর্বদাই তাঁর বাহিনীর প্রতিটি সদস্যের মনোবল উজ্জীবিত করতে থাকে। কারণ, মহৎ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের পথে দুঃখ-কষ্ট খুব কমই অনুভূত হয়।

দুর্গম যাত্রাপথের প্রত্যেক বিরতিকালে মুজাহিদগণের মনোবল বৃদ্ধির লক্ষ্যে জিহাদের ওপর কুরআন-হাদীসের আলোচনা ও ওয়ায-নসীহতের ব্যবস্থা করা হতো। এর মাধ্যমে আল্লাহর এই সৈনিকদের মনোবলকে সজীব ও চেতনাকে জাগ্রত করা হচ্ছিল। তাঁরা তিলাওয়াতে কুরআনে আল্লাহর স্মরণে কাটাতেন, যার মাধ্যমে তাঁদের পথের ক্লান্তি, ক্লেশ লাঘব হতো। আল্লাহর যিকিরে তাঁরা মগ্ন থাকার মাধ্যমে মনের প্রশান্তিও লাভ করতেন।

খালীফাতুল মুসলিমীন উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নির্দেশ অনুযায়ী সেনাপতি সালামা ইবনে কায়েস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আহ্‌ওয়াযে প্রবেশ করামাত্রই আহ্‌ওয়াযের প্রতিরক্ষা বাহিনীকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তারা ইসলামের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে সশস্ত্র প্রতিরোধের মাধ্যমে মুসলিম বাহিনীর মোকাবেলা করার সিদ্ধান্ত নিল। অতঃপর তাদেরকে চুক্তিবদ্ধ হয়ে 'জিযিয়া' প্রদানের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করার আহ্বান জানানো হলে এ শর্তও তারা প্রত্যাখ্যান করে অহংকারে ফেটে পড়ে।

এ পরিস্থিতিতে মুসলিম বাহিনীর সামনে একমাত্র যুদ্ধ ঘোষণা ছাড়া সমস্ত বিকল্প পথ রুদ্ধ হয়ে গেল। বাধ্য হয়েই ইরানবাসীর নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর লক্ষ্যে এই সশস্ত্র প্রতিরোধ নিশ্চিহ্ন করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং তাঁরা পরকালীন পুরস্কারের মহান আশায় উজ্জীবিত হয়ে সশস্ত্র আহ্‌ওয়ায বাহিনীর বিরুদ্ধে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

তদানীন্তন অন্যতম পরাশক্তি পারস্য সৈনিকদের সাথে সুশৃঙ্খল ইসলামী বাহিনীর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ বেধে গেল। উভয় বাহিনীর শক্তি সমানে সমান। যেমন তাদের আক্রমণভঙ্গি, তেমনি প্রবল অপ্রতিহত কৌশল। উভয় দলের তলোয়ারের পরস্পর আঘাতে যেন স্ফুলিঙ্গ ছুটতে থাকল। উভয় পক্ষেই তাদের হতাহত সংখ্যা সীমিত রেখে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার এক দারুণ নৈপুণ্য দেখাতে থাকল। সমর-ইতিহাসে এমন যুদ্ধের কথা খুব কমই শোনা যায়। সমর কৌশলের চরম নৈপুণ্যকে উপেক্ষা করে তুমুল এ যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত বিপুল ক্ষয়-ক্ষতির এক পর্যায়ে মুশরিকদের ওপর আল্লাহর দীনের পতাকাবাহীদের ঐতিহাসিক বিজয় এবং মুশরিকদের শোচনীয় পরাজয় ঘটল।

যুদ্ধ থেমে গেলে সালামা ইবনে কায়েস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর বাহিনীর সদস্যদের মাঝে গনীমতের সম্পদ বণ্টন করতে আরম্ভ করলেন। এসব সম্পদের মধ্যে অত্যন্ত সুন্দর মূল্যবান হরীক খচিত একটি বালা পেলেন। তিনি ওটা টুকরো টুকরো করে সৈন্যদের মধ্যে বিতরণের পরিবর্তে আমীরুল মুমিনীন উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে উপহার দেওয়ার কথা চিন্তা করলেন। এ ব্যাপারে তাঁর বিজয়ী মুসলিম বাহিনীর কাছে প্রস্তাব রাখলেন যে, এই অপূর্ব সুন্দর মূল্যবান হীরকখচিত 'বালা' যদি আপনাদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হয়, তাহলে প্রতিজন এক কণা করেও ভাগে পাবেন না। তাই আপনারা কি সম্মত হবেন যে, আমরা সেটি আমীরুল মুমিনীনের কাছে হাদিয়া হিসেবে প্রেরণ করি?

সবাই সমস্বরে উত্তর দিলেন : 'জী আমরা সবাই সম্মত।'

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই 'বালাখানি' ছোট এক গহনার বক্সে ভরে সালামা ইবনে কায়েস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আল আশ্‌জাঈ গোত্রের এক কর্মকর্তার মাধ্যমে উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিদমতে প্রেরণ করলেন। তিনি উক্ত অফিসারকে নির্দেশ দিলেন যে :

> 'তুমি তোমার আরদালীসহ মদীনায় রওয়ানা হও এবং আমীরুল মুমিনীনকে বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান কর। আর এ 'বালাখানি তাঁকে উপহার হিসাবে প্রদান কর।'

নির্দেশ মোতাবেক অলঙ্কারখানি নিয়ে তিনি আমীরুল মুমিনীনের খিদমতে উপস্থিত হলেন। উপঢৌকন প্রদানকে কেন্দ্র করে তাঁর ও আমীরুল মুমিনীনের মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ, শিক্ষণীয় ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার জন্ম হলো।

এই তাৎপর্যপূর্ণ ও শিক্ষামূলক ঘটনার বর্ণনা তাঁর কাছ থেকেই শোনা যাক :
আল আশ্‌জাঈ গোত্রের সেই দূত ঘটনার বর্ণনায় বলেন :

সেনাপতি সালামা ইবনে কায়েস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নির্দেশমতো আমি ও আমার আরদালী বসরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। সেনাপতির দেওয়া অর্থ থেকে আমরা আমাদের জন্য দুটি উট ক্রয় করি এবং সফরের যাবতীয় সরঞ্জামাদি খরিদ করে উট দুটিকে সজ্জিত করি। প্রস্তুতিশেষে আমরা মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। দীর্ঘ সফরশেষে আমরা মদীনায় পৌছে আমীরুল মুমিনীনকে খুঁজতে থাকি। বকরি পালকদের মতোই তাঁকে লাঠিতে ভর করে মুসলমানদের এক ভোজ-সভায় দাঁড়িয়ে থাকতে পেলাম।

মাঝে মাঝে তাঁকে দস্তরখানার সামনে দিয়ে ঘুরেফিরে তদারকী করতে দেখা যাচ্ছিল। তিনি 'ইয়ারফা' নামক তাঁর এক খাদেমকে বলছেন, এখানে রুটি দাও, ওখানে গোশ্‌ত দাও, ঐ বাসনে মরক বা জুস দাও ইত্যাদি। তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলে আমাকে বসতে বললেন। আমিও তাদের সাথেই দস্তরখানায় বসে পড়লাম। আমাকেও খাবার দিলেন। তাদের সাথে আমিও খেয়ে উঠলাম।

সবাই পানাহার শেষ করলে উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন,

'ইয়ারফা'! দস্তরখানা উঠাও।'

অতঃপর তিনি বাড়ির দিকে রওয়ানা দিলেন। আমিও তাঁর পিছনে পিছনে রওয়ানা দিলাম। তিনি তাঁর ঘরে ঢুকে পড়লে আমি তাঁর ঘরে ঢুকার অনুমতি চাইলাম। তিনি আমাকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। ঘরে প্রবেশ করে তিনি ভেড়া-বকরির পশম জাতীয় ছেঁড়া-ফাটা একখণ্ড কম্বলে, শুকনো ঘাস ইত্যাদি দিয়ে ভরা চামড়ার দুটি বালিশের ওপরে ঠেস লাগিয়ে বসে পড়লেন। আমি ভেতরে ঢুকলে বালিশের একটি আমাকে দিলে আমি তাতে বসে পড়ি। তাঁর এ ঘরের অর্ধেকটায় পর্দা ঝুলানো। তাতে ভিতরে ঢোকার একটিমাত্র দরজা।

দরজার দিকে চেয়ে বললেন :

'উম্মু কুলসুম! দুপুরের খাবার দাও। আমি মনে মনে ভাবতে থাকলাম, আমীরুল মুমিনীন না জানি তাঁর জন্য কী উত্তম খাবারই না নির্দিষ্ট করে

রেখেছেন! ভিতর থেকে তাঁর জন্য যাইতুন তেল ও শুকনো রুটি এবং এর ওপর মোটা দানাযুক্ত লবণ দিয়ে দুপুরের খাবার পাঠিয়ে দেন।'

তিনি আমাকে বললেন :

'এসো আমার সাথে খাও। আমি তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে সামান্য একটু খেলাম। আমীরুল মুমিনীন তৃপ্তি সহকারে খেতে থাকলেন। লবণমিশ্রিত শুকনো রুটি কেউ এত পেট ভরে খেতে পারে এটা আমি আজই প্রথম দেখলাম।

এরপর তিনি ভেতরে উদ্দেশ্য করে বললেন : 'পানি পাঠাও।'

ভেতর থেকে একটি পাত্রে যবের ছাতুর তৈরি শুরবা তথা সুপ পাঠালেন।

বাহককে বললেন : 'প্রথমে মেহমানকে দাও।'

তাই আমাকে আগে খেতে দেওয়া হলো। পাত্রখানা নিয়ে আমি তা থেকে যৎসামান্য খেলাম। তাতে মনে হলো, নিঃসন্দেহে আমাদের ঘরের তৈরি যবের সুপ এর থেকে অনেক উন্নত মানের ও সুস্বাদু। আমার পানাহারশেষে তিনি পাত্রখানা নিয়ে তা থেকে তৃপ্তি সহকারে খেলেন। পানাহার শেষে মহান রাব্বুল আলামীনের কাছে এই বলে শুকরিয়া জ্ঞাপন করলেন :

'সেই আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা, যিনি আমাদের পেটভরে তৃপ্তি সহকারে পানাহার করালেন।'

অতঃপর তাঁকে সম্বোধন করে বললাম :

'আমীরুল মুমিনীন। আপনার জন্য বিশেষ এক সংবাদ বহন করে এনেছি।'

প্রশ্ন করলেন : 'কোথা থেকে?'

উত্তর দিলাম :

'সালামা ইবনে কায়েস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পক্ষ থেকে।'

এ শুনে তিনি বললেন :

'সালামা ইবনে কায়েসকে মারহাবা! তাঁর দূতকেও মারহাবা!'

হে দূত! সর্বপ্রথম মুসলিম সৈন্যদের সম্পর্কে অবগত কর। উত্তরে বললাম, আমীরুল মুমিনীন যেমনটি আশা করেছেন।

মুসলিম বাহিনী পুরো নিরাপত্তায় থেকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের শত্রুদের ওপর বিজয় অর্জন করে চলেছে।

বিভিন্ন মুসলিম বাহিনীর বিজয়ের ঘটনাবলি এবং সৈন্যদেরও বিস্তারিত বিষয়ের প্রতিবেদন পেশ করলাম।

আমীরুল মুমিনীন বললেন :

'আমরা যা চেয়েছিলাম, মহান আল্লাহ তার চেয়ে অনেক বেশি দিয়েছেন এবং সীমাহীন পুরস্কারে ভূষিত করেছেন।'

অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : 'তুমি কি বসরা হয়ে এসেছ?'

উত্তরে বললাম : 'জী-হ্যাঁ আমীরুল মুমিনীন।'

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন :'সেখানকার দ্রব্যমূল্যের কী অবস্থা?'

উত্তরে বললাম : 'বসরার দ্রব্যমূল্য খুবই কম।'

তিনি বললেন :

'গোশ্তের মূল্য কেমন? আরবদের জন্য এটি হলো জীবনীশক্তি। এটি ছাড়া তাদের জীবন ধারণ খুবই কষ্টকর।'

উত্তরে বললাম :

'সেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ গোশ্ত পাওয়া যাচ্ছে। অতঃপর তিনি আমার হাতের 'গহনার বক্সের' দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেন :

'তোমার হাতে এটা কী দেখছি?'

উত্তরে বললাম :

'আল্লাহ আমাদের বিজয় দান করার পর আমরা গনীমতের মাল একত্র করি। সেনাপতি সালামা ইবনে কায়েস তাতে মহামূল্যবান একটি 'বালা' দেখতে পান।'

তিনি সৈন্যদের বলেন :

এই বালা যদি তোমাদের মাঝে বিতরণ করি নিঃসন্দেহে তোমরা এর সামান্যতম কণা ব্যতীত আর কিছুই পাবে না। তোমরা কি পছন্দ করবে যে, এটিকে টুকরো টুকরো করার পরিবর্তে হাদিয়াস্বরূপ আমীরুল মুমিনীনের নিকট এটি পাঠিয়ে দেই?'

তাঁরা খুশিমনে এ প্রস্তাবে সম্মতি দেন। এই বলে বালা ধারণ করা এই গহনার বাক্সখানি আমীরুল মুমিনীনের খিদমতে পেশ করি।

তিনি বাক্স খুলে দেখতে পেলেন তাতে লাল, নীল, সবুজ ও হলুদ রঙের মূল্যবান হীরা-মানিকখচিত অপূর্ব একখানি বালা। তাৎক্ষণাৎ তিনি লাফ দিয়ে উঠে তাঁর হাতের সেই গহনার বাক্সটি সজোরে মেঝেতে নিক্ষেপ করে কোমরে হাত রেখে সোজাভাবে দাঁড়িয়ে গেলেন। সাথে সাথে বালাটির হীরা, জহরত ও মণিমুক্তাগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে চারিদিকে ছিটকে পড়ল।

আমি প্রতারণার মাধ্যমে আমীরুল মুমিনীনকে হত্যা করতে এসেছি কি না তাই ভেবে মহিলারা পর্দার আড়াল থেকে উঁকি মেরে ঘটনা প্রত্যক্ষ করছিল। অতঃপর আমীরুল মুমিনীন আমাকে লক্ষ্য করে বললেন :

'এসব জড়ো করো...।'

আর তাঁর খাদেম ইয়ারফাকে নির্দেশ দিলেন :

'একে বেত্রাঘাত করতে থাক, খুব জোরে বেত্রাঘাত কর...। আমি গহনার বাক্স থেকে যা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছিল তা কুড়াতে থাকলাম এবং 'ইয়ারফা' আমাকে ইচ্ছেমতো বেত্রাঘাত করতে থাকল।'

তারপর তিনি বললেন :

ঠিক! এভাবেই চলে যাও! এ কাজের জন্য না তুমি আর না তোমার সেনাপতি কোনো প্রশংসার যোগ্য।

আমি বের হয়ে দেখতে পেলাম, আমীরুল মুমিনীনের খাদেম আমাদের উট দুটি হস্তগত করে নিয়েছে। তাই আমীরুল মুমিনীনের কাছে আবেদন করলাম, আমার জন্য উটের নির্দেশ দিলে আমি ও আমার সঙ্গী তাতে আরোহণ করে আহ্ওয়াযে রওয়ানা হতে পারি। কেননা, আপনার খাদেম ইয়ারফা আমাদের উট দুটি হস্তগত করে নিয়েছে।

আমার আবেদনের প্রেক্ষিতে তিনি ইয়ারফাকে নির্দেশ দিলেন :

তাকে ও তার সঙ্গীর জন্য সাদকার উটের মধ্য হতে দুটো উট দাও। এবং আমাকে নির্দেশ দিলেন :

'আহ্ওয়াযে পৌঁছানোর পর উট দুটির প্রয়োজনশেষে তোমার চেয়ে বেশি অভাবী কাউকে এই সাদকার উট দুটি দিয়ে দিও।'

উত্তরে বললাম :

'আমীরুল মুমিনীন এ নির্দেশ অবশ্যই পালন করব! ওয়াদা করছি এ নির্দেশ অবশ্যই পালন করব।'

অতঃপর আমীরুল মুমিনীন আমাকে লক্ষ্য করে বললেন :

'আল্লাহর শপথ করে বলছি, এই 'বালাখানি' সৈন্যদের দিগ্বিদিক বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ার পূর্বেই যেন তাদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়। অন্যথায় তোমাকে ও তোমার সেনাপতিকে 'মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার মতো' চরম সাজা প্রদান করব।'

উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এই চরম নির্দেশ পাওয়ার পর কালবিলম্ব না করে অতি দ্রুত সেনাপতি সালামা ইবনে কায়েস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে ফিরে এসে তাঁকে জানাই যে :

'আপনি আমাকে যে দায়িত্বে নিয়োজিত করেছিলেন, আল্লাহ তাতে আমার জন্য কোনো কল্যাণ নিহিত রাখেননি এবং আপনার জন্যও না...। আপনার ও আমার উপর কঠোর সাজা অর্পিত হওয়ার পূর্বেই সৈন্যদের মাঝে এই 'বালা' বণ্টন করে দিন এবং আমীরুল মুমিনীনকে তার বণ্টনকৃত সংবাদ অবহিত করুন।'

আমার এ সংবাদ শুনে তিনি সৈন্যদের মজলিস ডেকে তাদের মাঝে তা সাথে সাথে বণ্টন করে দেন।

---

সালামা ইবনে কায়েস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সহায়ক গ্রন্থাবলি :

১. আল্-ইসাবা : ২য় খণ্ড, ৭ম পৃ.।
২. আল্-ইসতিয়াব : ইসাবার হাশিয়া : ২য় খণ্ড, ৮৯ পৃ.।
৩. উসদুল গাবাহ্ : ২য় খণ্ড, ৪৩২ পৃ.।
৪. তাহ্যীবুত্ তাহ্যীব : ৪র্থ খণ্ড, ১৫৪ পৃ.।
৫. মু'জামুল বুলদান : ১ম খণ্ড, ২৮৪ পৃ. আল আহ্ওয়াযের ঘটনা।
৬. হায়াতুস্ সাহাবা : ১ম খণ্ড, ৩৪১ পৃ.।
৭. কাদাতু ফাত্হু ফারেস লি মাহমুদ শিইতাখাত্তাব

# মু'আয ইবনে জাবাল (রা)

*'আমার উম্মতের মধ্যে হালাল ও হারাম এবং শরীআতের জ্ঞান সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হলো মু'আয ইবনে জাবাল।'*

*–মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)*

সত্য ও হেদায়াতের আলোতে জাযিরাতুল আরব যখন উদ্ভাসিত হয়ে উঠে, তখন মু'আয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইয়াসরিব শহরের একজন কিশোর মাত্র।

সমবয়স্ক অন্যদের তুলনায় তিনি ছিলেন অধিকতর মেধাবী ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী। বক্তা হিসেবে এবং তার্কিক হিসেবেও ছিলেন তিনি অসাধারণ কৃতিত্বসম্পন্ন। মাথায় ছিল কোঁকড়ানো চুল ও মুক্তার মতো ঝকঝকে তাঁর দাঁত। কালো চক্ষুবিশিষ্ট ও সুঠামদেহী এই কিশোর সবার দৃষ্টি কেড়ে নিত। নবযৌবনেই তিনি দৈহিক গঠন এবং চারিত্রিক গুণাবলিতে ইয়াসরিবের এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের অধিকারী হিসেবে পরিচয় লাভ করেন।

কিশোর মু'আয ইবনে জাবাল মক্কা থেকে আগত ইসলামের প্রথম দাঈ মুসআব ইবনে উমাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। 'লাইলাতুল আকাবা' বা আঁধার রাতে আকাবার বায়'আত অনুষ্ঠানে তিনি তাঁর নিষ্পাপ হাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মুসাফাহা করেন ও বায়'আত গ্রহণ করেন।

আকাবায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ ও তাঁর পবিত্র হাতে বায়'আত গ্রহণকারী ইতিহাসশ্রেষ্ঠ বাহাত্তর জন সাহাবীর তিনিও একজন। যারা সেই রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে হাত রেখে

বায়'আত গ্রহণ করেছেন, তাঁদের নাম ইসলামের ইতিহাসে কিয়ামত অবধি স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

বায়'আত আল আকাবা থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে মু'আয ইবনে জাবাল তাঁর সমবয়সী কিশোরদের সুসংগঠিত করে মদীনার ভূমি থেকে মূর্তি উচ্ছেদ কমিটি নামক একটি কিশোর সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। দিবালোকেই হোক বা রাতের অন্ধকারেই হোক ইয়াসরিবের ভূমিকে মূর্তির অভিশাপ থেকে মুক্ত করাই ছিল তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই কিশোর সংগঠনের আন্দোলনের ফলেই আমর ইবনুল জামূহ'র মতো ইয়াসরিবের নেতৃস্থানীয় ও প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হন। বনূ সালামা গোত্রপতি আমর ইবনুল জামূহ ইয়াসরিবের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের অন্যতম এক মহৎ ব্যক্তি। আরবের প্রথানুযায়ী অন্যান্য গোত্রপতি ও নেতাদের ন্যায় সে নিজেও মূল্যবান চন্দন কাঠ দিয়ে একটি মূর্তি তৈরি করে উপাসনালয়ে সংরক্ষণ করে।

বনূ সালামা গোত্রের এই নেতা তার মূর্তিকে অত্যন্ত ভক্তির সাথে সযত্নে রেশমি কাপড়ের চাদরে মুড়িয়ে রাখত এবং প্রতিদিন তার সৌন্দর্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে রওগন দ্বারা পরিচর্যাও করত।

মু'আয ইবনে জাবালের এ শিশু-কিশোর সংগঠনের কতিপয় সদস্য রাতের অন্ধকারে আমর ইবনুল জামূহ'র সেই মূর্তিটিকে তুলে নিয়ে তারই বাড়ির পিছনে বনূ সালামা গোত্রের আবর্জনার গর্তে রেখে আসে।

প্রতিদিনের ন্যায় প্রত্যুষে পূজা-অর্চনার জন্য আমর ইবনুল জামূহ মূর্তিঘরে গিয়ে যথাস্থানে মূর্তিকে না পেয়ে ভীষণ হৈ-হুল্লোড় শুরু করে দেয়। চারিদিকে ছোটাছুটি করে মূর্তি খুঁজতে থাকে। অবশেষে মূর্তিটিকে সেই আবর্জনার স্তূপে উপুড় হয়ে পড়ে থাকতে দেখে সেটি উদ্ধার করে।

মূর্তিকে এ দুরবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে সে দুঃখ ও ভারাক্রান্ত মনে দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বলল :

> 'রাতের আঁধারে দেবতার সাথে যে এমন আচরণ করেছে, তাকে ধিক্কার দিচ্ছি।'

অতঃপর সে মূর্তিকে ময়লার গর্ত থেকে তুলে এনে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে সুগন্ধি লাগিয়ে একই স্থানে রেখে দেয়। এবার মূর্তির প্রতি তাকিয়ে করজোড়ে নিবেদন করে :

'হে মানাত দেবতা! আল্লাহর শপথ করে বলছি, সত্যিই যদি আমি জানতে পারতাম, তোমার সাথে কে এই আচরণ করেছে, তাহলে অবশ্যই আমি তাকে লাঞ্ছিত করতাম।'

রাত ঘনিয়ে এলে গোত্রপতি আমর ইবনুল জামূহ নিয়মমতো ঘুমিয়ে পড়ে। এ রাতেও একই ঘটনা ঘটল। এবারও তাকে অন্য এক গর্তে নিক্ষেপ করা হলো। সকালে সে মূর্তিকে যথাস্থানে অনুসন্ধান করতে থাকে, কিন্তু সেখানে মূর্তিটিকে না পেয়ে দীর্ঘ খোঁজাখুঁজির পর দেখা গেল, বাড়ির পিছনে মূর্তিটি অন্য একটি ময়লার গর্তে পড়ে আছে।

গর্ত থেকে পুনরায় মূর্তিটিকে কুড়িয়ে এনে আগের নিয়মে ধোয়া-মোছা করে আতর-খোশবু লাগিয়ে সুবাসিত করে একই স্থানে রেখে দিল। এবার সে অপরাধীকে খুঁজে বের করে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞা করল।

পরের রাতেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। সকালে এই মূর্তিটিকে একই স্থানে দেখে সে অবাক হয়ে গেল। শেষবারের মতো তাকে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে সুবাসে সুবাসিত করে তার গলায় নিজের তরবারিখানা ঝুলিয়ে দিয়ে নিবেদন করল :

'হে দেবতা! তুমি তো দেখতে পাচ্ছ, কে বা কারা তোমার সাথে এই অসৎ আচরণ করছে। তোমার মধ্যে যদি কোনো কল্যাণ ও মঙ্গল নিহিত থাকে, তবে আজ রাতে তুমিই তোমাকে রক্ষা করবে, সেই উদ্দেশ্যেই এ তলোয়ার তোমার গলায় ঝুলিয়ে দিলাম।'

অন্যান্য রাতের ন্যায় এ রাতেও গোত্রপতি আমর ইবনুল জামূহ ঘুমিয়ে পড়লে সেই সংগঠনের সদস্যরা লুকিয়ে লুকিয়ে মূর্তিঘরে উপস্থিত হলো। তারা মূর্তির গলার ঝুলন্ত তলোয়ারখানা নিয়ে তদস্থলে একটি মৃত কুকুর বেঁধে দিল এবং এ দুটিকে একত্রে বেঁধে সেসব গর্তের একটিতে ফেলে এল। প্রত্যুষে গোত্রপতি শয্যা ত্যাগ করেই মূর্তির সন্ধান নিতে এলে দেখতে পেল, মূর্তিটি আজও যথাস্থানে নেই, এমনকি পূর্বের গর্তগুলোতেও নেই। চারিদিকে খোঁজাখুঁজি করে পরিশেষে দেখতে পায়, মূর্তিটি মৃত কুকুরের সাথে একই রশিতে বাঁধা উল্টোমুখী হয়ে ময়লা-আবর্জনার এক গহীন গর্তে পড়ে আছে। একে এ অবস্থায় দেখে সে বলে উঠল :

تَاللّٰهِ لَوكُنْتَ إِلٰهًا لَمْ تَكُنْ أَنْتَ وَكَلْبٌ وَسْطَ بِئْرٍ فِى قَرْنٍ ـ

'আল্লাহর শপথ, তুমি যদি সত্যি প্রভুই হতে, তাহলে কখনোই তুমি এবং মৃত কুকুর ময়লার গর্তে এক রশিতে বাঁধা অবস্থায় পড়ে থাকতে না।'

অতঃপর সালামা গোত্রপতি আমর ইবনুল জামূহ ইসলাম গ্রহণ করে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে ইসলাম পালন করতে থাকেন।

ইত্যবসরে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরত করে এলেন। কিশোর মু'আয ইবনে জাবাল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে নিয়োজিত হলেন এবং সারাক্ষণ তাঁকে ছায়ার মতো অনুসরণ করতে থাকেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেওয়া বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আল কুরআন 'হিফয' করেন ও ইসলামী শরীআতের বিধি-বিধানের ওপর গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এমনকি শরীআতের বিধি-বিধানের ব্যাপারে তিনি সাহাবীগণের ইমাম হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।

যায়েদ ইবনে কুতায়েব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন :

'আমি সিরিয়ার 'হেম্‌স' শহরের জামে মসজিদে প্রবেশ করে কোঁকড়ানো চুলবিশিষ্ট এক যুবককে দেখতে পেলাম। তাঁকে চারপাশের লোকজন ঘেরাও করে রেখেছে। তিনি এমন প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচনা করছেন, যেন তাঁর মুখ থেকে মণিমুক্তা ঝরছে ও জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : 'এই যুবক কে?'

তারা উত্তর দিলেন :

'ইনিই মু'আয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।'

ইয়ামেনের প্রসিদ্ধ তাবেঈ আবূ মুসলিম আল খাওলানী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :

'আমি দামেশ্‌কের জামে মসজিদে এসে দেখি, বয়স্ক সাহাবীদের একটি মজলিস চলছে। তাদের মধ্যে কালো কোঁকড়ানো চুল ও ঝকঝকে দাঁতবিশিষ্ট এক যুবক। বয়স্ক সাহাবীগণ কোনো মাসআলার ব্যাপারে মতভেদ করলে সেই যুবকের কাছে এর সমাধান চাওয়া হচ্ছে। আমার সাথে উপবিষ্ট বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলাম : 'এই যুবক কে?'

সে উত্তর দিল : 'মু'আয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।'

নিঃসন্দেহে মু'আয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইসলামের একজন দক্ষ বিদ্বান ছিলেন। তার দক্ষতার ব্যাপারে আশ্চর্য হওয়ার কোনো কিছুই ছিল

না। কারণ, ইসলাম গ্রহণের প্রথম দিন থেকেই তিনি 'মাদ্‌রাসাতুর রাসূলের' শিক্ষার্থী হিসেবে শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তত্ত্বাবধানেই সর্বোচ্চ ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি নবুওয়াতের অমিয় সুধা থেকেই জ্ঞানের তৃষ্ণা নিবারণ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষায় বলীয়ান হয়ে উঠেন। তিনি পৃথিবীর সর্বোত্তম শিক্ষকের হাতে গড়া সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্রদের অন্যতম এক মহান ব্যক্তিত্ব।

মু'আয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সার্টিফিকেটই যথেষ্ট :

أَعْلَمُ أُمَّتِى بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ .

'আমার উম্মতের মধ্যে হালাল ও হারাম সম্পর্কিত অবগত সবচেয়ে বিজ্ঞজন হলো মু'আয ইবনে জাবাল।'

এটাই তাঁর সম্মানের জন্য যথেষ্ট যে, তাঁকে উম্মতে মুহাম্মাদীর ওপর সম্মান দান করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, তিনি ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশাতেই তাঁর তত্ত্বাবধানে আল কুরআন সংকলনকারী ছয় সদস্যবিশিষ্ট কমিটির অন্যতম সদস্য।

তিনি যখন শরীআতের বিধি-বিধান ও অন্যান্য প্রসঙ্গে কোনো আলোচনা রাখতেন, সেখানে উপস্থিত সাহাবীগণ তাঁর সুমহান মর্যাদা ও সুউচ্চ ইলমী জ্ঞান ভাণ্ডারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে তাঁর প্রতি অতিশয় বিনয়ী হয়ে তাকিয়ে থাকতেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকালের পরও তাঁর দুই সুযোগ্য উত্তরসূরি আমীরুল মুমিনীন এই বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও মহান বিদ্বানের জ্ঞানভাণ্ডার থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য সীমাহীন খিদমত নিয়েছেন।

তাঁকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে দায়িত্ব অর্পণের ঘটনাটি ছিল :

'মক্কা বিজয়ের পর কুরাইশ সম্প্রদায়ের জনশক্তি দলে দলে ইসলামে দীক্ষিত হতে থাকে। নও-মুসলিমগণকে ইসলামের বিধি-বিধান শিক্ষা দেওয়ার জন্য একজন যোগ্য ও শরীআত বিশেষজ্ঞকে নিয়োগ প্রদানের প্রয়োজনীয়তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তীব্রভাবে অনুভব করেন। যিনি

তাদের ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবগত করবেন ও শরীআতের বিভিন্ন বিষয়াদি নির্ভুলভাবে শিক্ষা দেবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আত্তাব ইবনে উসাইদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে মক্কায় তাঁর প্রশাসক এবং কুরআন ও শরীআতের শিক্ষা দানের জন্য মু'আয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে তাঁর সহযোগী হিসেবে নিয়োগ দেন।

অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে ইয়ামেনের বাদশাহর দূত উপস্থিত হয়ে বাদশাহ ও জনগণের ইসলাম গ্রহণের সুসংবাদ দিলেন। দূত ইসলামের শিক্ষাদানের জন্য কিছু দাঈকেও তাঁর সঙ্গে প্রেরণের জন্য আবেদন জানালেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দূতের আবেদনে সাড়া দিয়ে মু'আয ইবনে জাবালকে আমীর করে ইয়ামেনে ইসলাম প্রচারের জন্য একটি প্রতিনিধি দল প্রস্তুত করলেন।

নূরে হেদায়াত ও দাওয়াতে দীনের এই মহতী কাফেলাকে বিদায় দেওয়ার উদ্দেশ্যে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববী থেকে বের হয়ে এলেন। তিনি মু'আয ইবনে জাবালের যানবাহনের সাথে হেঁটে হেঁটে অনেক দূর পর্যন্ত চলতে থাকলেন। অপর দিকে যানবাহনে আরোহণ অবস্থায় মু'আয অত্যন্ত অসহায় বোধ করছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেন তাতেই পরিতৃপ্ত হচ্ছেন। এক পর্যায়ে তিনি মু'আয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে সম্বোধন করে বলেন :

يا مُعاذ إنَّك عَسَى ألاتَلْقانى بَعْدَ عامى هذا... ولعلَّكَ أنْ تَمُرَّبِمَسْجدى وقَبْرِى ...

'হে মু'আয! আগামী বছর হয়তো তুমি আর আমার দর্শন লাভ করবে না। খুবই সম্ভাবনা, তুমি ফিরে এসে আমার মসজিদ ও আমার কবর ব্যতীত আর কিছুই দেখতে পাবে না।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই আবেগাপ্লুত ভবিষ্যদ্বাণী শুনে মু'আয রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর প্রিয় হাবীবের বিচ্ছেদের কথা স্মরণ করে ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে থাকেন। তাঁর সাথে সাথে উপস্থিত সাহাবীগণের মধ্যেও কান্নার রোল পড়ে যায়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের সত্যতার সাক্ষ্যদানের পর থেকে যতবারই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে তাকিয়েছেন,

ততবারই তাঁর চোখ সজল হয়ে উঠেছে। তিনি ইয়ামেন থেকে ফিরে আসার পূর্বেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে চির বিদায় নেন। এ দুঃসংবাদ শুনে মু'আয রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু অস্থির হয়ে কাঁদতে থাকেন।

উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ওপর খিলাফতের গুরুদায়িত্ব অর্পিত হলে খিলাফতের কোনো এক সময় তিনি মু'আয রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বনূ কেলাব গোত্রে তাদের নির্ধারিত ভাতাসমূহ প্রদান এবং তাদের ধনীদের কাছ থেকে সংগৃহীত যাকাতের অর্থ গরীব-মিসকীনদের মধ্যে বিতরণের দায়িত্ব দিয়ে সেখানে পাঠান।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মু'আয রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য রওয়ানা হন। এ গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য তিনি তাঁর ঘোড়ার পিঠে গদির ওপর বিছানোর জন্য ব্যবহারের চাদরখানাও নিজ ঘর থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। দায়িত্ব পালনশেষে তিনি সে চাদরটি গলায় পেঁচিয়ে বাড়িতে ফিরে এলে তাঁর স্ত্রী তাঁকে জিজ্ঞাসা করে :

> 'দায়িত্ব পালনশেষে অন্যরা পরিবার-পরিজনের জন্য যেভাবে হাদিয়া ও উপঢৌকন নিয়ে বাড়ি ফেরে, কই, আপনি তো সেসব কিছুই আনেননি?'

তিনি স্ত্রীর প্রশ্নের জবাবে বললেন :

> 'আমাকে পর্যবেক্ষণের জন্য এমন দক্ষ ও চৌকস পর্যবেক্ষক ছিল, যিনি সর্বদাই আমার কাজকর্ম পরিদর্শন এবং হিসাব সংরক্ষণ করতেন।'

তাঁর স্ত্রী তাঁকে বললেন :

> 'রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর যুগে আপনি তাদের পুরো আস্থাভাজন ছিলেন। উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু খলীফা হয়ে এখন আপনার কাজের হিসাব নেওয়ার জন্য পর্যবেক্ষক পাঠান?'

অভিযোগ আকারে উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর স্ত্রীর কানে তিনি এ কথা পৌছান। তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কান পর্যন্ত পৌছে। তিনি মু'আয রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করলেন :

> 'আমি কি তোমার কাজের হিসাব নেওয়ার জন্য কোনো পর্যবেক্ষক পাঠিয়েছিলাম?'

মু'আয রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উত্তরে বললেন :

'আমীরুল মুমিনীন! কখনোই নয়। প্রকৃত ঘটনা হলো, আমার স্ত্রীকে বুঝ দেওয়ার মতো কোনো সদুত্তর না পেয়েই তাকে এ উত্তর দিয়েছি।'

মু'আয রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এ উত্তর শুনে উমর ফারূক হেসে দিলেন এবং মু'আয রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাতে কিছু হাদিয়া দিয়ে বললেন :

'এই সামান্য হাদিয়া দিয়েই তুমি তোমার স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করো।'

উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর শাসনামলেই সিরিয়ায় নিযুক্ত গভর্নর মুআবিয়া ইবনে আবূ সুফিয়ান তাঁর নিকট এই বলে পত্র লেখেন, 'জনাব আমীরুল মুমিনীন! সিরিয়ার মুসলিম জনসংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে চলেছে। শহরগুলোর ধারণ-ক্ষমতার বাইরে এই বৃদ্ধি ঘটছে। তারা অত্যন্ত আগ্রহে এমন দাঈদের অপেক্ষায় রয়েছে, যারা তাদেরকে আল কুরআনের শিক্ষা ও ইসলামের বিভিন্ন দিকের প্রশিক্ষণ দিতে পারে। অতএব হে আমীরুল মুমিনীন! এমন যোগ্যতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ আলিমদের দ্বারা আমাকে সহযোগিতা করুন, যারা তাদেরকে শিক্ষা দানে সক্ষম।'

এ আবেদনের প্রেক্ষিতে উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের যে পাঁচজন বিশেষজ্ঞ আলিম সাহাবী বেঁচে ছিলেন তাদেরকে ডেকে পাঠালেন। তারা হলেন :

১. মু'আয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।
২. উবাদা ইবনে সামিত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।
৩. আবূ আইয়ূব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।
৪. উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।
৫. আবূ দারদা' রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।

তাঁরা উপস্থিত হলে উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁদেরকে বললেন :

'সিরিয়াবাসী ভাইয়েরা তাদেরকে আল কুরআন ও ফিক্‌হ শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমার কাছে বিশেষজ্ঞ আলিম প্রেরণের আবেদন করেছেন। আমাকে আপনাদের মধ্য থেকে যে কোনো তিন জনের প্রস্তাব করে সহযোগিতা করুন। আল্লাহ আপনাদের ওপর সদয় হবেন। আর যদি আপনারা পছন্দ করেন নিজেদের মধ্যে লটারি করুন, অন্যথায় আমিই আপনাদের মধ্য হতে তিন জনকে নিযুক্ত করব।'

তাঁরা উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বললেন : 'কেন লটারী করব?'

'আবু আইয়ূব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বয়স ৮০'র উপরে। উবাই ইবনে কা'ব একজন অসুস্থ ব্যক্তি। আমরা বাকি তিন জনই সুস্থ।'

উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আনন্দিত হয়ে বললেন :

'হিম্‌সে গিয়ে আপনারা সর্বপ্রথম শহরসমূহের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দেখুন। যদি আপনারা মনে করেন এখানে একজন থাকা দরকার, তাহলে আপনাদের একজন 'হিম্‌স' শহরেই থাকুন। একজন 'দামেশ্‌কে' ও অপরজন 'ফিলিস্তীনে'র উদ্দেশ্যে রওয়ানা হোন।'

উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নির্দেশানুক্রমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রখ্যাত এই তিন সাহাবী হিম্‌স শহরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। সেখানে উবাদ ইবনে সামিত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে নিযুক্ত করে আবূ দারদা' রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দামেশ্‌কে ও মু'আয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ফিলিস্তিনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান।

ফিলিস্তীনে তা'লীম ও তারবিয়াতের এই মহান দায়িত্ব পালনাবস্থায় মু'আয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মহামারিতে আক্রান্ত হন। অন্তিম অবস্থায় কিবলামুখী হয়ে এই কাসীদা পাঠ করেন :

مَرْحَبًا بِالْمَوْتِ مَرْحَبًا

زَائِرٌجَاءَ بَعْدَ غِيَابٍ

وَحَبِيْبٌ وَفَدَ عَلَى شَوْقٍ ـ

'স্বাগতম, আমার মৃত্যুকে স্বাগতম ।
আজীবন অনুপস্থিতির পর সে আমাকে আলিঙ্গন করতে এসেছে।
বন্ধু কতই না আনন্দের সঙ্গে আমার কাছে এসেছে।'
অতঃপর আকাশের দিকে লক্ষ্য করে বললেন :

'আল্লাহ! তুমি আমার ব্যাপারে খুব ভালোই জান। এ দীর্ঘ জীবনে দুনিয়ার মোহে না আমি কোনো বাগ-বাগিচায় আকৃষ্ট হয়েছি আর না কোনো সুপেয়

পানি প্রবাহে নিজেকে নিমজ্জিত রেখেছি। প্রতিটি মুহূর্তেই কষ্ট করেছি। তৃষ্ণার্ত অবস্থায় হিজরত করেছি। কুরআন ও ফিক্‌হের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দানের এই গুরুত্বপূর্ণ সফরে অন্যান্য আলিমের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অগ্রগামী ভূমিকা গ্রহণ করেছি। অতএব, হে আল্লাহ! মুমিনগণের রূহ যেভাবে কবয করো, তেমনি শান্তির সঙ্গে আমার রূহ কবয করে নাও।'

এই দু'আর পরপরই পরিবার-পরিজন, ঘর-বাড়ি থেকে দূরে, বহুদূরে আল্লাহর পথের এই মুহাজির দাঈ ইলাল্লাহর পবিত্র রূহ মুবারক ইল্লিয়্যীনের পথে পাড়ি জমায়।

---

মু'আয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সহায়ক গ্রন্থাবলি :


১. আল্‌-ইসাবা : ৩য় খণ্ড, ৪০৬ পৃঃ।
২. আল্‌-ইসতিয়াব : (বুখারী তাহ্‌কীক) ৩য় খণ্ড, ১৪০২ পৃ.।
৩. উস্‌দুল গাবাহ্‌ : ৪র্থ খণ্ড, ৩৭৪ পৃ.।
৪. সিয়ারু ই'লামীন্‌-নুবালা : ১ম খণ্ড, ৩১৮ পৃ.।
৫. আত্‌-তাবাকাতুল কুব্‌রা : ৩য় খণ্ড, ৫৮৩ পৃ.।
৬. হুলিয়াতুল আওলিয়া : ১ম খণ্ড, ২২৮ পৃ.।
৭. সিফাতুস সাফ্‌ওয়াহ : ১ম খণ্ড, ১৯৫ পৃ.।
৮. তাহ্‌যীবু আল আসমা ওয়াল-লুগাত : ২য় খণ্ড, ৯৮ পৃ.।
৯. তারীখুল ইসলাম লিয্‌যাহাবী : ২য় খণ্ড, ২৪ পৃ.।
১০. আল্‌জামউ বায়না রিজালিস্‌ সাহীহায়ন : ২য় খণ্ড, ৪৮৭ পৃ.।
১১. আল্‌-বিদায়া ওয়ান্‌ নিহায়াহ : ৭ম খণ্ড, ৯৪ পৃ.।
১২. তাহ্‌যীবুত্‌ তাহযীব : ১০ম খণ্ড, ১৮৬ পৃ.।
১৩. দুয়ালুল ইসলাম : ১ম খণ্ড, ৫ পৃ.।
১৪. জামহুরাতুল আওলিয়া : ২য় খণ্ড, ৪৮ পৃ.।
১৫. তাব্‌কাত ফুকাহা উল ইয়ামান : ৪৪ পৃ.।
১৬. আল্‌-বাদউ ওয়াত্‌-তারীখু : ৫ম খণ্ড, ১১৭ পৃ.।
১৭. আয্‌-যাহদু লিআহমাদ ইবনে হাম্বল : ১৮০ পৃ.।
১৮. তায্‌কিরাতুল হুফফায : ১ম খণ্ড, ১৯ পৃ.।
১৯. আল্‌মা'আরিফ লি-ইবনে কুতায়বা : ১ম খণ্ড, ১১১পৃ.।
২০. আস্‌হাবে বাদর (শায়খ হুসায়ন গোলামীর পদ্যাংশ) : ২০৪ পৃ.।
২১. হায়াতুস-সাহাবাহ্‌ : ৪র্থ খণ্ড, সূচি দ্রষ্টব্য।
২২. ওফায়াতুল আয়ান।